পৌরনীতি ও সুশাসন

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড: HSC-2857

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2857

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

রচনায়

সুদীপ রায়
মো: মনিরুল ইসলাম
গাজী আলিফ লায়লা
শারমীনা পারভীন
লিটন বল

সম্পাদনায়

ড. শান্তনু মজুমদার

সমন্বয়কারী

সুদীপ রায়

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোডঃ HSC-2857
এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৭
পুন:মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৮, মার্চ ২০১৯, ফেব্রুয়ারি ২০২০
অনলাইন সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২২

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ শরিফুল ইসলাম

ISBN : 978-984-34-3152-3

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

কোর্স বই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র **কোর্স কোড : HSC-2857**

আদর্শ জাতি গঠন ও জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। সুশিক্ষিত জনশক্তি ছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা ও প্রাথমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে গড়ে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও অর্জন, চেতনা আর্দশকে ধারণ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত উন্নতি, সমকালীন চাহিদা ও পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েছে। ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুনাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সে জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য। আলোচ্য বইটিতে মূলত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির পটভূমি আলোচনাপূর্বক স্বাধীনতার গৌরব গাথা, শাসন ব্যবস্থা এবং শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন আনয়ন করার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত এ সব বিষয় অধ্যয়ন করলে একজন শিক্ষার্থী স্বল্প পরিশ্রমে ও সময়ে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। রাষ্ট্রের উন্নতি, মর্যাদা সমুন্নত রাখা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে তাঁদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করতে পারাই এ বিষয়ের লক্ষ্য। আধুনিক বৃহদায়তন ও অধিক জনসংখ্যার রাষ্ট্রে নানাবিধ নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। এই কোর্সটিতে সে রকম কয়েকটি বিষয়েও ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে এই কোর্সটি অধ্যয়ন করে সুশাসনের জন্য অনিবার্য কিছু চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। যা শিক্ষার্থীদেরকে ভবিষ্যত নেতৃত্বের জন্য যুগোপযোগী হিসেবে প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করবে। তাছাড়া পৌরনীতি বিষয় অধ্যয়ন করলে একজন শিক্ষার্থীর যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি অর্জিত হয় তা হল দেশের প্রতি ভালবাসা অর্থাৎ দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে এইচএসসি প্রোগ্রামের স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র বইটি রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একইসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণেই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। কোর্স বইটির ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলোকে কতগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশিষ্ট কোন্ দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্যে বলা আছে। ইউনিটটি কত সময়ে শেষ করতে হবে তা ইউনিটের শুরুতে উল্লেখ করা আছে এবং ইউনিটে কতগুলো পাঠ আছে তাও উল্লেখ করা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কি না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি মূলপাঠ অবশ্যই বুঝে পড়তে হবে। প্রতিটি পাঠের শেষে ঐ পাঠের সারসংক্ষেপ দেয়া আছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে এবং ইউনিটের শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়ন সংযুক্ত রয়েছে।

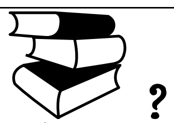
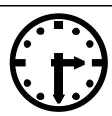
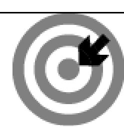
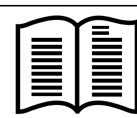
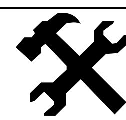
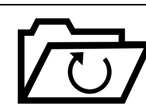
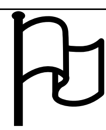
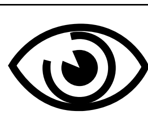
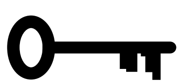
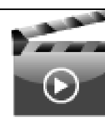
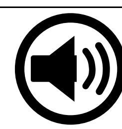
অধ্যয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

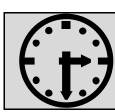
শিক্ষার্থীরা যাতে এই বই পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল :

- ইউনিটের শিরোনাম, ভূমিকা ও উদ্দেশ্য পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন। কোথাও চিত্র থাকলে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তু মিলিয়ে পড়ুন।
- কোন ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- প্রতিটি ইউনিটের বিষয়গুলো ভালভাবে বোঝার ক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীর কাজ (অ্যাকটিভিটি) সংযোজন করা রয়েছে। ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালভাবে অধ্যয়ন করে অ্যাকটিভিটিগুলো সম্পন্ন করুন।
- অধ্যয়নের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের সমস্যাগুলো নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করুন। ইউনিট-এর শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভাল করে পড়ুন এবং সমস্যার সঠিক সমাধানের চেষ্টা করুন। চূড়ান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রয়োজনে সহপাঠিদের সাথে সমস্যার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন, দেখবেন সমাধানের পথ সহজ হয়ে গেছে।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল ইউনিটকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রত্যেক টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের (শিক্ষকের) সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যায়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পূরো কোর্স মডিউল এর কোন্‌টি শিখনফল, কোন্‌টি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোন্‌টি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোন্‌টি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে এই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হল।

 কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	 কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	 উদ্দেশ্য	 বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	 শিক্ষার্থীর কাজ	 সারসংক্ষেপ
 পাঠোত্তর মূল্যায়ন	 চূড়ান্ত মূল্যায়ন	 উত্তরমালা	 ভিডিও বা দেখা	 অডিও বা শোনা	 সাহায্য/প্রয়োজনে

 **কোর্স সমাপ্তির সময়**	**কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩৬ সপ্তাহ**

অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র বিষয়ের অনেকগুলো অডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার এবং ভিডিও প্রোগ্রাম বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এ সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। এ সময় পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্রের বিষয়গুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

সাহায্য/ প্রয়োজনে	**সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–**	**সুদীপ রায়** **সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)** **ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু **পৃষ্ঠা নং**

মানবণ্টন

পূর্ণমান : ১০০

১. সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন – ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)
৯টি প্রশ্ন হতে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ নম্বর।

প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

ক. জ্ঞানমূলক
খ. অনুধাবনমূলক
গ. প্রয়োগমূলক
ঘ. উচ্চতর চিন্তনমূলক

২. সৃজনশীল বহুনির্বাচনী প্রশ্ন – ৪০ নম্বর (৮×৫ = ৪০)
৪০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে, ৪০টির উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

ক. জ্ঞানমূলক
খ. অনুধাবনমূলক
গ. প্রয়োগমূলক
ঘ. উচ্চতর চিন্তনমূলক

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ধারা

ইউনিট ১

বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব অনস্বীকার্য। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গোড়াপত্তন হওয়া ব্রিটিশ শাসন কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনেনি, এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। এ শাসন ১৭৫৭ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ একশত নব্বই বছর বহাল ছিল। অনেক আন্দোলন সংগ্রাম, সংস্কার ও রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, ইলা মিত্রের মতো বিপ্লবীরা যেমন রক্ত দিয়েছে তেমনি ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো অনেক নেতারও জন্ম দিয়েছে। সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে অনেক নতুন রীতি-নীতি, আইন ও পদ্ধতি। আলোচ্য ইউনিটে পলাশীর যুদ্ধ, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনসমূহ তুলে ধরে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ পলাশীর যুদ্ধ ও কোম্পানি শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আগমন ও কোম্পানির শাসন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ঢাকার বাণিজ্য কুঠি, দস্তক, সমন্দ, পলাশী প্রান্তর, মীরজাফর, স্বাধীনতার সূর্য।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আগমন

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশদের একটি বণিক সংঘ। ১৬০০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের রাণী এলিজাবেথ ২১৭ জন বণিককে এই প্রাইভেট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গঠন করার সনদ (charter) প্রদান করেন। এই কোম্পানিকে ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে ব্যবসা করার একচেটিয়া অধিকার দেয়া হয়। ইংরেজদের এ অঞ্চলে আগমনের পূর্বেই পর্তুগিজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা এদেশে বাণিজ্য শুরু করে। বাণিজ্য সংক্রান্ত আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এদের সঙ্গে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হয়। শেষ অবধি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারের পাশাপাশি নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত করতে সক্ষম হয়।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের প্রথম বাণিজ্য কুঠি ভারতের পশ্চিম উপকূলে বন্দর সুরাতে (১৬১৩ খ্রিঃ) স্থাপন করে। এর প্রায় বিশ বছর পর ১৬৩৩ সনে কোম্পানি নামে মাত্র বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বোধন করে। তবে এ অঞ্চলে বাণিজ্য লাভজনক না হওয়ায় কোম্পানি এ নিয়ে প্রথম বিশ বছর বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকে। পরবর্তীতে কোম্পানি ১৬৫০ সনে বাংলায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৬৫১ সালে হুগলীতে স্থাপন করে প্রথম বাণিজ্যকুঠি। এই ঘটনাকে বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পথে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ১৬৮৬-৯০ সালে এ্যাংলো-মুঘল যুদ্ধ, এর পর সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক বাৎসরিক থোক তিন হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের শর্তে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করাসহ কোম্পানি প্রতিনিধি জব চার্নককে সুতানুটিতে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা। ১৬৯৮ সনে কোম্পানিকে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রামের জমিদারি সনদ প্রদান করা এবং কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখ শিয়ার কোম্পানিকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে। মাদ্রাজ, বোম্বে ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে কোম্পানির বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

পলাশীর যুদ্ধ ও কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠা

১৭১৭ সালের বাদশাহী ফরমান নবাব ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ শীতল করে তোলে। নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর তার দোহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণ (১০ এপ্রিল, ১৭৫৬) করেন এবং কোম্পানির প্রতি তাঁর নীতি ঘোষণা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ইংরেজদের উপস্থিতি এ দেশের স্বার্থের প্রতিকূল।

ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়নে তিনটি কারণ নিম্নরূপ

প্রথমত, দেশের প্রচলিত আইন-কানুন অমান্য করে কলকাতার দুর্ভেদ্য দুর্গ ও পরিখা স্থাপন।
দ্বিতীয়ত, বেআইনীভাবে কোম্পানির নামে ব্যক্তি পর্যায়ে দস্তক (বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার পাশ) বিতরণ করে সরকারকে বৈধ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করা এবং তৃতীয়ত, জমিদারি ইজারার নিয়ম ভঙ্গ করে ইংরেজদের কলকাতা জমিদারীকে নিজেদের সার্বভৌম এলাকা হিসেবে গণ্য করা ও নবাবি আইন-আদালত থেকে পালিয়ে আসা অনেক অপরাধীকে কলকাতায় কোম্পানি কর্তৃক আশ্রয় প্রদান।

কোম্পানির প্রতি নবাবের ঘোষিত নীতির কারণে ইংরেজদের সাঙ্গে নবাবের বেশ কয়েক দফা যুদ্ধ ও শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। বস্তুত সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে নানা কারণে মনঃক্ষুন্ন ঘরের শত্রু শওকত জং, ঘষেটি বেগম দরবারের শত্রু আমাত্য ও বেনিয়া সম্প্রদায় এবং বহিঃশত্রু ইংরেজদের সঙ্গে। নবাবের অভ্যন্তরীণ শত্রুদের কাজে লাগিয়ে ইংরেজরা নবাবকে উৎখাতের এক নীল নকশা তৈরি করে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে নবাবের বাহিনীর এক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। তবে একে যুদ্ধ না বলে পাতানো খেলা বলা ভালো। কারণ যুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের নেতৃত্বাধীন অধিকাংশ সৈন্য নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে, যার ফলে নবাবের পরাজয় ঘটে। বন্দী অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে।
পলাশীর যুদ্ধের দুই ধরণের ফলাফল আছে; প্রথমত অব্যবহিত ফলাফল এবং দ্বিতীয়ত সুদূর প্রসারী ফলাফল। পলাশী যুদ্ধের পরপরই এ অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ইংরেজরা চরম লুণ্ঠনযজ্ঞ চালাতে থাকে, বাংলার সম্পদ পাচার

হতে থাকে। ইংরেজরা স্থানীয় ব্যবসায় যোগদান করে, যার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, পলাশী যুদ্ধের সুদূর প্রসারী ফলাফল ছিল রাজনৈতিক। পলাশীর পরিণতিতে বাংলার প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে এবং ভিত্তি রচিত হয় নতুন প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের।

পলাশী যুদ্ধের পর ষড়যন্ত্র মোতাবেক মীর জাফর বাংলার নবাব হন। কিন্তু মাত্র তিন বছর পর তিনি নিজ জামাতা মীর কাশিমের ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং নবাবী হারান। মীর কাশিম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিংহাসনে আরোহণ করলেও দেশের স্বার্থে কাজ করা শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে ইংরেজদের সাথে তাঁর যুদ্ধ (১৭৬৩) হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত হলে তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এরপর আবার নবাব হন মীর জাফর। মূলত ইংরেজরা পুতুল নবাব পছন্দ করতেন, কোনো স্বাধীনচেতা নবাব তাদের পছন্দ ছিল না। কোম্পানি সরাসরি শাসনভার হাতে না নিলেও দেশীয় রাজার মসনদে থাকা না থাকা ছিল তাদের ইচ্ছার ব্যাপার। এভাবে পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানিই দেশের শাসনকর্তা হয়ে ওঠে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের একচ্ছত্র আইনগত ক্ষমতা লাভ করে। ১৭৭২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' এর মাধ্যমে ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্ণর জেনারেল এবং চার সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টামণ্ডলীর বিধান করে কলকাতায় সর্বপ্রথম কোম্পানি একটি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এরপর ধীরে ধীরে এই কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রসারিত হয়। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং এর স্থলে ব্রিটিশ রাণীর সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পলাশী যুদ্ধের সুদূর প্রসারী ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জড়িত হয় মূলত বাণিজ্যিক স্বার্থে। বাংলা তথা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে যোগদান করতে এসেছিল ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজসহ নানান ইউরোপিয় দেশের বণিকেরা। তারা স্থানীয় শাসক ও বণিকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্যের পাশাপাশি স্থানীয়দের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বাংলার নবাবকে মসনদ থেকে উৎখাত করে। বাণিজ্য রূপান্তরিত হয় রাজনৈতিক আধিপত্যে। স্থাপিত হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পলাশীর যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

(ক) ১৭৫৭ সালে (খ) ১৮৫৭ সালে (গ) ১৯০৫ সালে (ঘ) ১৯৪৭ সালে

২। ব্রিটিশ ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান হয় কত সালে

(ক) ১৭৫৪ সালে (খ) ১৭৫৭ সালে (গ) ১৮৫৮ সালে (ঘ) ১৮৫৭ সালে

৩। মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করায়−

(i.) বাংলার নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন

(ii.) কোম্পানি সরাসরি প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়

(iii.) কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.২ সশস্ত্র প্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে সংগঠিত বিভিন্ন প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- হাজী শরীয়তুল্লাহ্, দুদু মিঞা ও তিতুমীরের সশস্ত্র প্রতিরোধ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভূমি রাজস্ব, ব্রিটিশ বিরোধী, ফরায়েজী, নির্যাতন, লাঠিয়াল বাহিনী, কুসংস্কার, বাঁশের কেল্লা

ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নেয়াটাই ছিল ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাথমিক যুগের শাসনের অন্যতম লক্ষ্য। মূলত একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে কোম্পানির অভিজ্ঞতা ছিল বাণিজ্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ। দেশ শাসন সম্পর্কে কোম্পানির কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে শাসন সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উর্বরতম ক্ষেত্র ছিল ভূমি রাজস্ব শাসন। তাদের শাসন-শোষণে চিরায়ত গ্রামীণ সমাজ কাঠামো দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল। কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাতের জন্য কোম্পানি সরকার শশব্যস্ত থাকলেও খরা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। শুধু তাই নয় কৃষকদের জন্য অলাভজনক হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে কৃষকদের নীল ও লবণ চাষে বাধ্য করা হত। এমতাবস্থায়, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহের জন্ম হয়। এর মধ্যে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৭০-১৭৯০), রংপুর কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), সন্দীপ বিদ্রোহ (১৭৬৪), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৭-৮৭), যশোর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ (১৭৮৪-১৭৯৬), পাগলাপন্থা বিদ্রোহ (১৮২৩-১৮৩৩), ফরায়েজী আন্দোলন (১৮২০-১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০), পাবনা কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-১৮৭৩) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আঠার-উনিশ শতকে বাংলার এই বিদ্রোহগুলো ছিল প্রাক-রাজনৈতিক, কেননা এগুলো ছিল মূলত ধর্মীয়, অপরিকল্পিত, অসংগঠিত, এবং স্বত:স্ফূর্ত। তবে সীমাবদ্ধতা স্বত্তেও এসব বিদ্রোহ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ফরায়েজী আন্দোলন ও তিতুমীরের কৃষক বিদ্রোহ

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রাম সংগঠিত হয়। এরূপ বিদ্রোহের মধ্যে ফরায়েজী আন্দোলন ও তিতুমীরের নেতৃত্বাধীন কৃষক বিদ্রোহ ছিল অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাথমিকভাবে এ আন্দোলনগুলো ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। মুসলমানদের পাঁচটি ফরয কাজের উপর গুরুত্বারোপ করে ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনা। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁর সন্তান মুহাম্মদ মহসীন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়ার (১৮১৯-১৮৬২) নেতৃত্বে দ্রুত এটি কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ও ফরায়েজী আন্দোলন

হাজী শরীয়তুল্লাহ্ ১৭৮১ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষায় সুপন্ডিত ছিলেন। ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮ বছর বয়সে মক্কা গমণ করেন এবং ২০ বছর সেখানে অবস্থান করেন। দেশে ফিরে তৎকালীন মুসলমান সমাজের দুরাবস্থা দেখে তিনি খুবই ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হন। এমতাবস্থায়, তিনি মুসলমান সমাজকে "শুদ্ধকরণের" যে আন্দোলন শুরু করেন তা ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিতি। এছাড়াও তিনি প্রজাসাধারণের উপর চলে আসা সকল শোষণ, বঞ্চণা ও নির্যাতন রুখে দাঁড়ানোরও আহবান জানান। তাঁর নেতৃত্বে এ আন্দোলন দ্রুত ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন

হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর তাঁর পুত্র দুদু মিঞা ফরায়েজী আন্দোলনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ফরায়েজী আন্দোলনকে একটি সুবিন্যস্ত ও শক্তিশালী সাংগঠনিক রূপ দেন। ফরায়েজী আন্দোলনভূক্ত সমগ্র অঞ্চলকে তিনি কয়েকটি সার্কেলে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি সার্কেল দেখাশুনার দায়িত্বভার একজন খলিফা বা প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত করা হয়। অত্যাচারী জমিদার নীলকরদের মোকাবেলায় একটি সুশৃংখল লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। জমিদার-নীলকরদের সঙ্গে দুদু মিয়ার বাহিনীর বেশ কয়েকবার সরাসরি সংঘর্ষ বাঁধে। এর মধ্যে ১৮৪৬ সালে মাদারীপুরের ইংরেজ নীলকর ডানলপের সাথে সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় দুদু মিয়াকে বন্দী করা হয়। পরবর্তীতে মুক্তিলাভ করে তিনি ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। ১৮৬২ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

তিতুমীরের কৃষক বিদ্রোহ

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিতুমীর প্রথম জীবনে নদীয়া জেলার জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি হজ্জ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যান। সেখানে গিয়ে ওহাবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেলভির সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন।

তিতুমীর দেশে ফিরে একদিকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন অপরদিকে জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। শীঘ্রই পশ্চিম বাংলার বিশাল অঞ্চল জুড়ে তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। অত্যাচারী নীলকর, জমিদার ও ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে একাধিক জায়গায় তিতুমীরের বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। চূড়ান্ত সংঘর্ষ বাঁধে বারাসাতের অদূরে নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে। সেখানে তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে শাসকগোষ্ঠির আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত কর্ণেল সুয়ার্টের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনীর কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এ সম্মুখ যুদ্ধে ৫০ জন সহযোদ্ধাসহ তিতুমীর শহীদ হন। এভাবে তিতুমীরের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	তিতুমীরের সশস্ত্র প্রতিরোধের মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

কোম্পানির দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানায় প্রায় সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ। বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কারণ ছিল। শুরুর দিকের প্রতিরোধ সংগ্রামের একটি সাধারণ লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করা। যদিও এ সকল প্রতিরোধ-সংগ্রাম ছিল বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক। তথাপি এ সমস্ত আন্দোলন পরবর্তীতে সকল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ছিলেন-

(i) হাজী শরীয়তুল্লাহ

(ii) তিতুমীর

(iii) নবাব আব্দুল লতিফ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। দুদু মিয়ার পুরো নাম কী?

(ক) নেসার আলী (খ) মুহাম্মদ মহসীন উদ্দীন

(গ) মীর লতিফ (ঘ) শওকত বেগ

পাঠ-১.৩ সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৭

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বিদ্রোহী পরবর্তী অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বাধীনতা সংগ্রাম, শোষণ-বঞ্চনা, অসম্মান, লুণ্ঠনযজ্ঞ, কালাপানি, স্বত্ব-বিলোপ, মঙ্গল পান্ডে, ভাইসরয়।

সিপাহী বিদ্রোহ

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ব্রিটিশদের প্রায় দু'শ বছরের শাসনামলে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত হয়। শুরুর দিকের আন্দোলন-সংগ্রাম ছিল বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এবং এগুলো খুব বেশী সফলতার মুখ দেখেনি। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ব্রিটিশদের এ অঞ্চল সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। অনেক ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহ'কে ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণসমূহ

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ কোন একক কারণে হয়নি। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পরে কোম্পানির একশ বছরের অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদ হল সিপাহী বিদ্রোহ। বিভিন্ন কারণে সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়, নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

- **রাজনৈতিক কারণ :** কোম্পানির বিভিন্ন কার্যকলাপ ও পদক্ষেপ এ দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস করে। লর্ড ডালহৌসীর 'সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি ও স্বত্ব বিলোপ নীতি' দ্বারা দেশীয় অনেক নবাব ও রাজা তাদের রাজ্য হারান। কুশাসনের অভিযোগে অযোধ্যা ও নাগপুর রাজ্য দখল করে নেয়া হয়। তাছাড়া বিভিন্ন উপায়ে মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে অপমাণিত ও অসম্মান করা হয়।
- **অর্থনৈতিক কারণ :** কোম্পানির একশ বছরের শাসনে এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে নাজুক হয়ে পড়ে। কোম্পানি প্রবর্তিত নতুন ভূমি ও খাজনা নীতি যেমন কৃষকদের ভূমিহীন করেছিল তেমনি অনেক জমিদারও তাদের জমিদারি হারান। ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া কোম্পানি এদেশ থেকে মূল্যবান ধাতু ও ধনসম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করতে থাকে। কোম্পানির এ লুণ্ঠনযজ্ঞ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে।
- **সামরিক কারণ :** কোম্পানির সামরিক বাহিনীতে ৮৭ ভাগ ছিল দেশীয় সিপাহী। তথাপি ভারতীয় ও দেশীয় সৈন্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য ছিল। দেশীয় সৈন্যরা সর্বোচ্চ পদোন্নতি পেত সুবেদার পর্যন্ত। তাছাড়া একজন ব্রিটিশ সৈন্য অবসর গ্রহণ করত ৭০ বছর বয়সে যেখানে একজন ভারতীয় অবসর পেত মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। এছাড়া ১৮৫৬ সালে লর্ড ক্যানিং 'General Service Enlistment Act' নামক একটি আইন পাশ করে। এতে বলা হয় দেশীয় সিপাহীদের প্রয়োজনে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূর দেশে গিয়ে কাজ করতে হবে। হিন্দু সিপাহীগণ সমুদ্র পাড়ি দেওয়াকে ধর্ম বিরুদ্ধ মনে করত। ফলে তাদেরকে 'কালাপানি' অর্থাৎ সমুদ্র পাড়ি দিতে বাধ্য করায় তাদের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয়।
- **প্রত্যক্ষ কারণ/তাৎক্ষণিক কারণ :** কোম্পানি সামরিক বাহিনীতে 'Enfield Rifle' নামক এক প্রকার নতুন অস্ত্রের প্রচলন শুরু করে, যার কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে হত। গুজব রটে যে, এ কার্তুজে শুকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত আছে যা যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ে ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এ ঘটনা সিপাহীদের বিদ্রোহী করে

তোলে এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় যা মূলত ইংরেজদের প্রতি একশ বছর ধরে জমে থাকা ক্ষোভের বহি:প্রকাশ।

বিদ্রোহের বিস্তার : ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুর প্যারেড গ্রাউন্ডে এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহার করতে বলা হলে সিপাহীদের মধ্য থেকে 'মঙ্গল পান্ডে' নামক একজন সিপাহী প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন। ক্রমে এটি বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে এবং মিরাট, দিল্লী, বেরুলী, কানপুর, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, কলকাতা, বিহার, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে ভারতের বাদশাহ ও বিদ্রোহের নেতা ঘোষণা করেন। মারাঠা নেতা নানা সাহেব, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাই, মৌলভী লিয়াকত আলী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। ১৮৫৭ সালে প্রথমত সিপাহীরা এ বিদ্রোহ শুরু করলেও পরবর্তীতে সাধারণ মানুষও এতে অংশগ্রহণ করে। ইংরেজরা কঠোর হাতে এ বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহ এক বছরের কিছু বেশী সময় স্থায়ী ছিল।

ফলাফল ও মূল্যায়ন : সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। এ বিদ্রোহ সফল না হলেও এটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূলে প্রচন্ড আঘাত হানে। ১৮৫৮ সালে বিদ্রোহ শেষে এক ঘোষণা বলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন এবং অবসান হয় একশ বছরের কোম্পানি শাসন। ব্রিটিশ রাজ 'স্বত্ব বিলোপ নীতি' বাতিল ঘোষণা করে। সামরিক বাহিনীতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ভারতবর্ষের বিষয়াবলী দেখাশোনার জন্য 'ভাইসরয়' নামক একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। এভাবে ইংরেজরা তাদের শাসনকার্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সিপাহী বিদ্রোহকে ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন বলা হয় কেন?

সারসংক্ষেপ

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের একশ বছরের শাসনামলে এ দেশের মানুষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিকসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষণ ও অত্যাচার করে। কোম্পানির প্রতি জমে থাকা ক্ষোভ ও অসন্তোষের বহি:প্রকাশ ঘটে সিপাহীদের মাধ্যমে। তাই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সফল না হলেও এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাংখা সৃষ্টি হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সিপাহী বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়?

(ক) ১৭৫৭ সালে (খ) ১৯৪৭ সালে
(গ) ১৮৫৭ সালে (ঘ) ১৯০৫ সালে

২। 'কালাপানি' কী?

(ক) মরুভূমি (খ) নদী
(গ) সমুদ্র (ঘ) পর্বত

পাঠ-১.৪ ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ ও ১৮৯২

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের বিভিন্ন ধারা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন সভা, গভর্ণর জেনারেল, নির্বাহী পরিষদ, পরোক্ষ নির্বাচন।

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে একশ বছরের কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। ব্রিটিশ রাজ এ অঞ্চলের শাসন ভার স্বহস্তে তুলে নেয়। এ সময় ভারতবর্ষে ধাপে ধাপে ব্রিটেনের অনুকরণে আইন সভার উদ্ভব হয় । বস্তুত ১৮৫৮ সালের পরবর্তী বিভিন্ন ভারত শাসন আইনের মধ্যেমেই এ দেশে শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের শাসনকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করা। ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১. গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদ ৫ জন সাধারণ সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।
২. আইন সভা গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের ৫ জন সাধারণ সদস্য ছাড়াও ন্যূনতম আরো ৬ জন এবং অনধিক ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। অতিরিক্ত সদস্যগণ গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক দুই বছরের জন্য মনোনীত হন এবং এই সদস্যদের অর্ধেক বেসরকারি সদস্য।
৩. গভর্ণর জেনারেল নির্বাহী ও আইন উভয় পরিষদের সভাপতি।
৪. আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত যে কোন বিলে সম্মতি প্রদান, ভেটো প্রদান বা ব্রিটিশ রাণীর জন্য সংরক্ষিত রাখার অধিকার গভর্ণর জেনারেলকে প্রদান করা হয়।
৫. গভর্ণর জেনারেলের পূর্বানুমতি ছাড়া সরকারি ঋণ, সেনাবাহিনী, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কোন বিল আইন সভায় উত্থাপন করা যেত না।
৬. আইন সভার সদস্যগণ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উত্থাপিত কোন বিষয়ে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ দান করতে পারত। তবে কোনরূপ প্রশ্ন করার অধিকার ছিল না।
৭. এ আইন দ্বারা বোম্বে ও মাদ্রাজের প্রাদেশিক আইন সভা পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করা হয়।
৮. এ আইন দ্বারা বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য নতুন আইন সভার বিধান করা হয়।

মূল্যায়ন

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। নির্বাহী পরিষদ ও আইন সভা উভয় ক্ষেত্রে সরকারি সদস্যদের প্রাধান্য ছিল। বেসরকারি সদস্যদের মধ্যে রাজ অনুগত ভারতীয়দের মনোনীত করা হয়। গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বহাল ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও এ আইন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর ফরে ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল আইন সভার ভিত্তি রচিত হয়।

১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন

১৮৬১ সালের তিন দশক পর ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাশ হয়। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অপরদিকে ব্রিটিশ শাসকগণ ১৮৬১ সালের আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এমতাবস্থায়, লর্ড ডাফরিনের চেষ্টায় ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারতীয় কাউন্সিল আইন প্রণীত হয়। এ আইনের প্রাধান বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১. এ আইনে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এতে কমপক্ষে ১০ জন এবং সর্বাধিক ১৬ জন অতিরিক্ত সদস্য রাখার বিধান করা হয়।
২. বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভার সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়।
৩. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইন সভায় সরকারি সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও প্রাধান্য অব্যাহত থাকে।
৪. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইন সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি এ আইনে সম্প্রসারিত হয়।
৫. আইন সভার সদস্যবৃন্দ বাজেট আলোচনা ও প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার লাভ করে।
৬. আইন সভার বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার নীতি স্বীকৃত হয়।

মূল্যায়ন ঃ
১৮৯২ সালের আইনও ভারতীয়দের প্রত্যাশার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। আইন সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি বৃদ্ধি করা হলেও তা ছিল সীমিত। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির প্রচলন।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৮৬১ ও ১৮৯২ এর মূল পার্থক্য চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন শাসন কার্যে আরো অধিক পরিমাণে ভারতীয়দের অংশগ্রণের সুযোগ করে দেয়। এ সকল আইনের ধারাবহিকতায় ব্রিটিশ রাজ পরবর্তীতে আরো অনেক আইন প্রবর্তন করে যা ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক বিকাশ সাধিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদ কয়জন সাধারণ সদস্য নিয়ে গঠিত হত?
(ক) তিনজন (খ) চারজন
(গ) পাঁচজন (ঘ) ছয়জন

২। কাউন্সিল আইন অনুসারে শাসনকার্যের সর্বেসর্বা কে?
(ক) সরকারি সদস্য (খ) বেসরকারি সদস্য
(গ) রাজ অনুগত নাগরিক (ঘ) গর্ভণর জেনারেল

৩। ১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইনকে বলা হয়
i. উগ্র জাতীয়তাবাদের পথ প্রদর্শক
ii. প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক ধাপ
iii. সংসদীয় সরকারের ভিত্তিস্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৫ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পৃষ্ঠপোষকতা, ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রতিনিধি, নেতৃত্ব, আনুগত্য, স্বকীয়তা।

ভারতীয় কংগ্রেস হল ভারতীয়দের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও অচিরেই এ দলের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এ দলের নেতৃত্বে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে।

পটভূমি

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির জাতীয়তাবাদী চেতনার একটি সর্বভারতীয় প্রকাশ। ঔপনিবেশিক শাসনামলে এ অঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও দেশের বিভিন্ন জেলায় সরকারি স্কুল-কলেজ ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবকাঠামো রচিত হয়। তাছাড়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সুনির্দিষ্ট দাবি-দাওয়া ভিত্তিক এসোসিয়েশন বা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। যেমন, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), কলকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৫১), সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৭৬), বোম্বে এসোসিয়েশন (১৮৫২) ইত্যাদি।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে উপনিবেশিক ভারতে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের এক ধরণের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সালে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে দু'বার 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার তাগিদ থেকেই তিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৮৫ সালে ২৮ ডিসেম্বর বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাঙালি আইনবিদ উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ৭২ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ আই.সি.এস. অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। এ ব্যাপারে হিউম বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এ উদ্যোগের পেছনে ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ব্রিটিশরা লক্ষ্য করে যে, ভারতবর্ষে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় সময়ের ব্যাপার মাত্র। তখন সে প্রতিষ্ঠান ও তার নেতৃত্ব যাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থাকে, তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন অনুভব করে। তাই ব্রিটিশরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বলে কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন। অপরদিকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ভারতীয়দের মধ্যে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে দাদাভাই নওরোজি, ফিরোজ শাহ মেহতা, এ টি তেলাঙ্গা, বদরুদ্দীন তৈয়বজি, সুব্রামানিয়াম আয়ার, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালীন নীতি-আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য।
২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ আঞ্চলিকতার সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
৩. সরকারি চাকরিতে ভারতীয়দের যথোপযুক্ত সংখ্যায় নিয়োগ।
৪. শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা।
৫. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন।

৬. আইন সভা পুনর্গঠন করে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ও ক্ষমতার সম্প্রসারণ।

মোট কথা, কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থেকে যতদূর সম্ভব উল্লেখিত স্বার্থসমূহ আদায়ের চেষ্টা করা।

কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালীন অধিবেশনে উপস্থিত ৭২ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ০২ জন ছিলেন মুসলমান। পরবর্তী অধিবেশনসমূহে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা ছিল নগণ্য। ইংরেজী শিক্ষাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য ছিল। শুরুতে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করায় হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে যায়। এ প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসে কার্যত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য ছিল। এ সকল নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো অধিবেশনে যোগদান করা থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। হিন্দু প্রাধান্য রয়েছে এমন কোনো দলে যোগদান করলে স্বকীয়তা হারিয়ে যেতে পারে এ আশংকা তাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল। এক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয় ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	‘ভারতীয় কংগ্রেস ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত’ এ কথার অর্থ কী?

সারসংক্ষেপ

ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্যোগে ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। তবে কংগ্রেস পরবর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। অপরদিকে, কংগ্রেস একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু নানাবিধ কারণে সংগঠনটি ভারতের মুসলমানদের ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন কে?
(ক) অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম (খ) মহাত্মা গান্ধী (গ) জওহর লাল নেহেরু (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

২। ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়–
i. ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর
ii. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়
iii. বোম্বাই শহরে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হবে এ প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি। এখানে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে?
(ক) ভারতীয় কংগ্রেস (খ) মুসলিম লীগ (গ) কৃষক প্রজা আন্দোলন (ঘ) মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন

পাঠ-১.৬ বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ ও বঙ্গভঙ্গ রদ, ১৯১১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বঙ্গভঙ্গের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বঙ্গভঙ্গের ফলাফল চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ বলতে পারবেন।
- বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শাসন ব্যবস্থা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক, অর্থনৈতিক, কেন্দ্রস্থল, রাজনৈতিক সংগঠন।

বাংলা ও ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতের যে রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি হয় তা পরবর্তীতে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

বঙ্গভঙ্গ

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ। ব্রিটিশ সরকার শাসনকাজে সুবিধার জন্য বাংলা প্রদেশকে বিভক্তিকরণের কথা চিন্তা করতে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন স্যার বাম্পফিল্ড ফুলার এবং স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে বড়লাট লর্ড কার্জন ও বাংলা বিভক্তিকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। অতপর ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আসামকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়। এর রাজধানী হয় ঢাকা। নতুন প্রদেশের রাজধানী ছিল ১,০৬,৫০৪ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এ প্রদেশে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বঙ্গভঙ্গের কারণ

ব্রিটিশ সরকার প্রধানত প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গ করলেও এর পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল:

শাসনতান্ত্রিক কারণ

১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন অনুসারে সৃষ্ট বাংলা প্রদেশ ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এই বিশাল আয়তনের শাসনভার একজন গভর্ণরের উপর ন্যস্ত ছিল। ফলে শাসনতান্ত্রিক শৃংখলা রক্ষা ছিল দুরূহ ব্যাপার। তাই বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার জন্য ব্রিটিশরা চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। অবশেষে লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

রাজনৈতিক কারণ

বিশ শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় জনসাধারণের মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলা প্রদেশ ছিল অনেক অগ্রসর। বলা হত 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow' এ কারণে ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে ভাগ করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ভাগ করতে চেয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

সামাজিক কারণ

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে নানাবিধ কারণে মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে থাকে। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা ভেবেছিল বাংলাকে ভাগ করলে তারা তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

অর্থনৈতিক কারণ

বাংলা প্রদেশের রাজধানী কলকাতা হওয়ায় সকল ব্যবসা বাণিজ্য ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। তাছাড়া কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয়। এই বাস্তবতা বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে উচ্চবর্গের অনেক মুসলমানকেও আকৃষ্ট করে।

ভাগ কর, শাসন কর নীতি

বঙ্গভঙ্গ করার প্রস্তাব ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে আসে। বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের দাবির ফসল ছিল না। পরবর্তীকালে এর ঘোর সমর্থক ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ স্বয়ং শুরুতে এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। কার্যত এটি ছিল ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির ফল। মূলত হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাকে ভাগ করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলার জনগণের সার্বিক উন্নতি হবে এ আশাবাদ থেকে পূর্ববাংলায় নতুন প্রদেশের প্রতি সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় প্রধানত দুইটি কারণে বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধিতা করে। প্রথমত, বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য, ইত্যাদি সবকিছু কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে তাদের স্বার্থে চরম আঘাত লাগে। দ্বিতীয়ত, দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতৃবৃন্দের নিকট বাংলা বিভক্তি ছিল 'মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ' এর মত। বঙ্গভঙ্গকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র বলে অ্যাখায়িত করে তাঁরা এর ঘোর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। এ সকল কারণে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দ্রুত বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে, স্বদেশীপণ্য ব্যবহার এবং বিদেশী পণ্য বর্জনের কর্মসূচি যুক্ত হয়। এক পর্যায়ে আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, রাজশাহীসহ পূর্ব বাংলায় বহু স্থানে হিন্দু-মসুলমান সম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। আন্দোলন তীব্র হলে ব্রিটিশ সরকার নত হতে বাধ্য হয়। **১৯১১** সালের **১২** ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে, তিনি ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের কথা বলেন।

বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল

বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশে তাৎক্ষণিক কিছু উন্নয়ন কর্মকান্ড সাধিত হলেও বাঙালির অখন্ড চেতনার জন্য তা ছিল আত্মঘাতমূলক। হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠনের আবশ্যকতা তুলে ধরে।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন বাঙালির মধ্যে জাতিসত্তা বোধ জাগিয়ে তোলে। অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। **১৯১১** সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার জনগণের মাঝে একটি সাম্প্রদায়িক রেখা সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গভঙ্গ কী সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করেছিল?

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা বিভাগকে স্থায়ী ব্যবস্থা বলেছিল, যদিও নতুন প্রদেশ সৃষ্টির ৬ বছরের মধ্যে তা বাতিল ঘোষিত হয়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ঘটে। বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক রাজনীতিতে ব্রিটিশদের অনুসৃত 'ভাগ কর ও শাসন কর নীতি' প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বঙ্গভঙ্গ সংগঠিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯০৩ সালে
(খ) ১৯০৫ সালে
(গ) ১৯০৬ সালে
(ঘ) ১৯১১ সালে

২। বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার মূল কারণ কোনটি?

(ক) বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন
(খ) মুসলমানদের দুর্বল রাজনীতি
(গ) ব্রিটিশ স্বার্থ
(ঘ) হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপন

৩। বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন হিসেবে যৌক্তিক হলো–

i. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতি
ii. ব্রিটিশদের ‘ভাগ কর ও শাসন কর-’ নীতির বিজয়
iii. মুসলিম লীগের জন্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৭ মুসলিম লীগ, ১৯০৬

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন;
- মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর বিকাশ ধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক সংগঠন, আলিগড় আন্দোলন, প্রতিনিধিত্ব স্বতন্ত্র, পৃথক নির্বাচন

মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ২১ বছর পর মুসলমানরা নিজেদের জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী করে। পরবর্তীতে এ রাজনৈতিক দলের দাবি অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়।

পটভূমি

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি মুসলমানদের এতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। কারণ তিনি আশংকা করেছিলেন সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত হলে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলবে। তিনি মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন।

মুসলিম লীগ

তিনি মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরের বছর তিনি ‘অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স’ বা শিক্ষা সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন। আলীগড়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় তাঁর শিক্ষা আন্দোলন যা ‘আলীগড় আন্দোলন’ নামে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা এখানে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ ও এর রদ আন্দোলন অন্যতম কারণ ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন শুরু হয়। বাংলায় বঙ্গভঙ্গের প্রধান সমর্থক ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ। এ সময় তিনি ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন।

অপরদিকে, ১৮৯২ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে তা সম্প্রসারিত করা হয়। তবে এসব সংস্কার প্রতিনিধি নির্বাচনে অনগ্রসর ও অসংগঠিত মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। ১৯০৬ সালের ২০শে জুলাই জন মর্লি ব্রিটিশ ভারতের শাসনকার্যে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব আরো বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা ভারতীয় মুসলমানদের চিন্তিত করে তোলে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের শীর্ষস্থানীয় ৩৫ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী জানান। লর্ড মিন্টো মুসলমানদের তাঁদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের ২০তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকায় মিলিত হন। এর আগে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে নেতৃস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট

প্রচারপত্র প্রেরণ করেন। ৩ দিনব্যাপী শিক্ষা সম্মেলন শেষে চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ৩০ শে ডিসেম্বর মুসলিম নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক অধিবেশনে মিলিত হন। ভারতের বিভিন্ন অংশের মোট ৬৮জন প্রতিনিধি এ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে নবাব ভিকার-উল-মুলক ও নবাব মোহসীন-উল-মুলক এ দু'জনকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৬০ সদস্য বিশিষ্ট অন্তবর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিকে গঠনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এভাবেই 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়।

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠাকালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত হয়-

১. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি করা।
২. ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে কোন প্রকার ভুল ধারণার জন্ম হলে তা দূর করা।
৩. ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং তাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশার কথা বিবেচনা ও আনুগত্যের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করা।
৪. মুসলিম লীগের অন্যান্য উদ্দেশ্য যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা।

মুসলিম লীগের বিকাশধারা

১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার পর ১৯০৮ সালে আলীগড়ে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে আগা খানকে সভাপতি ও সৈয়দ হাসান বিলগ্রামিকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত আগা খান লীগের স্থায়ী সভাপতি ছিলেন তবে মতপার্থক্যের কারণে তিনি ঐ একই বছর সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বস্তুত এ সময় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন, শিক্ষিত, স্বাধীন পেশায় যুক্ত, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ একটি অংশ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আসেন। এদের মধ্যে ফজলুল হক, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, সৈয়দ ওয়াজির হাসান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তি। কংগ্রেস ও লীগ মিলিতভাবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করে। তবে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটেনি। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বে জিন্নাহ মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪৮২টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১০৪টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনের পর থেকে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মুসলিম লীগ অতি দ্রুত গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার কারণ কী?

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত বিত্তবান এবং শিক্ষিত রক্ষণশীল মুসলমানদের নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তিন দশক পর্যন্ত মুসলীম লীগ কার্যত কোন সাংগঠনিক ভিত্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হতে পারেনি। পরবর্তীতে লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

(ক) ১৯০৫ সালে (খ) ১৯০৬ সালে

(গ) ১৯১১ সালে (ঘ) ১৯০৯ সালে

২। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের আলাদা সংগঠনের উৎসাহ দেন কেন?

(ক) কংগ্রেসের প্রতি আস্থাশীলতার জন্য

(খ) কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্য

(গ) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ধ্বংস করার জন্য

(ঘ) হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উৎসাহ দেয়ার জন্য

৩। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল

i. সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা

ii. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য নিশ্চিত করা

iii. মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া উত্থাপন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৮ মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯০৯

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের মূল্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সদস্য বৃদ্ধি, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, স্বরাজ, রাজনৈতিক চেতনা।

পটভূমি

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পূর্ববর্তী আইনসমূহ ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্রমাগত ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বিধানের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। অন্যদিকে, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ও রাজনৈতিকভাবে নিজেদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। এমনই এক পটভূমিতে ব্রিটিশ সরকারের ভারত সচিব লর্ড মর্লি এবং ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো আইন পাশ হয়।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো আইন এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. এ আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর নির্বাহী পরিষদের ৭ জন সদস্য ছাড়াও সর্বাধিক ৬০ জন অতিরিক্ত সদস্য এতে অন্তর্ভুক্ত হন।
২. প্রাদেশিক আইনসভাসমূহেরও সম্প্রসারণ করা হয়। বড় প্রদেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৫০ জন এবং ছোট প্রদেশের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ জন সদস্য থাকার বিধান করা হয়।
৩. এ আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। সদস্যরা বাজেট বা অর্থ বিল নিয়ে আলোচনা করার অধিকার লাভ করে।
৪. এ আইনে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী তাদের জন্য 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা' প্রবর্তন করা হয়।
৫. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয় বেসরকারি সদস্যগণ নির্বাচনের বিধান করা হয়। তবে অধিকাংশ সদস্যই নির্বাচিত হতেন পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে।
৬. এই প্রথমবার প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে সরকারি সদস্যদের স্থলে বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা হয়।
৭. এ আইনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়।

মূল্যায়ন

১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন পূর্ববর্তী সংস্কার আইনের তুলনায় অগ্রবর্তী পদক্ষেপ ছিল। যেমন- কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের সম্প্রসারণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি। তবে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান স্বরাজ বা স্বশাসনের দাবি পূরণে তা ব্যর্থ হয়। এ আইনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি যা ভারতীয় রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কোনো নীতিগত পরিবর্তন না করে প্রতিষ্ঠিত নীতির আওতাধীন থেকে ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায়ের আশা-আকাংখা পূরণ করাই ছিল এ আইনের লক্ষ্য। পূর্ববর্তী সংস্কার আইনের তুলনায় অগ্রবর্তী পদক্ষেপ হলেও তা ছিল ভারতীয়দের প্রত্যাশার তুলনায় অপ্রতুল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন কত সালে পাস হয়?

(ক) ১৮৮৫ সালে (খ) ১৯০৯ সালে

(গ) ১৯১৯ সালে (ঘ) ১৯৩৫ সালে

২। ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দানের প্রতি ব্রিটিশদের উদ্দীপ্ত করেছিল কোনটি?

(ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি (খ) মুসলিম লীগের রাজনীতি

(গ) ব্রিটিশদের উদারতা (ঘ) প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা

৩। মলি-মিন্টো সংস্কার আইন ব্যর্থ হওয়ার কারণ–

i. ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি

ii. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

iii. দায়িত্বশীল সরকারের প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৯ লক্ষ্ণৌ চুক্তি, ১৯১৬

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লক্ষ্ণৌ চুক্তির পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- লক্ষ্ণৌ চুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাম্প্রদায়িক ঐক্য, সমঝোতা, বিল পাশ, প্রতিনিধি, আসন বরাদ্দ, স্বায়ত্তশাসন

১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা সম্পর্কে সম্পাদিত চুক্তিই লক্ষ্ণৌচুক্তি। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেয়া হলেও মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল হতে পারেনি। ১৯১১ সালে একতরফাভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ ব্রিটিশ রাজের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের নি:শর্ত আনুগত্য বিনষ্ট করে। এরপর ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধে তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধচারণ ভারতীয় মুসলমানদের মর্মাহত করে। ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। নতুন নেতৃবৃন্দ সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনেন। তারা ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ রকম পরিস্থিতিতে, ১৯১৫ সালে বোম্বেতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রায় একই সময়ে নিজ নিজ দলের অধিবেশন আহবান করে। এ সময় উভয় দল ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন নীতি ও শাসন প্রক্রিয়ার সমালোচনা এবং সাম্রপ্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর গুরুত্বারোপ করে। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতের ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক বিষয়ে সমঝোতায় আসে। এই সমঝোতার উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

নিম্নে লক্ষ্ণৌ চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল-

১. প্রাদেশিক আইন পরিষদ সমূহ সম্প্রসারণ করার সুপারিশ করা হয়। বৃহৎ প্রদেশের সদস্য সংখ্যা ১২৫ জন এবং ছোট প্রদেশের সদস্য সংখ্যা ৫০ থেকে ৭৫ এর মধ্যে নির্ধারণ করার দাবি করা হয়। এদের মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ মনোনীত সদস্য এবং বাকী পাঁচ ভাগের চার ভাগ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার দাবি করা হয়।

২. কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন পরিষদে কোন সম্প্রদায়ের কোনো বিল পাশের ক্ষেত্রে আইনসভায় ঐ সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতির বিধান রাখা হয়।

৩. লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভোটারদের ভোট দিতে উৎসাহিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৪. এ চুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এতে সংখ্যানুপাতে অধিক প্রতিনিধিত্বের সুপারিশ করা হয়। অর্থাৎ যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের আসন সংখ্যা লোকসংখ্যা থেকে বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর যেখানে সংখ্যাগুরু সেখানে জনসংখ্যার তুলনায় তারা কম আসন লাভ করবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় বাংলা প্রদেশের কথা। বাংলার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫২.৬ শতাংশ আর মুসলিম আসন বরাদ্দ করা হয় ৪০ শতাংশ। এভাবে বিহার ও উড়িষ্যাতে ২৫ শতাংশ, সেন্ট্রাল প্রদেশে ১৫ শতাংশ, মাদ্রাজে ১৫ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৫০ শতাংশ এবং যুক্ত প্রদেশে ৩০ শতাংশ আসন বরাদ্দের কথা বলা হয়।

৫. এ চুক্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতির পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন প্রদানে সম্মতি দেয়া হয়।

৬. ভারতের জন্য স্ব-শাসন কায়েমের লক্ষ্যে কংগ্রেসও মুসলিম লীগ একত্রে আন্দোলন করবে।

৭. প্রদেশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে।

৮. গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের অর্ধেক সদস্য ভারতীয় হবেন। তারা ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

গুরুত্ব

ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করার সুযোগ পায়। প্রথমবারের মতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি রচনা করে এই চুক্তি। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত ও পরিকল্পিত করার জন্য এ চুক্তি করা হয়। লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার স্বীকৃতি দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও বাংলার রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর মূলে ছিল আসন সংখ্যা সমন্বয়ের নীতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় লক্ষ্ণৌ চুক্তির গুরুত্ব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

লক্ষ্ণৌ চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য জোরদার করা। ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে লক্ষ্ণৌ চুক্তি এক গরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ এ চুক্তি ভারতে এক অভূতপূর্ব সাংবিধানিক অগ্রগতির পটভূমি রচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোন স্থানে ১৯১৫ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সম্মেলন আহবান করে?

(ক) লক্ষ্ণৌতে (খ) বোম্বেতে
(গ) করাচিতে (ঘ) লাহোরে

২। লক্ষ্ণৌ চুক্তির প্রাক্কালে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কিসের উপর গুরুত্ব দেন?

(ক) হিন্দু ধর্ম (খ) মুসলিম স্বার্থ
(গ) ব্রিটিশ স্বার্থ (ঘ) হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি

পাঠ-১.১০ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন, ১৯১৯

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন প্রবর্তিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংস্কার, রাজন্য সভা, ব্যবস্থাপক সভা, সংরক্ষিত, হস্তান্তরিত, হাইকমিশনার।

১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা আকাংখা পূরণে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে ১৯০৫ থেকে ১৯১১ এই সময়ের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ ও পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সাফল্য ভারতবাসীর মধ্যে স্বশাসনের দাবি প্রবল করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবাসীর সহযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ এবং যুদ্ধ শেষে ভারতের জন্য নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার অবধারিত ছিল বিধায় ভারত সচিব মন্টেগু ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ভারতীয়দের ভারত শাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা ব্রিটিশ সরকারের নীতি। এর ভিত্তিতে ভারত সচিব মন্টেগু এবং ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল চেমসফোর্ড এ দু'য়ের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন পাশ করা হয়।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৯১৯ সালের মেন্টগু-চেমসফোর্ড আইনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল :

১. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনসভায় পরিবর্তন করা হয়। উচ্চকক্ষের নাম হয় রাজন্য সভা এবং নিম্নকক্ষের নাম হয় ব্যবস্থাপক সভা । উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ৬০ জন নির্ধারণ করা হয় এবং তন্মধ্যে ৩৪ জন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ২৬ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১৪৫ জন নির্ধারণ করা হয় তন্মধ্যে ১০৫ জন থাকবেন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৪০ জন সরকার মনোনীত হন।

২. এ আইনের মাধ্যমে সকল প্রদেশের জন্য একটি করে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান করা হয়। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া এ আইনে উল্লেখ করা হয় যে, প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ নির্বাচিত এবং বাকী সদস্যরা মনোনীত হবেন।

৩. প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের লক্ষ্যে এ আইনে সরকারের কার্যাবলিকে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা, ব্যাংক, বাণিজ্য, আয়কর, শুল্ক, ডাক, রেলওয়ে, তার, যোগাযোগ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয়। অপরদিকে আইন শৃঙ্খলা, শিক্ষা, ভূমি, রাজস্ব, কৃষি, সেচ, পূর্ত, গণস্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৪. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় প্রবর্তন। এ ব্যবস্থার প্রাদেশিক বিষয়সমূহকে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি, রাজস্ব, সেচ। বিচার, জেল প্রভৃতি 'সংরক্ষিত' বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। অপরদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় সরকার, পূর্ত প্রভৃতি। হস্তান্তরিত বিষয় ছিল, গভর্ণর এবং তার নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ 'সংরক্ষিত' বিষয়ের দায়িত্বে ছিলেন। আর 'হস্তান্তরিত' বিষয়সমূহ গভর্ণর ও তাঁর মন্ত্রীদের দায়িত্বে ছিল। মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।

৫. এ আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পাঞ্জাবের শিখ, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রিষ্টান এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

৬. নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রবর্তন এ আইনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ আইনের মাধ্যমে বেসরকারি সদস্যদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ভোটার হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে ছিল শিক্ষা, সম্পত্তির মালিকানা, পৌরকর প্রদান ইত্যাদি। স্বাভাবিক কারণে ভোটারের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত।
৭. এ আইনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য হাইকমিশনারের একটি পদ সৃষ্টি করা হয়।

মূল্যায়ন

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে দ্বৈতশাসনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ ব্যবস্থার ফলে প্রদেশগুলোতে শাসনক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সংসদীয় পদ্ধতির দায়িত্বশীল ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আরো কিছু বিষয় যেমন- মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি আবশ্যক। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় এ আইনে ছিল অনুপস্থিত। তথাপি, ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে **১৯১৯** সালের ভারত শাসন আইন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পদক্ষেপ।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রয়োজন ছিল কেন?

সারসংক্ষেপ

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ভারতীয়রা সীমিত আকারে হলেও দায়িত্বশীল সরকার পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ পায়। আইনের ফলে আইনসভায় দুটি কক্ষের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কক্ষেই নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও জোরদার হয়। বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাও বহাল ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **১৯১৯** সালে প্রবর্তিত নতুন শাসন ব্যবস্থা ছিল–

(ক) প্রধানমন্ত্রীর শাসন (খ) দ্বৈতশাসন
(গ) গভর্নরের শাসন (ঘ) রাষ্ট্রপতির শাসন

২। **১৯১৯** সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা আইনসভায় যে চিত্র ফুটে ওঠে তাহলো–

i. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা
ii. এক কক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা
iii. প্রাদেশিক আইনসমূহের ৭০ ভাগ সদস্য ছিল নির্বাচিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১১ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার ও পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তুর্কি সাম্রাজ্য, খলিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগ, খিলাফত সম্মেলন, পঞ্চায়েত।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়।

খিলাফত আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক ব্রিটেনের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে ব্রিটেন জয়লাভ করে। এর ফলে তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা হুমকির সম্মুখীন হয়। ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলমানদের খলিফা বা নেতা বলে মনে করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় মুসলমানরা একটি শর্তে ব্রিটিশদের যুদ্ধে সহায়তা করেছিল আর তা হল ব্রিটিশরা তুর্কি সাম্রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু জয়লাভের পর ব্রিটিশরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায়, ভারতীয় মুসলমানরা তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও তুর্কি সুলতানের মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালে যে আন্দোলন গড়ে তোলে, তাই ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

অসহযোগ আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বজুড়ে যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় তার সূত্র ধরে ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন এ প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে এ সময় ব্রিটিশ সরকার 'রাউলাট আইন' পাশ করে। এ আইনে শান্তি-শৃংখলা বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে কাউকে বিনা বিচারে দীর্ঘ সময়ের জন্য আটক করে রাখার বিধান করা হয়। এ আইনের ব্যাপারে জনমনে যখন অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছিল তখন আরেকটি ঘটনা ঘটে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে চতুর্দিকে প্রাচীর ঘেরা একটি মাঠে কয়েক হাজার মানুষ প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। ব্রিটিশ সরকার এই নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালায় এবং এতে প্রায় চারশ মানুষ নিহত ও অনেকে আহত হয়। এমতাবস্থায়, ১৯১৯ সালে ব্রিটিশদের দমন ও পীড়নমূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদে মহাত্মাগান্ধীর আহবানে সমগ্র ভারতব্যাপী যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল অহিংস। একই সময়, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন গড়ে ওঠে।

আন্দোলনের কর্মসূচি ও বিস্তার

খিলাফত আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানরা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ভারতের বিভিন্নস্থানে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। কলকাতায় ১৯১৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খিলাফতের সমর্থনে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লিতে ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মোহম্মদ আলী, শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত 'শান্তি উৎসব' এর বিরোধিতা করে দিল্লি সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে গান্ধী তাঁর 'বয়কট কর্মসূচী' প্রস্তাব করেন। এ কর্মসূচি ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খিলাফত কমিটির সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। বয়কট কর্মসূচি একই বছরের নভেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত যৌথ সম্মেলনে গৃহীত হয়। এ কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়-

১. বিদেশী পণ্য বর্জন।
২. ব্রিটিশ প্রদত্ত খেতাব ও পদবি বর্জন এবং অবৈতনিক পদসমূহ ত্যাগ।
৩. ব্রিটিশ মনোনীত ভারতীয় সদস্যদের আইনসভা থেকে পদত্যাগ, কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা।
৪. সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন এবং আইনজীবীদের আদালত বর্জন
৫. পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সুসংহত করা
৬. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা
৭. সকল প্রকার সরকারি কার্যক্রম বর্জন করা।

খিলাফত আন্দোলন কর্তৃক বয়কট কর্মসূচি গ্রহণ এবং মাহাত্মা গান্ধীর খিলাফত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এ আন্দোলনকে তীব্র করে তোলে। মাহাত্মা গান্ধীর বয়কট কর্মসূচি জনগণকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করে। জনগণ বিদেশী পণ্য বর্জনের পাশাপাশি ব্রিটিশ প্রদত্ত খেতাব ও পদবি বর্জন করতে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে এ আন্দোলনে সামিল হন এবং এক দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন দমন ও নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি

আন্দোলন যখন তুমুল পর্যায়ে, তখন বিভিন্ন সহিংস ঘটনা ঘটতে শুরু করে। কিন্তু অহিংস আন্দোলনের আদর্শ সহিংসতা বিরোধী। এক পর্যায়ে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক স্থানে উত্তেজিত জনতা স্থানীয় থানা আক্রমণ করে এবং এতে প্রায় ২২ জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে মাহাত্মা গান্ধী প্রায় একক সিদ্ধান্তে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। সাথে সাথে খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। এর মূল কারণ ছিল এ রকম একটি গণআন্দোলন পরিচালনা করার মত সাংগঠনিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা খিলাফলত নেতৃবৃন্দের ছিল না। ভারতে, ১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল পাশা তুরস্কের দায়িত্বভার গ্রহণ করে খিলাফতের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। ফলশ্রুতিতে খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ করে প্রত্যাহার করা হল কেন?

সারসংক্ষেপ

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এ আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ গণআন্দোলনের সাথে পরিচিত হয় এবং তা রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সহায়তা করে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন–

i. মাওলানা মোহাম্মদ আলী

ii. মওলানা আব্দুল কালাম আজাদ

iii. মওলানা হামিদ খান ভাসানী

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন–

i. হিংসাত্মক পথ বর্জনের মাধ্যমে

ii. হিংসাত্মক পথের মাধ্যমে

iii. সত্যাগ্রহ নীতিকে সামনে রেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১২ বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বেঙ্গল প্যাক্ট এর পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন ।
- বেঙ্গল প্যাক্টের পরিণতি তথা ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যানুপাত, ধর্মীয় অনুভূতি, ইতিবাচক, অস্বীকৃতি, অকার্যকর।

ব্রিটিশ বিরোধী অহিংস খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করলে, মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ সালে এ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। আন্দোলন তুঙ্গে থাকা অবস্থায় তা বন্ধ ঘোষণা করার পর পক্ষে-বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত হতে থাকে। অপরদিকে, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভার দ্বিতীয় নির্বাচন ১৯২৩ সালের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হবার কথা। এমতাবস্থায়, ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে এ সম্মেলনে মতভেদ দেখা দেয়। গান্ধীর নেতৃত্বাধীন একটি অংশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিপক্ষে ছিলেন না অপরদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (সি আর দাশ) এর নেতৃত্বাধীন আরেকটি অংশ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। সি আর দাশের প্রস্তাব কংগ্রেস সম্মেলনে গৃহীত হয়নি এমতাবস্থায়, তিনি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে ১৯২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গঠন করেন স্বরাজ পার্টি।

সি.আর দাশ ছিলেন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পক্ষের মানুষ। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তিনি ব্রিটিশদের সহযোগিতা করতে চাননি বরং নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজ প্রদেশ বাংলায় মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে ১৯২৩ সনে এক চুক্তি সাক্ষর করেন যা বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

বেঙ্গল প্যাক্টের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. বাংলায় প্রাদেশিক কাউন্সিল নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব করবে।

২. স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় পাবে শতকরা ৬০ ভাগ আসন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাবে শতকরা ৪০ ভাগ আসন।

৩. মুসলমান সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি।

৪. সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৪৫ ভাগ বরাদ্দ করা হয়। যতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের চাকরি লাভের একই অনুপাত অর্জিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ৮০ ভাগ চাকরি লাভের বিধান রাখা হয়।

৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এমন কোন কাজ করবে না যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে।

প্যাক্টের পরিণতি

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া

বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই ইতিবাচক। এ প্যাক্টের মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে দেখে সর্বাত্মকরণে চুক্তিকে স্বাগত জানায়। এ প্যাক্টের মাধ্যমে মুসলমানরা বাংলায় সংখ্যানুপাতে

প্রাদেশিক কাউন্সিল ও স্থানীয় পরিষদে আসন পায়। তাছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এ প্যাক্টে স্বীকৃত হয়। তাই এ প্যাক্টের প্রতি মুসলমানদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হতে থাকে।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া

বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি বাংলা ও বাংলার বাইরের হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় একটি অংশের ছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রাধীন পত্রিকাসমূহ বেঙ্গল প্যাক্টের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। সি আর দাশকে সুবিধাবাদী ও মুসলিম স্বার্থ রক্ষাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মহাত্মা গান্ধী বেঙ্গল প্যাক্টের কয়েকটি অংশের সমালোচনা করেন। **১৯২৩** সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে কংগ্রেস বেঙ্গল প্যাক্ট অনুমোদন করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ হিসেবে বলা হয়, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানে প্রাদেশিক পর্যায়ের প্রচেষ্টা সর্বভারতীয় পর্যায়ের প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করতে পারে।

বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি কংগ্রেসের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্যাক্টের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। **১৯২৫** সালে সি আর দাসের অকস্মাৎ মৃত্যু প্যাক্টের ভবিষ্যত অনিশ্চিত করে তোলে। তাঁর অনুপস্থিতিতে এ প্যাক্টের সমর্থনে কাজ করার মতো কোন জনপ্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন নেতা ছিলেন না। এভাবে সি আর দাশের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বেঙ্গল প্যাক্ট অকার্যকর হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বেঙ্গল প্যাক্ট দীর্ঘস্থায়ী হয় নি কেন?

সারসংক্ষেপ

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল। অনগ্রসর মুসলিম জনগণের উন্নয়নে বেঙ্গল প্যাক্ট নি:সন্দেহে কার্যকর ছিল। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় একটি অংশের বিরোধীতা ও সি আর দাশের হঠাৎ মৃত্যুতে বেঙ্গল প্যাক্ট মুখ থুবড়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
'ক' অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। নানা অজুহাতে এ অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মারামারি ও হানাহানি লেগে থাকে। এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি একটি চুক্তি সম্পাদন করে।

১। উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলে কোন চুক্তির আভাষ পাওয়া যায়?

(ক) লক্ষ্নৌ চুক্তি (খ) বেঙ্গল প্যাক্ট
(গ) পুনা চুক্তি (ঘ) সিমলা চুক্তি

২। এই চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক-

i. স্বায়ত্তশাসনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা
ii. ধর্মভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা
iii. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১৩ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিধিবদ্ধ কমিশন, সাংবিধানিক অগ্রগতি, সাইমন কমিশন, নেহেরু রিপোর্ট, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, যুগ্ম বিষয়, নতুন প্রদেশ।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাংখা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১০ বছর পর ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি বিধিবদ্ধ কমিশন গঠনের কথা ছিল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে। যা সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। এ কমিশনে ভারতীয় কোন সদস্য অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ তথা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তা প্রত্যাখ্যান করে।

অপরদিকে, ভারতীয়দের জন্য সাংবিধানিক রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালে কংগ্রেস নিজেই মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করে, তা 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এ রিপোর্টে মুসলমানদের দাবী-দাওয়া পূরণ না হওয়ায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ তা বর্জন করেন। নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯২৯ সালে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করেন। এমনই এক পরিস্থিতিতে, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গান্ধীর নেতৃত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩২) শুরু হয়। এমতাবস্থায়, ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক সংকট ও শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। এ বৈঠক ১৯৩০ সালে শুরু হয়ে তিন দফায় ১৯৩২ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে চূড়ান্ত সমঝোতার সম্ভাবনা না দেখে ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড একটি সমাধান প্রদান করেন। এতে তিনি আইনসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বণ্টনসহ ভারতের জন্য একটি ভবিষ্যত সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। এটি ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' নামে পরিচিত। এই ধারাবাহিকতাতে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নতুন ভারত শাসন আইন পাশ হয়।

বৈশিষ্ট্য :

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়।

২. এ আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করা হয়। এর উচ্চকক্ষটি রাজ্যসভা (Council of state) ও নিম্নকক্ষটি ব্যবস্থাপক পরিষদ (House of Assembly) বলে অভিহিত হবে। উচ্চকক্ষের সর্বমোট প্রতিনিধি হবেন ২৬০ জন এবং নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে ৩৭৫ জন।

৩. এ আইনের মাধ্যমে শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয় যথা: কেন্দ্রীয় বিষয়, প্রাদেশিক বিষয় ও যুগ্ম বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ যথা: দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা, আয়কর, যোগাযোগ, তথ্যদপ্তর প্রভৃতি ন্যস্ত করা হয়। অপরদিকে, প্রাদেশিক সরকারের হাতে প্রাদেশিক বিষয়াবলী যথা– আইনশৃংখলা, পুলিশ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রভৃতি বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ যথা– ফৌজদারি আইন, বিচার প্রণালী, উইল প্রভৃতি কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় সরকারের এখতিয়ারভূক্ত রাখা হয়।

৪. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে। প্রাদেশিক বিষয়সমূহের উপর প্রদেশের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করার বিধান করা হয়।

৫. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু করে। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর নির্বাহী পরিষদের নিকট প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্মীয় বিষয়, উপজাতি প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অপরদিকে অন্যান্য বিষয়াবলী গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৬. এ আইনে ভারতবর্ষের জন্য একটি ফেডারেল কোর্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে তা গঠিত হবে।

৭. এ আইন দ্বারা সিন্ধু ও উড়িষ্যা নামে দুটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়।

৮. মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও সংখ্যা অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত রাখা হয়।

৯. এই আইনে বার্মাকে (বর্তমান মায়ানমার) ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করা হয়।

১০. এ আইনের মাধ্যমে ভোটদানকে উৎসাহিত করা হয় এবং ভোটার হবার যোগ্যতা শিথিল করা হয়।

১১. এ আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ রাখা হয়।

১২. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যেকোন প্রকার সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জনের ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে রাখা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ এর তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ আইনের মাধ্যমে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। তাছাড়া এ আইনের মাধ্যমে ভারতীয়রা অধিক মাত্রায় প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হবার সুযোগ পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিশেষ দিক কোনটি?

(ক) যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (খ) যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা (গ) স্বায়ত্তশাসন (ঘ) ভারত বিভক্তি

২। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশরা প্রশমিত করতে চেয়েছিল–

i. ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের অসন্তোষ

ii. ব্রিটিশদের প্রতি হিন্দুদের ক্ষোভ

iii. হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দূরত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ভারত শাসন আইনে ভারতীয় উপদেষ্টামণ্ডলী রহিত করার সাথে কোনটি জড়িত?

(ক) ভারত সচিব (খ) রাজ প্রতিনিধি (গ) উপদেষ্টা সংখ্যা (ঘ) ভারতীয় প্রতিনিধি

পাঠ-১.১৪ বঙ্গীয় আইনসভা, ১৯৩৭

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রথম বঙ্গীয় আইনসভা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- এ আইনসভার গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইনসভা, মন্ত্রিসভা, কোয়ালিশন, কৃষক, প্রজা, কৃষিখাতক, ঋণ সালিশী বোর্ড, চাকরি নিয়োগ বিধি।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করে। এ ছাড়া এ আইনে ভোটাধিকার ও আইনসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ফলশ্রুতিতে প্রাদেশিক পর্যায়ের নির্বাচন এবং সরকার গঠনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ সময় বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম নেতৃত্বের উত্থান ঘটে। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকে (১৯৩৭-১৯৪৭) বাংলায় চারটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এগুলো ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-৪১), ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (১৯৪১-৪৩), নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-৪৫) ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা (১৯৪৬-৪৭)।

প্রথম বঙ্গীয় আইনসভা বা ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বাংলায় মুসলমানদের জন্য বরাদ্দকৃত ১১৭টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ৪০টি, ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৫টি এবং স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থীরা ৪২টি আসন লাভ করে। কোনো দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকায় কোয়ালিশন সরকার গঠন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাধারণ আসনের নির্বাচনে কংগ্রেস ৫৪টি আসন পায়। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও কংগ্রেস সরকার গঠনে অসম্মতি জানায়। এমতাবস্থায়, কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হকের ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বিবেচনায় নিয়ে ফজলুল হককে সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সাথে মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সে উদ্যোগ সফল হয়নি। এরপর তিনি মুসলিম লীগকে নিয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রজা-লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ৬ জন মুসলমান ও ৫ জন হিন্দু ছিলেন। এদের মধ্যে ৬ জন জমিদার, ১ জন পুঁজিপতি এবং ৪ জন আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

প্রথম বঙ্গীয় আইনসভা বাংলার কৃষক ও বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল–

১. বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৩৮

এ আইনের মাধ্যমে জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত ফি, জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে জমিদারদের প্রাধান্য, সার্টিফিকেট প্রথার মাধ্যমে খাজনা আদায় এবং সাধারণ চাষীদের কাছ থেকে বিভিন্ন অবৈধ আদায় প্রভৃতি বাতিল করা হয়। তাছাড়া এই আইনে বকেয়া খাজনার উপর ধার্যকৃত সুদের হার ১২.৫% থেকে কমিয়ে ৬.২৫% করা হয়।

২. কৃষি-খাতক আইন, ১৯৩৮

এই আইনের মাধ্যমে সমগ্র প্রদেশে অসংখ্য ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করা হয়।

৩. মহাজনি আইন, ১৯৪০

বঙ্গীয় মহাজনি আইনের মাধ্যমে সকল মহাজনের ট্রেড লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং সুদের হার স্থির করে দেয়া হয়।

৪. বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগ বিধি বা সম্প্রদায় ভিত্তিক বণ্টন বিধি, ১৯৩৯

এই আইনের মাধ্যমে বাংলায় শিক্ষিত মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়। এর মাধ্যমে শতকরা ৫০ ভাগ চাকরি মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং নিয়োগ নীতি তদারকির জন্য একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গীয় আইন সভার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রথম বঙ্গীয় আইন সভাকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতে হয়। সকল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারলেও এ আইনসভা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। বকেয়া খাজনার উপর ধার্যকৃত কর হ্রাস, ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন, চাকরির নিয়োগ বিধি উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্রিটিশ শাসন আমলে বাংলায় কয়টি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়?

(ক) ২টি (খ) ৩ টি

(গ) ৪ টি (ঘ) ৫ টি

২। বঙ্গীয় আইন সভার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল-

i. কৃষি-খাতক আইন, ১৯৩৮

ii. মহাজনী আইন, ১৯৪০

iii. বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগ বিধি, ১৯৩৯

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১৫ লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।
- লাহোর প্রস্তাবের মূল ধারাগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দ্বিজাতি তত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক, একদর্শী নীতি, পাকিস্তান প্রস্তাব, বার্ষিক অধিবেশন।

ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ প্রস্তাব মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। বস্তুত: লাহোর প্রস্তাব ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মুসলিম লীগ পরিচালিত আন্দোলনের পরিণতিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয়।

প্রেক্ষাপট

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৩৭ সালে প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস জয়লাভ করে। এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও কংগ্রেস জয়লাভ করে। মুসলিম লীগের পরাজয় মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শংকিত করে তোলে। এমন এক বাস্তবতাতে, ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশন আহবান করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজণিত বাস্তবতা, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ ছাড়াই ভারত সরকারের যুদ্ধে যোগদান এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতেও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ পর্যালোচনাই ছিল অধিবেশনের উদ্দেশ্য। এই অধিবেশনে মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব সম্পন্ন মুসলিম নেতাদের তীব্র সমালোচনার কারণে তিনি ধর্মভিত্তিক জাতির ধারণাকে সামনে তুলে ধরে, হিন্দু-মুসলিমদের দুটি জাতি হিসাবে দাবী করেন। জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী, এক পর্যায়ে লাহোরে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত অধিবেশনের মূল সুর হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য

লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ঠ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে পৃথক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করতে হবে।

২. ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

৩. এসব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজনবোধে ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর সীমানা পুন:নির্ধারণ করতে হবে।

৪. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।

৫. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. পরবর্তীতে দেশের যেকোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ফলাফল ও তাৎপর্য

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব। এ প্রস্তাবের কোথাও পাকিস্তান শব্দটি ছিল না। তথাপি এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ প্রস্তাব ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পৃথক আবাসভূমির স্বপ্ন বপন করে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগকে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ভারতের মুসলিমদের পক্ষে জনমত তৈরি হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল এর প্রমাণ।

১৯৪৬ সালে জিন্নাহর নেতৃত্বে দিল্লি মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশন এ মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র পরিচালনাকে বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। এটি ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। তথাপি, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান এবং বাকি অংশ নিয়ে গঠিত হয় ভারত।

শিক্ষার্থীর কাজ	লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি কী ছিল?

সারসংক্ষেপ

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম মূলভিত্তি হিসেবে পরিগণিত। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতের মুসলমানদের জন্য একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। পরবর্তীতে জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য একটি তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক কত সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন?
(ক) ১৯০৫ সালে (খ) ১৯৩৫ সালে
(গ) ১৯৪০ সালে (ঘ) ১৯৪৭ সালে

২। লাহোর প্রস্তাবে মুসলিমদের জন্য কয়টি রাষ্ট্রের দাবি করা হয়েছিল?
(ক) একটি (খ) দুটি
(গ) একাধিক (ঘ) কোনটি নয়

৩। দ্বিজাতি তত্ত্বের মূল কথা কি?
(ক) হিন্দু-মুসলিম একজাতি (খ) হিন্দু-মুসলিম দুই জাতি
(গ) সর্ব ভারতীয় এক জাতি (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-১.১৬ ক্রিপস মিশন ও মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্রিপস মিশন ও মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক সংকট, খসড়া প্রস্তাব, যুক্তরাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কালো দিবস

পটভূমি

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্রিপস মিশন এবং মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ক্রিপস মিশন যখন কাজ শুরু করে তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পর বিরোধী অবস্থানে ছিল। বিশ্ব রাজনীতি তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইস্যুতে দ্বিধা বিভক্ত। এমন এক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের প্রভাবশালী মন্ত্রি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এর নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদল ভারতের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য ১৯৪২ সালের ২৯ মার্চ একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করে। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এর নামানুসারে এ মিশনের নাম হয় ক্রিপস মিশন।

ক্রিপস মিশন এর প্রস্তাবনায় ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং একটি ডোমিনিয়নের মর্যাদার জন্য সুপারিশ করা হয়। তাছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ গঠন, অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন বিষয়েও সুপারিশ করা হয়।

কিন্তু ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান করে। ফলে এ মিশন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ব্রিটিশ সরকার আবারো ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাছাড়া, ব্রিটেনে শ্রমিক দলের নতুন সরকার ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় তিনজন প্রভাবশালী মন্ত্রি নিয়ে গঠিত একটি মিশন সিমলাতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসে। এরা হলেন ভারতসচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্স, বাণিজ্যবোর্ডের সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং রাজকীয় নৌ বাহিনীর প্রথম লর্ড এ.ভি. আলেকজান্ডার।

এ মিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ মে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করে। এ প্রস্তাবনা মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদী এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। নিম্নে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল–

১. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্ক এ তিনটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন রাখা হয়।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত বিষয় ছাড়া শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয়ের উপর প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে।

৩. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা ও শাসন বিভাগ গঠিত হবে।

৪. কেন্দ্রীয় আইনসভায় কোনো সম্প্রদায়ের মৌলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে ঐ সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে।

৫. ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হবে। যথা–
   'ক' গ্রুপ- এ গ্রুপে থাকবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছয়টি প্রদেশ যথা- মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ।
   'খ' গ্রুপ- এ গ্রুপে থাকবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ তিনটি প্রদেশ যথা- সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।
   'গ' গ্রুপ- এ গ্রুপে থাকবে পূর্ব ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দু'টি প্রদেশ যথা– বাংলা ও আসাম।
   প্রতিটি গ্রুপ স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়সমূহ ছাড়া পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করবে।

৬. প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রতিটি গ্রুপের আলাদা শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ থাকবে।

৭. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য প্রতিটি গ্রুপের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়।

৮. কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক গ্রুপের শাসনতন্ত্রে এমন শর্ত থাকতে হবে যেন দশ বছর পর যেকোন প্রদেশ সংবিধানের শর্তাবলী পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

৯. যেকোন প্রদেশে সংবিধান রচিত হবার পর সংশ্লিষ্ট গ্রুপ থেকে বের হয়ে আসতে পারবে।

১০. এ পরিকল্পনায় ভারতের জন্য নতুন সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

১১. প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর থেকে ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান হবে।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার পরিণতি

মুসলীম লীগ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেও কংগ্রেস মিশনের অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন ও বাধ্যতামূলক গ্রুপিং ব্যবস্থাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায়, ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের ২৬ জুন নিজেদের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণায় মুসলিম লীগ মর্মাহত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে। পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ডাক দেয়। ইতিমধ্যে কংগ্রেস অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব মেনে নিলেও, মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' কর্মসূচিতে অনড় থাকে। এমতাবস্থায় কলকাতায় ১৬ আগস্ট এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এর মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের ২৪ আগস্ট কংগ্রেসের নেতৃত্বে শাসন পরিষদ গঠন করে যার প্রতিবাদস্বরূপ মুসলিম লীগ ১ সেপ্টেম্বর 'কালো দিবস' পালন করে। এ সময় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়তে থাকে। এক সময় মুসলিম লীগ অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগদানে সম্মতি জানায়। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পর বিরোধী অবস্থান দিন দিন বাড়তেই থাকে। ফলে, অচিরেই মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হল কেন?

সারসংক্ষেপ

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে একটি শিথিল বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ মিশন ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্রিপস মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কেন?

(ক) কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করায় (খ) মুসলিম লীগ গ্রহণ করায়

(গ) ব্রিটিশরা প্রত্যাখ্যান করায় (ঘ) রাণীর অনুমোদন না পাওয়ায়

২। মন্ত্রিপরিষদ পরিকল্পনা পেশ করা হয় কত সালে?

(ক) ১৯৪৪ সালে (খ) ১৯৪৬ সালে

(গ) ১৯৪৭ সালে (ঘ) ১৯৪৮ সালে

৩। মন্ত্রিমিশনের সদস্য ছিলেন-

i. স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস

ii. লর্ড মাউন্টব্যাটেন

iii. লর্ড প্যাথিক লরেন্স

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১৭ ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ফলাফল ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা হস্তান্তর, স্বাধীনতা আইন, ডোমিনিয়ন গণপরিষদ, কমনওয়েলথ, স্বাধীন রাষ্ট্র।

পটভূমি

ব্রিটিশরা তাদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির মাধ্যমে ভারতবর্ষে তাদের শাসন প্রলম্বিত করলেও, শেষ পর্যন্ত তারা ঐক্যবদ্ধ ভারতের পক্ষে ছিল যার প্রমাণ ছিল মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পর বিরোধী অবস্থান এ পরিকল্পনাকে অকার্যকর করে দেয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়তে থাকে। উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানকল্পে ব্রিটিশ সরকার স্থায়ীভাবে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার ঘোষণা দেয়। ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন একটি পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। এ পরিকল্পনার আলোকে ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাস হয়। এই আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রায় ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. এ আইনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। উভয় রাষ্ট্র ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করে।

২. এ আইনে বৃহৎ দু'টি প্রদেশ বাংলা ও পাঞ্জাবকে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।

৩. এ আইন অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান নিজ নিজ গণপরিষদ গঠন করবে এবং তাদের কাছে সংবিধান রচনার ক্ষমতা দেয়া হয়। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সংবিধান রচনার পূর্ব পর্যন্ত এই দুই পরিষদ নিজ নিজ দেশের সার্বভৌম কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ রূপে কাজ করবে।

৪. এ আইনের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কিনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়।

৫. ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ভারত সচিব পদ বিলুপ্ত করে।

৬. এ আইনের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলোর হাতে নিজ অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়।

৭. এ আইনে ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীগণকে ভারত ও পাকিস্তানের অধীনে চাকুরি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়।

৮. ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদ কর্তৃক নিজ নিজ দেশের সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত সংশোধন ও পরিবর্তন সাপেক্ষে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পরিচালিত হবে।

(ক) মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নর তাদের সকল প্রকার কাজ পরিচালনা করবেন।

(খ) স্ব স্ব ডোমিনিয়নের মন্ত্রি পরিষদের পরামর্শক্রমে ব্রিটিশ রাজ গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করবেন।

(গ) মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করবেন।

ফলাফল ও তাৎপর্য :

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অবসান হয় ভারতীয় উপমহাদেশে সুদীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের। যদিও মহাত্মা গান্ধী অবিভক্ত ভারতের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর দলের কিছু সদস্যের অনমনীয় মনোভাবের কারণে তিনি পূর্বের অবস্থান হতে সরে আসেন। এ আইনে মূল লাহোর প্রস্তাবকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ভারত বিভক্তি এ অঞ্চলে স্থায়ী সমাধান দিতে পারেনি। পরবর্তীকালে পুনরায় পাকিস্তানের বিভক্তি ঘটে এবং অভ্যুদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের গুরুত্ব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দীর্ঘ ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। সৃষ্টি হয় দু'টি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র- ভারত ও পাকিস্তান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাস্তবতাতে ভারতবর্ষেও ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্রিটিশরা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। তাছাড়া ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অনেকটা ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এমতাবস্থাতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের উপায় হিসেবে লর্ড মাউন্টব্যাটন ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ঘোষণা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন পরিকল্পনায় ভারতীয় স্বাধীনতা আইন বাস্তবরূপ পায়?

(ক) মন্ত্রিপরিষদ পরিকল্পনা (খ) ৩ জুন পরিকল্পনা

(গ) ভারত পরিকল্পনা (ঘ) ক্রিপস পরিকল্পনা

২। ভারতের সর্বশেষ ইংরেজ গভর্নর জেনারেল কে?

(ক) লর্ড মিন্টো (খ) লর্ড কার্জন

(গ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন (ঘ) লর্ড লিটন

৩। ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ফলাফল-

i. ইংরেজ শাসনের অবসান

ii. মুসলিম শাসনের পুনর্জাগরণ

iii. ভারত বিভক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১৮ স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ব্যর্থতার কারণ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অখণ্ড বাংলা, হিন্দু মহাসভা, ভারতীয় ইউনিয়ন, ফর্মূলা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সর্বভারতীয়।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্তির প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলায় সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসু এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' গঠনের উদ্যোগ নেন। এ প্রচেষ্টা সফল হলে ১৯৪৭ সালেই বাংলা ভারতবর্ষে তৃতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হত।

পটভূমি

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার পর ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবল অস্থিরতা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। অপরদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশিক শাসনের অবসান অবধারিত হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে, ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণায় ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। এমতাবস্থায়, হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন, হিন্দু মহাসভা বাংলাকে বিভক্ত করে হিন্দু প্রধান অঞ্চল দিয়ে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠন এবং একে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্ত করার আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেসও এ আন্দোলনকে সমর্থন করে। এছাড়া এই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে জিন্নাহর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও তুঙ্গে। এমন এক পরিস্থিতিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় অবিভক্ত বাংলার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা কিরণ শংকর রায় এ উদ্যোগের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ২০ মে শরৎ বসুর কলকাতাস্থ বাড়িতে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার সমর্থক উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালি নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ–

১. বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে কি সম্পর্ক হবে বাংলা তা নিজে নির্ধারণ করবে।

২. স্বাধীন বাংলায় শাসনতন্ত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩. ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করবে যে, স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং বাংলা বিভক্ত হবে না।

৪. নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামরিক বাহিনী ও পুলিশসহ অন্যান্য চাকরিতে সমান অংশ থাকবে।

৫. বাংলার আইনসভা ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান পরিষদ নির্বাচিত করবে যেখানে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন।

ব্যর্থতার কারণ

স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের প্রতি বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডরিখ বারোস পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। একটা সময় পর্যন্ত এ উদ্যোগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহর সমর্থন ছিল। কংগ্রেসের হাই কমাণ্ডের মধ্যে গান্ধী প্রথম দিকে এ উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তবে জওহরলাল নেহেরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রথম থেকেই এ উদ্যোগের ব্যাপারে ভেটো প্রদান করতে থাকে। কার্যত স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের ভাগ্য বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হয়।

তাছাড়া ভারত বিভক্তির পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ এক দশক (১৯৩৭-৪৭) সময়কালে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুখ্য ভুমিকায় চলে আসে। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে, এ বিষয়টি বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দেয়। এ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলা বিভক্তির মানসিকতা দেখা দেয়। তাছাড়া, ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গার পর হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ অবস্থান প্রায় দুরূহ হয়ে পড়ে। শুধু কংগ্রেস নয় বাংলায় মুসলিম লীগের একটি অংশও অখণ্ড বাংলায় বিরোধিতা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ কেন ব্যর্থ হয়?

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষ বিভক্তির প্রাক্কালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। মূলত কংগ্রেসের হাই কমাণ্ড ও মুসলিম লীগের গোঁড়া নেতাদের বিরোধীতায় এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সাথে কোন ব্যক্তি জড়িত?

(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (খ) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) আবুল মনসুর আহমেদ

২। পল্লব স্যার শ্রেণিকক্ষে এমন একজন নেতার কথা বললেন, যিনি স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। তিনি কার কথা বলেছিলেন?

(ক) শরৎ বসু (খ) সুভাষ চন্দ্র বসু

(গ) কিরণ শঙ্কর রায় (ঘ) বল্লভ ভাই প্যাটেল

পাঠ-১.১৯ ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।
- ব্রিটিশ শাসনের ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আমূল পরিবর্তন, বিমাতাসূলভ, নিঃস্ব, পুঁজিপতি শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, রাজনীতি সচেতন, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা, সমাজ কাঠামো, নতুন অর্থনীতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত

ভারতবর্ষে প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসন ছিল খুবই ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ শাসনের অভিঘাতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিরায়ত প্রায় স্বনির্ভর ও স্বনিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙ্গে পড়েছিল। রাজনৈতিক অঙ্গনেও এসেছিল আমূল পরিবর্তন। নিম্নে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল আলোচনা করা হল–

সামাজিক ব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় সমাজ কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। উপনিবেশিক শাসনের পরিনতিতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের নাগরিকরা নিজ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা বেশি শোচনীয় হয়ে পড়ে বলে অনেকে মনে করেন। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে মুসলমানরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত, বিধবা বিবাহ চালু, বাল্য বিবাহ রোধ, আলীগড় আন্দোলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরিবর্তন আসে বর্ণ প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠা সামাজিক স্তর বিন্যাসে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ইংরেজি শিক্ষা, পুঁজিবাদের প্রসার ও নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর কারণে বাংলার সামাজিক অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। অনেকে দাবী করেন যে, ব্রিটিশরাই ঔপনিবেশিক শাসন প্রলম্বিত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ বপন করে। এ বিভেদ নীতির কারণে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায়। ব্রিটিশদের রোপিত সাম্প্রদায়িকতার বীজ পরবর্তীতে বিশাল মহীরূহে পরিণত হয় যার ফলস্বরূপ শুধু বাংলা প্রদেশের বিভক্তি হয়নি, বিভক্ত হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশও।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগণ নিজেদের শাসন ও শোষণের অনুকূলে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব করেন। এ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল সম্পদ লুণ্ঠন ও রাজস্ব সংগ্রহ। ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, ভূমির মালিকানা স্বত্ব প্রদান, কর আরোপ ও আদায়ের নতুন-নতুন রীতি-নীতি বাংলার অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা নতুন জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির জন্ম দেয়। ব্রিটিশ শাসকদের পাশাপাশি দু'শ্রেণির শোষণ ও নিপীড়ন বাংলার কৃষক ও কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। জোরপূর্বক চালুকৃত নীল চাষ একদিকে যেমন জমির উৎপাদন হ্রাস করে, তেমনি কৃষকদেরকে স্বোপার্জিত অর্থনীতি থেকে উৎখাত করে।

ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে বাংলার স্থানীয় শিল্প-কারখানা, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ব্রিটিশ শাসকরা বাংলাকে শিল্পের কাঁচামালের যোগানদাতা হিসেবে ব্যবহার করে। আবার বাংলার কাঁচামাল থেকে তৈরী জিনিসের বাজার হিসেবে ব্যবহার করে এই ভারতবর্ষকেই। ব্রিটিশ প্রবর্তিত অর্থনীতিতে বাংলায় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে, আর এই পুঁজিপতি শ্রেণিই বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবর্ষে সমাজ-সংস্কৃতি, জীবন-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে, যার ছোঁয়া লাগে রাজনৈতিক অঙ্গনেও। ঔপনিবেশিক শাসনের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অভূতপূর্ব প্রসার। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক পর্যায় এসে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক অধিকার, স্বাধিকার, জাতীয়তাবাদ এ সমস্ত তত্ত্বের সাথে পরিচিতি লাভ করে। এর ফলে প্রথমে দাবি ওঠে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদারিত্বের, পরবর্তীতে তা ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করে স্বশাসনের দাবিতে পরিণত হয়।

ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৫ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম লাভ করে প্রথম রাজনৈতিক দল 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। ১৯০৬ সালে জন্ম লাভ করে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ'। এ দু'টি রাজনৈতিক দল ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাস্তবিক রূপ দেয়।

ব্রিটিশ শাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ১৮৬১ সাল থেকে শুরু করে গৃহিত বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। যার মাধ্যমে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ধারার সংসদীয় শাসনব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। উপনিবেশিক শাসন বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছিল। আবার এই শাসনের মধ্যেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে উদ্ভব ঘটে মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ভাগ করে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর নামে দুটি পৃথক সিটি কর্পোরেশন করা হয়। বর্তমানে কর্পোরেশন দুটিতে দুজন নির্বাচিত মেয়রের নেতৃত্বে পৃথক পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে।

১। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন ঘটনার দূরবর্তী মিল আছে?

(ক) বঙ্গভঙ্গ (খ) ভারত বিভক্তি
(গ) স্বদেশি আন্দোলন (ঘ) খিলাফত আন্দোলন

২। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে মিলে যাওয়া ব্রিটিশ ভারতের ঐতিহাসি ঘটনার ফলে

i. জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়
ii. সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়
iii. শাসকদের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক

১। একটি দেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত 'ক' ইউনিয়নটি আয়তনে অনেক বড় এবং জনসংখ্যাও বিপুল। একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এত বড় ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। ইউনিয়নের এক বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথক ইউনিয়ন গঠনের দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দিয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ইউনিয়নটিকে বিভক্ত করে দুটি ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(ক) পলাশীর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়?

(খ) সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণটি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে ঐতিহাসিক কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্য বইয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটির ফলাফল মূল্যায়ন করুন।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দল ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটি ব্রিটিশ সরকারের কাছে এ অঞ্চলের মানুষের দাবি তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিল। এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের স্বতন্ত্র কোন রাজনৈতিক দল না থাকায় তাঁরা পশ্চাৎপদ অবস্থানে ছিল। ফলশ্রুতিতে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে উপমহাদেশের দ্বিতীয় রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়।

(ক) বঙ্গভঙ্গ কখন সংঘটিত হয়?

(খ) দ্বিজাতি তত্ত্ব কী?

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম রাজনৈতিক দলটির প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকের দ্বিতীয় রাজনৈতিক দলটি মুসলিম জাতীয়তাবাদকে বিকশিত করে− মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২ ঃ ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭ ঃ ১। খ ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯ ঃ ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১১ ঃ ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১২ ঃ ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৪ ঃ ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৫ ঃ ১। গ ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৬ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৭ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৮ ঃ ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১৯ ঃ ১। ক ২। খ

পাকিস্তান পর্ব (১৯৪৭-১৯৭১)

ইউনিট ২

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের দাবীর ভিত্তিতে। কিন্তু বাস্তবে শাসন, শোষণ, বঞ্চনা আর স্বৈরাচারের ফলে পূর্ব বাংলা পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী কখনো রাখঢাক বাদ দিয়ে, কখনো সুকৌশলে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য অব্যাহত রাখে। ফলে পাকিস্তানের দুই অংশের উন্নয়নে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পথ ধরে ১৯৭১ এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-১: পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ	পাঠ-৯: ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান
পাঠ-২: ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৮-১৯৫২	পাঠ-১০: ১৯৭০ সালের নির্বাচন
পাঠ-৩: ১৯৫৪ সালের নির্বাচন	পাঠ-১১: অসহযোগ আন্দোলন, মার্চ ১৯৭১
পাঠ-৪: ১৯৫৬ সালের সংবিধান	পাঠ-১২: বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
পাঠ-৫: ১৯৫৮ এর সামরিক শাসন	পাঠ-১৩: মুজিবনগর সরকার
পাঠ-৬: ১৯৬৬ সালের ৬ দফা	পাঠ-১৪: মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়
পাঠ-৭: ছাত্র সমাজের ১১ দফা	পাঠ-১৫: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি
পাঠ-৮: ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা	

পাঠ-২.১ পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণপরিষদ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সামরিক শাসন, ৬ দফা, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, চূড়ান্ত বিজয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যার একটির নাম পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান। এক হাজার মাইলের অধিক দূরত্ব ছিল

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল মোট জনসংখ্যার ৫৬.২৭%। দু-অংশের মধ্যে জলবায়ু, সমাজ কাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থা, জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাদ্যাভাস ইত্যাদি কোন কিছুতে মিল ছিল না।

ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলভিত্তি। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে উলেমা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যগণ দাবি করেন যে, পাকিস্তানকে এমন একটি 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হোক, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্র শাসিত হবে এবং রাষ্ট্র প্রধানকে আমীল বা খলিফার মত অসীম ক্ষমতা দেয়া হবে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের অধিকাংশ সদস্য 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' নামকরণ সমর্থন করলেও পাকিস্তানকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র করার পক্ষপাতি ছিলেন না। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানি রাষ্ট্রের সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করবে। পাশাপাশি বলা হয় যে, এ রাষ্ট্রে ইসলাম নির্দেশিত গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতা পুরোপুরি মেনে চলা হবে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। দেশের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ার সুবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের বৃহৎ অংশ এবং বড় বড় প্রকল্পগুলো মূলত: পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সামরিক হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে করা হয়। এসবের ফলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সর্বক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়। পাকিস্তান ছিল একটি যুক্তরাষ্ট্র। আর এ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠিত হবার কথা ছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবের মূল প্রস্তাব ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ভৌগলিক বিবেচনায় থেকেও পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির হওয়ার কথা থাকলেও শাসকবর্গের মধ্যে ছিল এককেন্দ্রিক প্রবণতা। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল না। বরং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বললেই এর প্রবক্তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বা ভারতের গুপ্তচর হিসাবে প্রচার করা হত।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পর সংবিধান প্রণয়ন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ণে দীর্ঘ নয় বছর লেগে গিয়েছিল। উপরন্তু পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী সুপরিকল্পিত উপায়ে বাঙ্গালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে। তারা বাঙালির ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই বাঙালি বনাম অবাঙালি দ্বণ্ড প্রকট হয়ে দেখা দেয়। একে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনীতি আবর্তিত হয়। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার মাধ্যমে এর নিস্পত্তি ঘটে। ব্রিটিশ আমলের শাসকদের কাছ থেকে পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে শক্তিশালী সামরিক-বেসামারিক আমলাতন্ত্র পায়। পক্ষান্তরে এই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এ অবস্থা পাকিস্তানে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা হয়ে উঠেনি। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল হন। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তার নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান থাকার কথা থাকলেও তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর পরিবর্তে জিন্নাহর প্রতি বেশী অনুগত ছিলেন। ফলে পাকিস্তানে প্রকৃত অর্থে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক-বেসামরিক আমলারা এটা মেনে নিতে পারেনি। বরঞ্চ কিভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে তার ষড়যন্ত্র শুরু করে। পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ২৩ বছরের মাথায় ১৯৭০ সালে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

বস্তুত পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোটি কোনভাবেই গণতান্ত্রিক ছিল না। এটি ছিল এমন একটি রাষ্ট্র যা সামরিক-বেসামরিক শাসক দ্বারা পরিচালিত হত। ক্রমাগত অন্যায়ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ফলে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতে জাতীয় সংহতি কখনোই গড়ে উঠেনি।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় যার একটির নাম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর অপশাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এক পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে। এই ধারাবাহিকতাতে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পাকিস্তানে কত সালে সংবিধান প্রণয়ন হয় ?

(ক) ১৯৫৪ (খ) ১৯৫৫

(গ) ১৯৫৬ (ঘ) ১৯৬০

২। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের নিচের কোন দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে?

(ক) শিল্প কারখান গড়া (খ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

(গ) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা (ঘ) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

একটি রাষ্ট্রের ‘ক’ অঞ্চল ‘খ’ অঞ্চলের উপরে নিপীড়ন চালায়। ‘খ’ অঞ্চলকে সকল ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করে। ইতিহাসের এক পর্যায়ে এসে ‘খ’ অঞ্চলের জনগণ এই অবস্থানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধিকারের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের ‘খ’ অঞ্চলের সাথে কোন দেশের মিল আছে?

ক. বাংলাদেশ খ) ব্রিটেন গ) রাশিয়া ঘ) পোল্যান্ড

পাঠ-২.২ ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৮-১৯৫২

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বাধীনতা, বাংলা ভাষা, স্বাধিকার, জাতীয়তাবাদ, চেতনা

বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলার জনগণের স্বাধিকার আদায়ের পদক্ষেপের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু হয়। প্রথমে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। তারা বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে নিতে চায়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার পল্টন ময়দানে ঘোষণা করেন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা"। এ ঘোষনার পর পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য তারা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদ অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমউদ্দিন জিন্নাহর কথার পুনরাবৃত্তি করেন। ফলে ছাত্র-সমাজ তীব্র প্রতিবাদ শুরু করে। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট আহবান ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। পুলিশ ছাত্রদের মিছিলের উপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, সফিউর, জব্বারসহ কয়েকজন শহীদ হন। হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পূর্ব বাংলা। শুরু হয় মাতৃভাষার অধিকার আদায় ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। অবশেষে বাঙালি জাতি বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও এর রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল স্থান দখল করে আছে। জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

১. **স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ :** ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা বাঙালি জনগণকে এ ধারণা প্রদান করে যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বসবাস করলেও তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র স্বার্থ এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

২. **বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ :** ভাষা আন্দোলন জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়। পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সাথে ধর্মের মিল ছাড়া বাঙালীদের যে আর কোন বন্ধন নেই, তা তারা প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করে। ১৯৫২ সালে আত্মাহুতির মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হয়, সেই চেতনার পথ ধরে ১৯৫৪ এর নির্বাচনে ২১ দফার জয় হয়, বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়।

৩. **জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি :** বাঙালি জাতির মধ্যে জাতীয় সংহতি ও একাত্মবোধ সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. **পরবর্তী আন্দোলনে প্রভাব : ১৯৫২** পরবর্তী পূর্ব বাংলার সকল রাজনৈতিক আন্দোলন ভাষা আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত। চুয়ান্ন সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানসহ বাঙালির প্রত্যেকটি আন্দোলনের ভিত্তিমূল হচ্ছে ভাষা আন্দোলন।

৫. **অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণা:** ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তাদের মধ্যে নায্য দাবী উত্থানে এবং অন্যায়ের প্রতিবাদের বোধ জাগিয়ে তোলে।

৬. **ছাত্র-সমাজের গুরুত্ব:** এ আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। পরবর্তীতে ছাত্ররাই রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। **১৯৯৯** সালের **১৭** নভেম্বর বাঙালি জাতির জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। এ দিন **১৮৮**টি দেশ ইউনেস্কোর **৩১**তম সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালিরা ক্রমাগত আন্দোলন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। **১৯৭১** সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন এই আন্দোলনের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি কে উথাপন করেন?

ক) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক (খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

(গ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মোহন তার বন্ধু মাশরাফিকে জন্মদিনে মোবাইলের মাধ্যমে ইংরেজীতে শুভ জন্মদিন পাঠায়। বার্তাটিতে লেখা থাকে “Happy Birthday” বার্তাটি পড়ে মাশরাফি আহত বোধ করে। তাঁর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে পড়ে।

২। মাশরাফির কোন ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে পড়ে ?

(ক) ভাষা আন্দোলন (খ) যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

(গ) ছয় দফা কর্মসূচি (ঘ) মহান মুক্তিযুদ্ধ

পাঠ-২.৩ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ২১ দফা, পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী, অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নির্বাচনের ফলে ভাষা আন্দোলনে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় হয় এবং রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। আর এ জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসল হচ্ছে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিমাতা সূলভ আচরণ শুরু করে। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনতা ও উন্নয়ন নানাভাবে ব্যাহত হয়। পূর্ব বাংলার জনগনের মধ্যে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে।

১৯৪৬ সালের পর ১৯৫১ সালে প্রদেশগুলোতে নির্বাচন হবার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে নির্বাচন দিলেও পূর্ব বাংলাতে নির্বাচন দেয়নি। এর কারণ মুসলিম লীগের সম্ভাব্য পরাজয়ের ভয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে কয়েকটি উপনির্বাচনে পরাজয়ে তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দল একজোট হয়ে ২১ দফা কর্মসুচিকে নিয়ে নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি

১. বাংলা হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা।
২. বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টন, ভূমি রাজস্বকে ন্যায় সঙ্গত স্তরে নামিয়ে আনা এবং সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল।
৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ ও পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান। মুসলিম লীগ আমলের পাট কেলেংকারির তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান।
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, কুটির শিল্পের বিকাশ ও শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
৫. পূর্ব বাংলাকে লবণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কুটির ও বৃহৎ পর্যায়ে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা।
৬. অবিলম্বে বাস্তুহারাদের পুনর্বহাল।
৭. সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা।
৮. পূর্ব বাংলার শিল্পায়তন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন অনুযায়ী শিল্প শ্রমিকদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।
৯. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের জন্য ন্যায্য বেতন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা।
১০. সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিভেদ বিলোপ করে শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্নগঠন।
১১. বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল কালাকানুন বাতিল করে পূর্ন স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচ ও কর্মচারীদের বেতনের সামাঞ্জস্য বিধান। মন্ত্রীদের সর্বোচ্চ বেতন এক হাজার টাকা।
১৩. ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ ও ১৯৪০ সাল থেকে অর্জিত অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।
১৪. সকল নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তিদান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা বিধান।
১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ।
১৬. বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা সাহিত্যের গবেষণাগারে রূপান্তর।
১৭. বাংলা ভাষার জন্য শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ।
১৮. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, পূর্ব বাংলাতে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন, অস্ত্র কারখানা নির্মাণ এবং আনসার বাহিনীকে মিলিশিয়া বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা।
১৯. আইন সভার আয়ু বর্ধিত না করা। সাধারণ নির্বাচনের ছয়মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।
২০. আইন সভার শূণ্য আসন তিন মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে। পরপর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদে মুসলিম আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২২৮টি মুসলিম আসন লাভ করে; এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৩টি আসন লাভ করে। অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, তফসিলি ফেডারেশন ২৭টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ১টি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ২টি, কমিউনিষ্ট পার্টি ৪টি, নির্দলীয় সদস্যগণ ১টি আসন লাভ করে। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ১৯৩৭ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা মুসলিম লীগ মাত্র ৭টি আসন পায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এই বিজয় ছিল মূলত বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিজয়। জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার ফসলই হচ্ছে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অসাম্প্রাদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রতীক ছিল নৌকা । নদীমাতৃক পূর্ব বাংলায় সাধারণ মানুষ নৌকা প্রতীককে তাদের পরিচিত প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে মুসলিম লীগের রাজনীতির বিদায় বার্তা ঘোষিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা য়ায় যে, বাঙালি জনগণের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৪ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য নিজের ভাষায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনে গণরায়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় মানুষের ভাষা ও ভূ-খন্ডগত স্বতন্ত্র চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়। পূর্ব বাংলা সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার আদায়ে লড়াই চালাতে প্রস্তুত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি কি ছিল?

(ক) ছয় দফা (খ) ১১ দফা

(গ) ১০ দফা (ঘ) ২১ দফা।

২। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক কি ছিল?

(ক) গোলাপ ফুল (খ) হারিকেন

(গ) নৌকা (ঘ) ঘড়ি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

হাসিব ও রাকিব একটি বই নিয়ে আলোচনা করছিল। সেখানে তারা নৌকা প্রতীক নিয়ে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি দলের নির্বাচনে জয়লাভের কথা বলছিল। সেখানে অন্য একটি দলের নির্বাচনে ভরাডুবি ঘটে।

৩। কোন দলটির ভরাডুবির কথা বলা হয়েছে?

i) আওয়ামী লীগ

ii) যুক্তফ্রন্ট

iii) মুসলিম লীগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-২.৪ ১৯৫৬ সালের সংবিধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের ব্যর্থতার কারণ জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণপরিষদ, সংবিধান, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিক কাঠামো, দলীয় স্বার্থ, জনগণের অংশগ্রহণ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি দ্বিতীয় গণপরিষদে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান বিল উত্থাপন করা হয়। বিলটি ২১ জানুয়ারি গণপরিষদে গৃহীত হয়। ২ মার্চ গর্ভনর জেনারেল এ বিলে সম্মতি প্রদান করেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রণীত এ সংবিধান ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। স্মরণীয় বিষয় এই যে, ১৯৪৭ সালে সৃষ্ট পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য দীর্ঘ নয় বছর সময় নেয়া হয়। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১. ইসলামী প্রজাতন্ত্র: পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র। এখানে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণীত হবে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান।
২. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার: এ সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বন্টন নীতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান ছিল।
৩. এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা: এ সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন হলেও কেন্দ্র ও প্রদেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে।
৪. লিখিত সংবিধান: ১০৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী লিখিত এ সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা, ১৩টি অংশ, ৬টি তালিকা, ২৩৪টি ধারা সন্নিবেশিত ছিল।
৫. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান: এ সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। জাতীয় পরিষদের সাধারণ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সংশোধনী বিল উত্থাপন করে তা পাস করতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে।
৬. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত: কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন করা হয়। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান এবং সংসদীয় যেকোন আইনকে সংবিধান সম্মত নয় বলে ঘোষণা করার ক্ষমতা এ আদালতকে প্রদান করা হয়।
৭. সংসদীয় সরকার: এ সংবিধান কেন্দ্র ও প্রদেশে সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করে। সংবিধান মোতাবেক আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করবে এবং তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে।
৮. মৌলিক অধিকার: সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলো সন্নিবেশিত করা হয়। মৌলিক অধিকারগুলোকে আদালতের আওতাভূক্ত করা হয়, তবে জরুরি অবস্থা চলাকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মৌলিক অধিকার রহিত করার বিধান রাখা হয়।
৯. সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ: এ সংবিধানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
১০. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র: ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতির ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে সরকার গঠনের বিধান রাখা হয়।

১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের ব্যর্থতার কারণ

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল তা মাত্র আট মাস স্থায়ী হয়। ১৯৫৮ সালে অক্টোবর মাসে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অব:) ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারি করেন এবং সংবিধান বাতিল করেন। নিচে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের ব্যর্থতার কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হল:

১. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা লিপ্সা: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা লিপ্সার কারণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রহসনে পরিণত হয়। ফলে এ সংবিধানে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হতে পারেনি।
২. সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনীহা: ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ক্ষমতার মোহ, দলটির ভাবমূর্তি বিনষ্ট হওয়া, নির্বাচন হলে ক্ষমতা হারাবার ভয়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।
৩. সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি: সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সফল করে তোলার জন্য সুসংগঠিত রাজনেতিক দল বিকশিত না হওয়ায় এ সংবিধান কার্যকর হতে পারেনি। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পরিণত হয়েছিল মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সংগঠনে।
৪. উপনির্বাচন স্থগিত ঘোষণা: ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আইন পরিষদের শূণ্য আসনগুলোতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানে গড়িমসি করতে থাকে।
৫. সহনশীলতার অভাব: সহনশীলতার অভাবে সংবিধান কার্যকর হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর উপর আক্রমণ ছিল সহনশীলতার অভাবের বাস্তব চিত্র।

এছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাব, সংবিধানের অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতি, রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মন্ত্রিসভার কার্যক্রমে অহেতুক হস্তক্ষেপ, সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রভৃতি ছিল ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ব্যর্থতার কারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৬ সালের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রায় দশ বছরের ব্যবধানে ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি দ্বিতীয় গণপরিষদে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান বিল উত্থাপন করা হয়। বিলটি গণপরিষদে ২১ জানুয়ারি গৃহীত হয় এবং ২ মার্চ গর্ভনর জেনারেল এ বিলে সম্মতি প্রদান করে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এ সংবিধান ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে এ সংবিধান কার্যকর করা হয়?
(ক) ঢাকা প্রস্তাব (খ) লাহোর প্রস্তাব
(গ) ভারত প্রস্তাব (ঘ) পাকিস্তান প্রস্তাব

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

সজিব ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য পড়ছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য পড়তে গিয়ে সে দেখতে পায়, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্বে যখন আমরা পূর্ব পাকিস্তান ছিলাম, তখন পাকিস্তানে একটি সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল।

২। এখানে কোন সংবিধানের কথা বলা হয়েছে?
i) ১৯৫৬ সালের সংবিধান
ii) ১৯৫৮ সালের সংবিধান
iii) ১৯৬২ সালের সংবিধান

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) সবকটি

পাঠ-২.৫ ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির কারণ জানতে পারবেন।
- ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান, সামরিক শাসন, সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সহযোগিতায় সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে কার্যকর হওয়া সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ৮ অক্টোবর ১৯৫৬ সালে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। একই তারিখে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অক্টোবর মাসেরই ২৭ তারিখে ইস্কান্দার মীর্জাকে হঠিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেন আইয়ুব খান।

সামরিক শাসন জারির বাস্তবতা

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের কুফল ছিল সুদূর প্রসারী। সামরিক সরকার জনগণের মতামতের গুরুত্ব না দিয়ে অস্ত্রের মুখে দেশ পরিচালনা করতে চেষ্টা করেন। সামরিক সরকার জনগণের অনুভূতিকে বুঝতে না পেরে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে থাকে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির কারণগুলো নিম্নরূপ :

১। **সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অভাব :** ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানে সংগঠিত কোন রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। মুসলিম লীগ কিছু নেতার পকেট সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী লীগেরও তখন জাতীয় ভিত্তিক কোন ইমেজ তৈরি হয়নি। তাই অসংগঠিত রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার কারণে বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও সেনা বাহিনী রাজনীতিতে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে সক্ষম হয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলেও, এর বিরুদ্ধে শুরুতে তেমন কোন সাংগঠনিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি।

২। **মুসলিম লীগের দুর্বল অবস্থা:** পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের প্রতীক হিসেবে বিরাজ করার পরিবর্তে জাতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগের অবস্থা হয়ে ওঠে অত্যন্ত শোচনীয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের নিকট মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। এর জন্য জাতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অভাব দেখা যায়। ফলে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখলে আগ্রহী করে তোলে।

৩। **সময়মত নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া:** পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর কখনই সময়মতো নির্বাচন হয়নি। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে মুসলিম লীগ শূণ্য হওয়া আসনে উপনির্বাচন দিতে ভীত হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনী এ সুযোগ গ্রহণ করে।

৪। **সেনাবাহিনীর ক্ষমতা লাভের বাসনা:** পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিশেষ করে সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করছিলেন। সামরিক শাসন জারির বৈধতা দাবী করে ইস্কান্দার মীর্জা বলেন "আমি একজন নীরব দর্শক হিসেবে দেশ ধ্বংসের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে পারি না"। মূলত ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে কতিপয় ক্ষমতালোভী সামরিক কর্মকর্তার পরিকল্পিত ইচ্ছার বাস্তবায়ন।

৫। **গর্ভনর জেনারেলের অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ:** ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল অযাচিতভাবে মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এবং ইস্কান্দার মির্জার ষড়যন্ত্র, মন্ত্রিসভা ও আইন সভার কাজে অন্যায় হস্তক্ষেপ পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

৬। **১৯৫৯ সালের নির্বাচনের ব্যাপারে ভীতি:** পাকিস্তানে প্রস্তাবিত ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হয়। এ সম্ভাবনা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে শঙ্কিত করে তোলে। সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে পশ্চিমা গোষ্ঠী নির্বাচনকে বানচাল করার ব্যবস্থা করে।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের প্রভাব বা ফলাফল

১। **একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা:** সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখেন। তিনি এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেন যাতে করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২। **সামরিক আইন জারির ধারা সূচনা:** ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির ফলে পাকিস্তানে সামরিক একনায়কতন্ত্র এবং সামরিক আইন জারির ধারা সূচিত হয়। যার ফলে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি অব্যাহত থাকে। তাছাড়া উপমহাদেশের রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়ে।

৩। **সংবিধান বাতিল:** ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন।

৪। **সরকার বিরোধী আন্দোলন:** সামরিক সরকার একটি বেসামরিক প্রক্রিয়ায় দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে। কিন্তু আইয়ুব সরকার বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমে ব্যর্থ হয়। 'ছয় দফা' কে কেন্দ্র করে বাঙালিরা একত্রিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে 'আগরতলা মামলা' দায়ের করা হয়। এর প্রতিবাদে বিশাল এক গণঅভ্যুত্থান হয়।

৫। **রাজনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনা:** আইয়ুব সরকার মৌলিক গণতন্ত্র নামে গণতন্ত্র নস্যাৎকারী এক অভিনব রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেন। ১৯৬২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার চালু করেন।

৬। **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রুদ্ধ:** ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হানে। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আর্বতে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির কারণ কি?

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার প্রায় এক দশক পর হলেও ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। কিন্তু শাসন ব্যবস্থায় নানাবিধ দুর্বলতার কারণে ১৯৫৬ সালের সংবিধান কার্যকর হয়নি। ১৯৫৮ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেন আইয়ুব খান। আইয়ুব খান এক দশকের অধিক সময় ধরে অগণতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তান শাসন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা কে ছিলেন ?

(ক) ইস্কান্দার মির্জা (খ) আইয়ুব খান

(গ) ইয়াহিয়া খান (ঘ) জুলফিকার আলী ভূট্টো

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দিন। বেশ কয়েক বছর আগে 'ক' দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। টানা হরতাল-অবরোধে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। ব্যবসায়ীরাও এ কারণে ব্যাপক লোকসানের শিকার হন। রাজনৈতিক দলগুলোর মতবিরোধই ছিল ঐ পরিস্থিতির কারণ।

২। উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটের কারণ ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির কোন কারণের সাথে তুলনীয় ?

(ক) জাতীয় নেতৃত্বের শূণ্যতা (খ) রাজনৈতিক দলগুলোর মতানৈক্য

(গ) সামরিক কর্মকর্তাদের দুর্নীতি (ঘ) নেতৃবৃন্দের সহনশীলতার অভাব

৩। উদ্দীপকের পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট অরাজকতা দমনে প্রয়োজন-

i) মানুষের মধ্যকার সহনশীলতা বৃদ্ধি করা

ii) সকল প্রকার মতবিরোধ দূর করা

ii) জনসমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৬ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছয় দফা কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্রের স্বরূপ, স্বায়ত্বশাসন, জাতীয়তাবাদ, মহান মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৬৬ সালের ছয় দফা বাঙালি জাতির জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। ধর্মগত ঐক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র তৈরি হলেও, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামরিক-বেসামরিক চাকরি, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রতি ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দেখানো হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের এ পরিকল্পিত শোষণের হাতে থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **১৯৬৬** সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক মুক্তির বাণী তথা 'ছয় দফা' কর্মসূচি পেশ করেন।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা ছিল ঐতিহাসিক দাবি। বাঙালির বাঁচা-মরার দাবি। এ ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালিদের অধিকারের সনদ যার মধ্যে বাঙালিদের জীবনের দাবি নিহিত ছিল। নিম্নে ছয় দফা কর্মসূচি উল্লেখ করা হল।

১। **শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি:** ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা হবে। পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন হবে। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির, সর্বদলীয় ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠিত হবে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভার জনসংখ্যানুপাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

২। **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত:** বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা বিষয় ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

৩। **অর্থ ও মুদ্রা:** দেশের দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করার ব্যবস্থা থাকবে। এ রকম ব্যবস্থা চালু সম্ভব না হলে দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে, তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে পাচার না হতে পারে।

৪। **শুল্ক সম্বন্ধীয়:** সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায়কৃত অর্থের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকার পাবে।

৫। **বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা:** বৈদেশিক মুদ্রার ওপর প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য সম্পর্কে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর সরকার আলাদা আলোচনা বা সম্পর্ক করতে পারবে।

৬। **আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা:** আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলো আধা-সামরিক বাহিনী বা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে পারবে।

'ছয় দফার' গুরুত্ব

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত্ব শাসন দাবির পটভূমিতে **১৯৬৬** সালের ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। ছয় দফা আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে বাঙালিদের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনে।

১। **বাঙ্গালির মুক্তির সনদ:** ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি বা মুক্তির সনদ। বাঙালি জাতির ক্রান্তিকালে আপোসহীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা কর্মসূচিতে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির পথ উন্মোচন করেন।

২। **জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ:** ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপিত হবার পর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই একে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

৩। **অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি:** ছয় দফা'র অন্যতম তাৎপর্য হল অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। এর মাধ্যমে বাঙালিরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তির সন্ধান লাভ করে।

৪। **আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন:** ছয় দফা কর্মসূচিতে বাঙালির আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছিল। দীর্ঘদিন শাসক চক্রের শোষণের যাঁতাকলে পৃষ্ট পূর্ব বাংলার জনগণ ছয়-দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, জেগে উঠেছিল কঠিন প্রতিজ্ঞায়।

৫। **১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান:** ছয়দফা আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আইয়ুব খান 'আগরতলা মামলা' দায়ের করেন। এর প্রতিবাদে বাঙালিরা গণআন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনই পরবর্তীতে ১৯৬৯ এর অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়।

৬। **মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকাঙ্খার প্রতীক:** ছয় দফা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খার প্রতীক। তাই এ আন্দোলনের পশ্চাতে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী, বিকাশমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, সরকারি কর্মকর্তা এবং ছাত্র-জনতার সমর্থন ছিল স্বত:স্ফূর্ত। সময়ের পরিক্রমাতে ছয় দফা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি হিসাবে আবির্ভূত হয়।।

৭। **সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হবার অনুপ্রেরণা:** ছয় দফা দাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হয় শাসক গোষ্ঠী। এর প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিরা পরবর্তীকালে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ছয় দফা কী ? ছয় দফার গুরুত্ব বর্ণনা করুন?

সারসংক্ষেপ

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছয় দফার প্রভাব ও গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। ছয় দফা বাঙালি জাতির বাঁচা-মরার দাবি। ছয় দফার পথ ধরেই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং সর্বশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ছয় দফা কর্মসূচি ১৯৬৬ কত তারিখে উথাপিত হয় ?

(ক) ৫ ফ্রেবুয়ারি (খ) ৬ ফ্রেবুয়ারি
(গ) ৭ ফ্রেবুয়ারি (ঘ) ৮ ফ্রেবুয়ারি

২। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে বিরোধী দলসমূহের সম্মেলনে বঙ্গুবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। একে তিনি পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবি বলে ঘোষণা করেন।

কর্মসূচিটি হল-

(ক) ৬ দফা কর্মসূচি
(খ) ১১ দফা কর্মসূচি
(গ) ৮ দফা কর্মসূচি

৩। বাঙালির 'মুক্তির সনদ' কোনটি?

(ক) দ্বিজাতি তত্ত্ব (খ) ১৯৫৬ সালের সংবিধান
(গ) মৌলিক গণতন্ত্র (ঘ) ছয় দফা কর্মসূচি

পাঠ-২.৭ ছাত্র সমাজের ১১ দফা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছাত্র সমাজের এগার দফা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এগার দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, গণজাগরণ, ছাত্র সমাজ

ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯৬৯ সালের ছাত্র-সমাজের ১১ দফা কর্মসূচি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালের ছয় দফার জনপ্রিয়তা দেখে আইয়ুব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এ মামলার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমাজ আইয়ুব বিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৮ সালের ৫ জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ (দোলন গ্রুপ) এবং ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ডাকসুর তৎকালীন ভিপি ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদে আরো নেতৃত্ব প্রদান করেন মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ। ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচি নিম্নরূপ:-

১. বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন বাতিল, শিক্ষা ব্যয় হ্রাস, অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু, নারী শিক্ষা প্রসার।
২. সর্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
৩. ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান।
৪. বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে নিয়ে সাব-ফেডারেশন গঠন।
৫. ব্যাংক, বীমা, পাট, ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ।
৬. কৃষকের খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করা, বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল। পাটের দাম মন প্রতি সর্বনিম্ন ৪০ টাকা ও আখের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ।
৭. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস প্রদান এবং শিল্প, বাসস্থান চিকিৎসা ইত্যাদির সুব্যবস্থা করা।
৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।
৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার।
১০. সিয়াটো-সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলপূর্বক জোট বর্হিভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম।
১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক, রাজনৈতিককর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া এবং আগরতলা মামলাসহ রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার।

১১ দফা দাবির গুরুত্ব

ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচিতে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১১ দফা দাবি এবং ১১ দফা ভিত্তিক আন্দোলন শুধু ছাত্র সমাজের ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল না। ১১ দফা এক পর্যায়ে আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ১১ দফার মূল লক্ষ্য ছিল কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি জনগণের সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা। ১১ দফা দাবি উদ্ভূত গণঅভ্যুত্থানের পরিণতিতে সরকার বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীদের মুক্তি দেয়। তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার করে। সর্বোপরি, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আইয়ুব খানের পতন ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১১ দফা দাবি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ **১৯৬৯** সালের ৪ জানুয়ারি এগার দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচির বদৌলতে শাসক চক্রের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ গণবিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। বিক্ষোভ দমনে সরকার যতই নির্যাতন বৃদ্ধি করতে থাকে ততই আন্দোলনরত জনগণ মরিয়া হয়ে উঠতে থাকে। **১১** দফা কর্মসূচির কারণেই **১৯৬৯** সালের গণআন্দোলন সংঘটিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এগারো দফা দাবি মূলত কাদের ছিল?

(ক) ছাত্র সমাজের (খ) বুদ্ধিজীবি সমাজের

(গ) কৃষক সমাজের (ঘ) শ্রমিক সমাজের

২। ছাত্র সমাজের **১১** দফা দাবি ছিল-

(ক) আইয়ুব খান বিরোধী (খ) জুলফিকার আলী ভূট্টো বিরোধী

(গ) খাজা নাজিম উদ্দিন বিরোধী (ঘ) ইয়াহিয়া খান বিরোধী

৩। **১৯৬৯** সালে কেন্দ্রিয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি কে ছিলেন?

(ক) মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (খ) তোফায়েল আহমেদ

(গ) শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক

পাঠ-২.৮ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা, ১৯৬৮

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এই পাঠ শেষে আপনি আগরতলা মামলার কারণ জানতে পারবেন।
- আগরতলা মামলার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	ঐতিহাসিক মামলা, বৈঠক, আন্দোলন, অভ্যুত্থান, ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, কালো অধ্যায়।

আগরতলা মামলা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছয় দফা ভিত্তিক বাঙালির জাতীয় চেতনাকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য জেনারেল আইয়ুব খান ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেন। প্রকৃতপক্ষে ছয় দফাকে নস্যাৎ করাই এই ষড়যন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলাকে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। মামলায় বলা হয় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগিরা ভারতের আগরতলায় গোপন বৈঠকে এক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। শাসক গোষ্ঠী শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা' মামলা দায়ের করে। এই মামলায় বলা হয় ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনাকারী শেখ মুজিবুর রহমান। অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ভারতীয় যোগসাজসে এবং ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছিল।

এই মামলায় ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল সাবেক বিচারপতি এস. এ. রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে। কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কড়া প্রহরায় ''রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যদের মামলা'' এর বিচার শুরু হয়। সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা গেল সম্পূর্ণ মামলাটিই ছিল হীন ষড়যন্ত্র। বঙ্গবন্ধুকে এহেন মিথ্যা মামলায় জড়ানোর প্রেক্ষিতে পূর্ব-বাংলার জনগণের মনে দারুন ক্ষোভ ও অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে। ছাত্র-জনতা তাঁর মুক্তির জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। উপায়ান্তর না দেখে গণ আন্দোলনের মুখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ সকল ব্যক্তিদের নি:শর্ত মুক্তি প্রদানের ঘোষণা দেন।

আগরতলা মামলার কারণ

বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করাই ছিল আগরতলা মামলার প্রত্যক্ষ ও সুদূর প্রসারী লক্ষ্য।

ক্ষমতা দখলের প্রথম কয়েক বছর প্রচন্ড প্রতাপে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকেন আইয়ুব খান। তবে আস্তে-আস্তে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ক্রমশ আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করে। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী প্রথম বড় ধরণের আন্দোলন। এরপরে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তানি আইয়ুব বিরোধীরা জোটবদ্ধ হয় এবং ছাত্ররা আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। তাসখন্দ চুক্তির কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীও আইয়ুবের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। ১৯৬৬ সালের ছয় দফার আন্দোলনে আইয়ুবের ক্ষমতার ভিত অনেকটা নড়বড়ে হয়ে যায়। এভাবে পাকিস্তানে উভয় অঞ্চলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। আইয়ুব খান তার কর্তৃত্বকে অক্ষুণ রাখার জন্য এ সকল আন্দোলন দমন করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। আর এটা ছিল আগরতলা মামলা সাজানোর অন্যতম কারণ।

মামলার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে অভিযুক্তদের প্রকাশ্য বিচারের দাবি করা হয়। ১৯ জানুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালিত হয়। জেনারেল আইয়ুব খান আশা করেছিলেন আগরতলা মামলার দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জনগণের বিশ্বাস ভঙ্গ হবে। কিন্তু তার এই আশা করাটা আত্মঘাতী হয়েছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালে ১১ দফা দাবি পেশ করে। তাদের ১১ দফা দাবির মধ্যে একটা ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার। আগরতলা মামলার আসামি জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে গুলি করে হত্যা করা হয়, ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসাদুজ্জামান নিহত হলে আন্দোলন আরো জোরদার হয়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নেয় ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলকে মুক্তি প্রদান করে।

আগরতলা মামলার ফলাফল

আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকারের দমন নীতির কারণে উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের অনুপস্থিতিতে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসু মিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে সরকারের নিকট ১১ দফা দাবি পেশ করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবির প্রতি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ সমর্থন দেয়। ফলে ১৯৬৯ সালের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এই আন্দোলন অচিরেই গণআন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল। ১১ দফা দাবির অন্যতম দাবি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলের নি:শর্ত মুক্তি। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে জনতার উপস্থিতিতে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আগরতলা মামলায় জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতার ভীত দুর্বল হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন না দেয়ার জন্য জেনারেল আইয়ুব ও তাঁর সমর্থক গোষ্ঠী নানা রকম কূটকৌশল নিয়েও সফল হতে পারেনি, বাঙালিদের আন্দোলনের প্রাবাল্যে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাকিস্তানী শাসকেরা কেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছিল?

সারসংক্ষেপ

আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে জনগণের মনে অবিশ্বাস গড়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে নিশ্চিহ্ন করা। কিন্তু ফলাফল হয়েছিল বিপরীত। জনগণ বুঝতে পেরেছিল মামলাটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত, মিথ্যা ও বানোয়াট। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। এই মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। এই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আগরতলা মামলার আসামি ছিল কয়জন ?

(ক) ৩০ জন (খ) ৩২ জন

(গ) ৩৬ জন (ঘ) ৩৫ জন

২। আগরতলা মামলার কোন আসামিকে সেনানিবাসে হত্যা করা হয়েছিল?

(ক) শেখ মুজিবুর রহমান (খ) তোফায়েল আহমেদ

(গ) সার্জেন্ট জহুরুল হক (ঘ) আব্দুর রাজ্জাক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনগণের ন্যায্য অধিকারের জন্য 'ক' রাষ্ট্রের জনপ্রিয় একজন নেতাকে বারবার কারাভোগ করতে হয়। এক পর্যায়ে নেতাকে ষড়যন্ত্রমূলক রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার করা হলে জনগণ আন্দোলন করে তাঁকে মুক্ত করে।

৩। উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নেতা হচ্ছেন-

(ক) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (খ) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৪। উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আন্দোলনের সরাসরি ফল-

i) আইয়ুব খানের পতন

ii) ১৯৭০ সালের নির্বাচন দিতে বাধ্য করা

iii) মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

৫। কত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়?

(ক) ১৯৬৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি (খ) ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

(গ) ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি

পাঠ-২.৯ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ বলতে পারবেন।
- গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈষম্য, মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা, স্বায়ত্তশাসন

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অন্যতম সোপান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলার জনগণ শোষিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নাম দেয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে ও ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬২ সালের সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা হয়। ১৯৬৮ সালে আইয়ুব সরকারের এক দশক স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'উন্নয়ন দশক' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাঙালিদের কাছে এটা ছিল প্রহসন। কারণ আইয়ুবের দশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এটা মেনে নিতে পারেনি। তাদের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব ছিল না। তারা আন্দোলন করে আইয়ুব খানের বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে, আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে, ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে গণআন্দোলন শুরু হয়। এক পর্যায়ে গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পর্যবসিত হয়।

গণঅভ্যুত্থানের কারণ

১. **বৈষম্যনীতি:** আইয়ুব সরকার সব সময় দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য নীতি প্রয়োগ করে। বস্তত: পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা থেকেই এই বৈষম্য চলতে থাকে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সময় রাজধানী ছিল করাচী। আইয়ুব সরকার রাজধানী পরিবর্তন করেন ইসলামাবাদ। এ শহরের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয়েছিল বিপুল অঙ্কের অর্থ । আর পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয় নামে মাত্র অর্থ। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল প্রবল। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের ১৬টির মধ্যে ১৩টি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল।

২. **মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা:** সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয় না। এর ফলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভূমিকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জনগণের সঙ্গে সরকারের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় সর্বত্র জনগণ সরকার পরিবর্তনের জন্য সোচ্চার হয় এবং তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ গণঅভ্যুত্থান ঘটায়।

৩. **সামরিক শাসন:** ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে গণতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন অধ্যাদেশের মাধ্যমে রাজনীতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেছিলেন। বাংলা ভাষা, বাংলা বর্ণ, রবীন্দ্র সঙ্গীতসহ বাঙালি সংস্কৃতির নানা দিকে আঘাত হেনে বাংলাকে একটি সাম্প্রদায়িক অঞ্চলে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

৪. **আগরতলা মামলা :** ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান আটককৃত অবস্থায় পাকিস্তান সরকার মামলা দায়ের করে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এই মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। হরতাল, বিক্ষোভ, আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানকে উত্তাল করে তোলে।

৫. **স্বায়ত্তশাসনের দাবি:** ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে উদাসীনতা দেখিয়েছিল তার প্রতিক্রিয়াতে পূর্ব পাকিস্তানীরা স্বায়ত্বশাসনের দাবি তোলে। এ কারণে পশ্চিম

পাকিস্তানীরা শেখ মুজিবসহ শত-শত নেতা-কর্মীকে আটকে রেখে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেছিল। এতে করে আন্দোলন আরও কঠোর রূপ ধারণ করে।

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নামে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতার একজন নেতার মৃত্যু হলে আন্দোলন প্রকট আকার ধারণ করে। আসাদ হত্যার পরিণতিতে পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। এর আগে **১৮** ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ সামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর বেয়নেট চার্জে মৃত্যুবরণ করেন। পাকিস্তান সরকার নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে আন্দোলন রুদ্ধ করতে গিয়ে এর গতি আরো তীব্র করে তোলে। ফলে গণঅভ্যুত্থান হয়ে পড়ে অবধারিত।

গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ গণআন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের ফলে স্বৈরাচার বিরোধী মানসিকতা জনগণের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হয়। জনগণ সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকারের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। আন্দোলনের তীব্রতায় আইয়ুব সরকার জনগণের নিকট নতি স্বীকার করে এবং **১৯৬৯** সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাওয়ালপিন্ডিতে একটি সর্বদলীয় গোল টেবিল বৈঠক ডাকতে বাধ্য হন। এ গোলটবিল বৈঠকে তিনটি বিষয়ে নেতৃবর্গ ঐক্যমত্যে পৌঁছান। যথা- যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা।

এই অভ্যুত্থানের ফলে মিথ্যা আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং সকল রাজবন্দীর মুক্তি প্রদান করতে বাধ্য হয় সরকার। এ আন্দোলনের ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির প্রধান নেতায় পরিণত হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের চূড়ান্ত পরিণতির একটি ধাপ। এই আন্দোলনের চাপে আইয়ুব খান **১৯৬৯** সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি লাভ করলে ২৩ ফেব্রুয়ারি এক সংবর্ধনা সভায় তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। আইয়ুব খানের দমন-পীড়ন বাঙালিকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। **১৯৭১** এর মুক্তিযুদ্ধ এই গণঅভ্যুত্থানের ধারাবহিকতারই সর্বোচ্চ প্রকাশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আসাদকে কত তারিখে হত্যা করা হয়?

ক) ১৯ জানুয়ারি খ) ২০ জানুয়ারি গ) ২১ জানুয়ারি ঘ) ২২ জানুয়ারি

২। সর্বদলীয় গোলটেবিল কোন মাসে অনুষ্ঠিত হয়?

ক) জানুয়ারি খ) ফেব্রুয়ারি গ) মার্চ ঘ) এপ্রিল

পাঠ-২.১০ ১৯৭০ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল অনুধাবন করতে পারবেন।
- নির্বাচন পরবর্তী ষড়যন্ত্র বিষয়ে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	গণআন্দোলন, আইনগত কাঠামো, সার্বজনীন ভোটাধিকার, সামরিক শাসন, প্রাথমিক রিপোর্ট, ষড়যন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ

১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ সালের উপর্যুপরি আন্দোলনে পাকিস্তান সরকারের অবস্থা ক্রমশ নাজুক হতে থাকে। ১৯৬৯ এর ফেব্রুয়ারিতে গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান। তিনিও সামরিক শাসন জারি করেন। একই সাথে ঘোষণা করেন, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচন সংক্রান্ত আইনবিধি 'আইনগত কাঠামো আদেশ' বা এলএফও ঘোষণা করেন। আইনগত কাঠামো আদেশ অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয় ৫ অক্টোবর। আর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ২২ অক্টোবর স্থির হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন যথাক্রমে ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে প্রবল ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। জলোচ্ছ্বাস প্লাবিত এলাকাগুলোতে ১৯৭১ সালের ১৭ জনুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইনগত কাঠামো আদেশ অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ৩১৩ নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে সাধারণ আসন সংখ্যা ৩০০ এবং নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৩।

নির্বাচনের ফলাফল

৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬২ টি আসনের ১৬০ টিতে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগ । বাকি দুটির একটিতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নূরুল আমিন এবং অপরটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় জয়ী হন। আওয়ামী লীগের এই ১৬০ টি আসনের সাথে যুক্ত হয় সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসন। ফলে আওয়ামী লীগের মোট আসন দাঁড়ায় ১৬৭; অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কোন প্রার্থী দেয়নি। অন্যদিকে কেবল পশ্চিম পাকিস্তানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জুলফিকার আলী ভূট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)। এ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে কোন আসন পায়নি, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল পিপিপি পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন লাভ করেনি।

১৯৭০ সালের ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের সংবাদ সর্বপ্রথম ১৪ তারিখে খবরের কাগজে আসে। দিনে-দিনে এর ভয়াবহতা উন্মোচিত হতে থাকে। যা দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে সারা বিশ্ব। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ছুটে আসতে থাকে ত্রাণ কর্মীরা। কিন্তু আসে না শুধু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। ত্রাণ সাহায্য দূরের কথা সরকারের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানাতেও কেউ আসে নি। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতারাও এলেন না, মাত্র একজন ছাড়া। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী) প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান। কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের এই হৃদয়হীন আচরণ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির প্রতি এই অঞ্চলের মানুষের মনে চরম বিতৃষ্ঞার জন্ম দেয়। বিতৃষ্ঞা ঘৃণায় পরিণত হল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জীবনহানি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক রিপোর্ট দেখে।

ওই রিপোর্টে মৃতের সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ বলা হল। গভর্নর এস এম আহসানের সংবাদ সম্মেলন বাঙালি মানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনার জন্য তিনি হেলিকপ্টার চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু তাঁকে বিমুখ করা হয়। ১৯৭০ সালের ২৩ নভেম্বর গভর্নর হাউসে (স্বাধীনতার পর বঙ্গভবন) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, হেলিকপ্টার চাওয়া হলেও তা পাওয়া যায় নি।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের এই আচরণে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিব ঘূর্ণিদূর্গত এলাকা সফর শেষে এক বিবৃতিতে জানান, সরকার প্রতিটি পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। আবহাওয়া উপগ্রহ মারফত আগাম তথ্য পাওয়া সত্ত্বেও ঘূর্ণিঝড় কবলিত উপকূলীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করা ও উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ঘূর্ণিঝড়ের পর মৃতের সংখ্যা অথবা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণেরও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

নির্বাচন পরবর্তী ষড়যন্ত্র

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হাতে এভাবে ভরাডুবি ভাবতে পারেনি পাকিস্তান সরকার। এমতাবস্থায়, ক্ষমতা হস্তান্তর না করার লক্ষ্যে শুরু হয়ে যায় ষড়যন্ত্র। পরবর্তীকালে অনেক পাকিস্তানী এই ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির দুই দশকের মাথায় পাকিস্তানি ইংরেজি দৈনিক দ্য ডন ১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই ভাঙন নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে বলা হয় নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার মুহূর্ত থেকে আওয়ামী লীগকে তার অর্জিত বিজয়ের সুফল ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। নির্বাচন পরবর্তী ষড়যন্ত্র শুরু হয় আওয়ামী লীগের বিজয় নিয়ে অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে। জামায়াতে ইসলামি এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত এ দলের একটি পত্রিকা ঢাকা থেকে পাঠানো এক রিপোর্টে লেখে, 'শেখ মুজিবের জয়লাভে হিন্দু নর-নারীরা উল্লাসে নেচেছে, গান করেছে।' অপপ্রচার এখানেই থেমে থাকেনি। এক পর্যায়ে বলা হয়, আওয়ামী লীগের লোকেরা মুসলমান নয়। ইসলামের চেয়ে হিন্দুদের প্রতি আওয়ামী লীগের টান বেশি।

নির্বাচনী ফলাফল সেনাবাহিনীর মতোই পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোকেও বিপর্যস্ত করে দেয়। ভুট্টো ধরেই নিয়েছিলেন তার পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে । তিনিই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। এই আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে দিল একজন বাঙালি যার নাম শেখ মুজিব! বাঙালি মুজিবের নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্টে বিরোধীদলের নেতার আসনে তিনি বসেন কী করে? সুতরাং তিনি নেমে পড়লেন ষড়যন্ত্রে। আর তাঁর সাথে হাত মেলালো সামরিক শক্তি। এহেন বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রের দ্বারা বাতিল করা হল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। ক্ষমতা হস্তান্তর করা হল না বাঙালির হাতে। বরং আলোচনার নামে প্রহসন চালিয়ে ২৫ মার্চের রাত্রে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে অসংখ্য নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করা হয়।

নির্বাচনের গুরুত্ব ও প্রভাব

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এটাই ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনটি ছিল প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। পক্ষান্তরে, ১৯৭০ এর নির্বাচন ছিল একই সাথে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। কেন্দ্র ও প্রদেশে সরকার গঠনের জন্য এ নির্বাচন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমা শাসকদের বৈষম্য-নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে বিজয়ী করার মাধ্যমে জনগণ প্রমাণ করে যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফার দাবি সঠিক ছিল। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে পাকিস্তান নামেই কেবল একটি অখন্ড রাষ্ট্র। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কোন ঐক্য সংহতি বা মতের মিল কিছুই নেই। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধতা প্রমাণিত হয়। আওয়ামী লীগকে একচেটিয়াভাবে ভোটদানের মাধ্যমে ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে জনগণ প্রমাণ করে যে তারা একতাবদ্ধ। জনগণ জানিয়ে দেয় যে, তারা সকল রকম বঞ্চনা আর শোষণের অবসান চায়। এটি ছিল পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনের পর নানামুখি ষড়যন্ত্র, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরও পাকিস্তানিরা টিকে থাকতে পারেনি। বাঙালির আত্মপ্রত্যয় আর দেশপ্রেমের কাছে হার মেনে আত্মসমর্পণ করে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২৪ বছরের মাথায় অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের নির্বাচন। এ নির্বাচনে বাঙালির বিপুল বিজয় তাদের ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে এনে দেয়। কিন্তু পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্রে ক্ষমতা বাঙালিদের হাতে আসেনি। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলন শেষাবধি স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে জন্ম নেয় বাংলাদেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কত আসন লাভ করে ?

(ক) ১৫৫ (খ) ১৬০
(গ) ১৭০ (ঘ) ১৪০

২। ১৯৭০ সালে পিপিপির নেতা কে ছিলেন?

(ক) জুলফিকার আলী ভূট্টো (খ) আইয়ুব খান
(গ) নুরুল আমিন (ঘ) খাজা নাজিমউদ্দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল-	প্রাপ্ত আসন
আওয়ামী লীগ-	১৬৭
পিপলস পার্টি-	৮৮
অন্যান্য-	৫৮
সর্বমোট-	৩১৩

৩। উদ্দীপকে কত সালের নির্বাচনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ?

(ক) ১৯৩৭ (খ) ১৯৪৬
(গ) ১৯৫৪ (ঘ) ১৯৭০

৪। উক্ত নির্বাচনের ফলে-

i. বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়
ii. পাকিস্তানের ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হয়
iii. মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.১১ অসহযোগ আন্দোলন, মার্চ ১৯৭১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনকালীন ঘটনাক্রম জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা হস্তান্তর, সেনাশাসক, জনপ্রতিনিধি, ষড়যন্ত্র

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে তারা জনরায়ের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য পাকিস্তানীদের কাছে দাবি জানায়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে। কিন্তু এই আহ্বানের পশ্চাতে গোপনে চলছিল ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে না দিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার ষড়যন্ত্র। হঠাৎ ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা দেন। কারণ হিসেবে তিনি দেশের মারাত্মক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় নেতা অধিবেশনে অংশ নেবেন না বলে উল্লেখ করেন। এই ঘোষণার পর পর আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, ২৩ বছরের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য বাঙালিরা এখন যে কোন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে তিনি সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন।

২ ও ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করা হয়। বঙ্গবন্ধু জানান, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আন্দোলনের চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। জনমতের ভিত্তিতে ৬ ও ১১ দফার আলোকে সংবিধান রচনার কথাও তিনি পুনরুল্লেখ করেন। ৩ মার্চ ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানের জনসভায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রেখে দল মত নির্বিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান জানায়। সভা শেষে লাখ-লাখ জনতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক হিসেবে মেনে নেয়ার শপথ গ্রহণ করে। ছাত্রলীগের ঘোষণায় রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রে আন্দোলনের খবর প্রকাশ করা না হলে তা বর্জনের কথা বলা হয়। এ দিন বঙ্গবন্ধু পুনরায় ক্ষমতা দখলকারী সেনাশাসকদের প্রতি জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নেবার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু ৪ মার্চ সরকারি-বেসরকারি যে সকল অফিসে কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হয়নি তাদের বেতন দেবার জন্য এবং ব্যাংক কর্মচারীদের ২.৩০ থেকে ৪.৩০ টা পর্যন্ত ২ দিন ব্যাংক লেনদেনের অনুমতি দেন। এছাড়া তিনি হাসপাতাল, ফার্মেসি, এ্যাম্বুলেন্স, সংবাদপত্র, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ফায়ার সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট খোলা রাখার নির্দেশ দেন।

৫ মার্চ দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতায় পাকিস্তানী শাসকরা মরিয়া হয়ে ওঠে এবং দেশের প্রধান-প্রধান শহরে কারফিউ জারি করে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেয়। এতে পরিস্থিতির আরো মারাত্মক অবনতি ঘটে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য এক পর্যায়ে আন্দোলনরত জনতার প্রতি ইয়াহিয়ার দখলদার সরকার গুলি চালাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, ময়মনসিংহসহ নানা স্থানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা বিপ্লবী জনতার প্রতি গুলি চালাতে অস্বীকার করে।

৬ মার্চ সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' পত্রিকায় সারাদেশে সংগঠিত আন্দোলনের উপর খবরে বলা হয়, যশোর, খুলনা, রংপুর, টঙ্গী, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, সর্বত্র এক উত্তেজনাকর অবস্থা বিরাজ করছে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়েছে। এই দিন লেখক-শিল্পীবৃন্দ জনতার প্রতি আপোষহীন হবার আহ্বান জানায়। একই দিন ইয়াহিয়া খান তার এক বেতার ভাষণে জনতার আন্দোলনকে দস্যুবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করে বক্তব্য দেন। আন্দোলন থামানোর জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকার ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন। এ দিন রাতে ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীর জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করে

তাকে কঠোর হাতে আন্দোলন প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃতি জানান।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দশ লাখ মানুষের বিশাল জনসমুদ্রে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার আদি ঘোষণা হিসেবে পরিগণিত হয়।

৮ মার্চ সারাদেশে গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান সম্বলিত একটি লিফলেট প্রচারিত হয়। এ দিন ছাত্রলীগ এক জরুরি বৈঠকে "স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠনের আহ্বান জানায় । সভায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নাম পরিবর্তন করে 'ছাত্রলীগ' ব্যবহার করার প্রস্তাব পাস হয়। সভায় সকল স্থানে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন, পাকিস্তানী সংগীত বাজানো ও উর্দু ছবি প্রদর্শন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৯ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন ও পৃথক রাষ্ট্র গঠনের যে দাবি উত্থাপন করেছেন তা ন্যায়সঙ্গত। ঐ দিন 'দৈনিক পাকিস্তান' তাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানায়। পত্রিকাটি আরো বলে, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসন করার আইনগত অধিকার রয়েছে এবং এক্ষেত্রে সকল বাধা দূর হওয়া উচিত।

১০ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার বীর। ভাসানী জনতার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে চলার অনুরোধ জানান। এদিন 'দৈনিক পাকিস্তান' অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

১১ মার্চ তাজউদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত এক ঘোষণায় বলা হয়, উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে। জাতীয় স্বার্থবিরোধী শক্তির মোকাবেলায় বদ্ধপরিকর হতে হবে। দেশের বাইরে কোন অর্থ প্রেরণ করা যাবে না।

১৩ মার্চ একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকা আওয়ামী লীগের দাবি ও কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানায়।

১৪ মার্চ পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভূট্টো করাচির জনসভায় ক্ষমতা দখলকারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ ও পিপিপির হাতে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে হস্তান্তরের আবেদন জানান। ১৬ মার্চ পুনরায় এক বিবৃতিতে ভূট্টো বলেন, সংখ্যাভিত্তিক সরকার পাকিস্তানের জন্য প্রযোজ্য নয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ মার্চ আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, কোর্ট-কাচারি, স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকবে। এ দিন কতগুলো নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয়, সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং শাখা আপাতত হরতাল পালন করবে ২) বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ৩) জেলা প্রশাসক ও মহকুমা প্রশাসকগণ আইন-শৃংখলা রক্ষা, উন্নয়ন, কর্মকান্ড তদারক করবেন ৪) বন্দর কর্তৃপক্ষ সকল কাজ করবেন । কিন্তু সৈন্য চলাচল ও অস্ত্রপাতি আনা-নেয়ার কাজে কোনভাবেই সহযোগিতা করা যাবে না ৫) আমদানিকৃত মালামাল দ্রুত খালাস করতে হবে। ডাক বিভাগ তাদের কাজ করে যাবে ৬) রেল চালু থাকবে ৭) সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে ই.পি.আর.টি.সি. চালু থাকবে ৮) অভ্যন্তরীণ বন্দরগুলোর কাজ চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যক কর্মচারি কর্মরত থাকবেন ৯) বাংলাদেশের ভেতরে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, মানি অর্ডার, পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ডাক ও তার বিভাগ কাজ করবে ১০) হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য সার্ভিস যথারীতি তাদের কাজ করে যাবে।

১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের অনুরোধে তাঁর সাথে ঢাকায় এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। ১৮ মার্চ সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তদন্ত করা হবে। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়ার এ প্রস্তাব দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তদন্তের ভার এবার তারা নিজেরাই নেবেন।

ইয়াহিয়ার অনুরোধে পুনরায় বঙ্গবন্ধু দেশের চলমান রাজনৈতিক ও শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত অচলাবস্থা নিরসনকল্পে ২০ মার্চ চতুর্থ দফা আলোচনায় মিলিত হন। ইয়াহিয়া খান যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রহসনমূলক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর খান সেনারা আকস্মিক হামলা চালায়। ২১ মার্চ পিপিপি প্রধান ভুট্টো হঠাৎ করে ঢাকায় আসেন এবং ইয়াহিয়ার সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

২৩ মার্চ এক ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে সঙ্কট নিরসনের সর্বশেষ সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যায়। ২৪ মার্চ স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। ব্রিটেন, ভারত, রাশিয়াসহ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসেও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৫ মার্চ ইয়াহিয়া ও ভূট্টো ঢাকা ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী নরপশুরা ঢাকাসহ সারাদেশে নিরস্ত্র জনতার ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় আবাসিক এলাকা, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানায় ইপিআর বাহিনীর ওপর পাকিস্তানী পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী একযোগে আক্রমণ করে। নিহত হয় অগণিত মানুষ।

২৫ মার্চ দিবাগত রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭১ সালের ২-২৫ মার্চ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার তালিকা করুন।

সারসংক্ষেপ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার পর বাংলার মুক্তিকামী জনগণ স্বাধীন দেশের আকাঙক্ষায় অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতার সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের সামগ্রিক নির্দেশনা প্রদান করেন। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কত তারিখে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ?

(ক) ২৫ মার্চ (খ) ২৬ মার্চ
(গ) ২৭ মাচ (ঘ) ২৮ মার্চ

২। কত তারিখে কবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়?

(ক) ২৩ মার্চ (খ) ২০ মার্চ
(গ) ২২ মাচ (ঘ) ২৫ মার্চ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

‘ক’ রাষ্ট্রের পূর্ব অঞ্চল শুরু থেকেই পশ্চিম অঞ্চলের শাসক গোষ্ঠীর শোষণ-নিপীড়নের শিকার। ইতিহাসের একটি পর্যায়ে এসে পূর্ব অঞ্চলের একটি দল জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও ক্ষমতা হস্তান্তর হয় না। এমতাবস্থায় নিপীড়িত জাতিটিকে মুক্ত করার ডাক দেন জাতির প্রধান নেতা।

৩। উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন অংশের মিল আছে?

ক) ভাষা আন্দোলন খ) ছয় দফা
গ) গণঅভ্যুত্থান ঘ) স্বাধীনতা ঘোষণা

৪। উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দল কোনটি?

ক) আওয়ামী লীগ খ) মুসলিম লীগ গ) ন্যাপ ঘ) কমিউনিস্ট পার্টি

পাঠ-২.১২ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অসহযোগ আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন, প্রাদেশিক ক্ষমতা, ভাষণ, অ্যাসেম্বলি, স্বাধীনতা

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন দেখে। কারণ এটা তাঁদের ন্যায্য অধিকার। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করলেও গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। ১ মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হঠাৎই স্থগিত করে। ফলে এতদিনের ধূমায়িত ক্ষোভে বাঙালি বারুদের মতো ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। এই আন্দোলন চলে ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত। আর এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭ই মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ মানুষের এক বিশাল সমাবেশে বঙ্গবন্ধু একটি ভাষণ দেন। যা ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবে আখ্যায়িত।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম, নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস; বাঙলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলীতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলীর মধ্যে আলোচনা করবো; এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসেন, তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলী। তিনি

বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলীতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলী চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলী বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলী ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্দুকের মুখে মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকব।

আমি বলেছি, কিসের বৈঠক বসবে, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেম্বলী কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে কিছুতেই মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলী কল করেছে। আমার দাবি মানতে হবেঃ প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলীতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলীতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমিগভর্ণমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।

২৮ তারিখে কর্মচারীরা বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল,- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন

বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়না পত্র নিবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে পারবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। জয় বাংলা।

প্রাসঙ্গিক ঘটনাক্রম

১ মার্চ ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে লাখ-লাখ মানুষ রাজপথে বেরিয়ে আসে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে কারফিউ জারি করা হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে অব্যাহতভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায়। এক পর্যায়ে সামরিক জান্তার বুলেটের আঘাতে ঢাকাতে ২৬ জন আর চট্টগ্রামে **১২** জন নিহত হয়। খুলনায় মিছিলে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয় **২১** জনকে। এমনিভাবে যশোর, পাবনা, ফরিদপুর, দিনাজপুরসহ নানা স্থানে অনেকে নিহত হয়। কিন্তু বিপ্লবী জনতা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দশ লাখ মানুষের বিশাল জনসমুদ্রে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। এই ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল ঘোষণা হিসেবে পরিগণিত হয়। ৭ই মার্চ ছিল বাঙালির জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন।

৭ই মার্চ বেলা ৩:২০ মিনিটে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্রের জবাবদানে জনতার সামনে উপস্থিত হন বঙ্গবঙ্গু। ওই দিন বঙ্গবন্ধু ছিলেন একমাত্র বক্তা। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণ আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনানুষ্ঠানিক ঘোষণা। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণ বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করেছে স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রামে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ঘোষণা সম্পর্কে আপনার অনুভূতি ব্যক্ত করুন।

সারসংক্ষেপ

অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন যা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র হিসেবে কাজ করে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হবার মুহূর্ত পর্যন্ত বীর বাঙালি এই ভাষণের নির্দেশনাকে মান্য করে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ৭ই মার্চের ভাষণের জন্য বঙ্গবন্ধু কখন সভা মঞ্চে উপস্থিত হন ?

(ক) ৩:২০ মিনিটে (খ) ৩:২৫ মিনিটে
(গ) ৩:৩০ মিনিটে (ঘ) ৩:১৫ মিনিটে

২। ২৬ মার্চ কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(গ) তাজউদ্দিন আহমেদ (ঘ) আতাউল গণি ওসমানী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

হাবিব মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দশম শ্রেণীতে পড়তো। প্রথমে সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না। কিন্তু একজন মহান রাজনীতিকের জাদুকারি ভাষণে সে রোমাঞ্চিত হয় এবং নির্ভয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৩। হাবিব কার ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়-

(ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(গ) তাজউদ্দীন আহমেদ (ঘ) এ এইচ এম কামরুজ্জামান

৪। উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উক্ত ভাষণের উদ্দেশ্য হিসাবে সমর্থনযোগ্য হল-

i) জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে

ii) জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা

iii) পশ্চিম পাকিস্তানীদের মুখোশ উন্মোচন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) iও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.১৩ মুজিবনগর সরকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট ও আনুষ্ঠানিক সরকার গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- অস্থায়ী সরকারের গঠন ও সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আন্তজার্তিক, সার্বভৌম, সাংগঠনিক, প্রতিরোধ, অস্থায়ী সরকার, বৈদ্যনাথ তলা, স্বীকৃতি, শপথ গ্রহণ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল তারিখে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধ পরিচালনা, মুক্তিবাহিনী সংগঠন ও সমন্বয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং প্রত্যক্ষ সহায়তাকারী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় এই সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ প্রবল রূপ নেয় এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়।

সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইট সংঘটিত হবার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানী বাহিনী গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হবার পূর্বমুহূর্তে ২৫ মার্চ দিবাগত রাত অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৫ মার্চের ভয়াবহ গণহত্যার সময় আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ বাসভবন ছেড়ে যান। তিনি বাংলাদেশ সরকার গঠনের পরিকল্পনা শুরু করেন। প্রথমে আত্মরক্ষা, তারপর প্রস্তুতি এবং সর্বশেষে পাল্টা আক্রমণ এই নীতিকে কার্যকর করার জন্য তিনি এই চিন্তা করতে থাকেন। ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় তাজউদ্দীন ফরিদপুর-কুষ্টিয়া পথে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে পৌঁছান। ৩১ মার্চ মেহেরপুর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলাপকালে বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থাপন করেন। বৈঠকের সূচনাতে তাজউদ্দীন জানান যে, পাকিস্তানী আক্রমণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ২৬ মার্চেই বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে সরকার গঠন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে যোগদানকারী সকল প্রবীণ সহকর্মীই মন্ত্রী সভার সদস্য। দলীয় প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শক্রমে দিল্লির উক্ত সভায় তাজউদ্দীন নিজেকে প্রধানমন্ত্রীরূপে তুলে ধরেন। বৈঠকে তাজউদ্দীন আহমদ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য অনুরোধ করেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, উপযুক্ত সময়ে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হবে। এভাবেই অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ধারণার সূচনা হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন

তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের একটি অধিবেশন আহ্বান করেন। উক্ত অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এএইচএম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নিয়োগ করা হয়। ১১ এপ্রিল এম.এ.জি. ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ১১ এপ্রিল বাংলাদেশ বেতারে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ঘোষণা দিয়ে ভাষণ প্রদান করেন। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক

কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার এক আম বাগানে মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সকাল ৯ টা থেকেই সেখানে নেতৃবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিদের আগমন শুরু হয়। দেশি-বিদেশি প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১ টায় শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই বাংলাদেশকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি একে একে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর তিন সহকর্মীকে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় নামে সাতটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এরপর নতুন রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে কর্নেল ওসমানী এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে কর্নেল আবদুর রবের নাম ঘোষণা করেন। এরপর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ঐ দিন থেকে শপথ অনুষ্ঠানের স্থানটির নাম দেয়া হয় মুজিবনগর। অনুষ্ঠানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী উভয়েই বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। ভাষণের শেষাংশে তিনি বলেন, 'বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, বিশ্বের আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারে না। কেন না, আর কোন জাতি আমাদের চাইতে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি। অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি। জয় বাংলা।' এই ভাষণের মধ্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রী দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানালেন। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সূচনা হল।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সেই যুদ্ধকে সার্বিকভাবে পরিচালনার জন্য তাজউদ্দীন আহমদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একটি সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আর তারই ফলশ্রুতিতে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মেহেরপুর জেলার (তৎকালীন মহকুমা) বৈদ্যনাথ তলায় মুজিবনগর সরকারের জন্ম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোথায় মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?
(ক) কলকাতায় পার্ক সার্কাস এভিনিউ (খ) আগরতলা
(গ) শিলিগুড়ি (ঘ) বৈদ্যনাথ তলা

২। মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখ?
(ক) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল (খ) ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল
(গ) ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল (ঘ) ১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিল

নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সরকার

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমেদ

অর্থমন্ত্রী	এম মনসুর আলী
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	এএইচএম কামরুজ্জামান

৩। উপরের ছকে বর্ণিত সরকার কোন নামে দেশে-বিদেশে পরিচিত অর্জন করে ?

(ক) পূর্ব পাকিস্তান সরকার (খ) পূর্ব বাংলা সরকার

(গ) মুজিবনগর সরকার (ঘ) কলকাতা প্রবাসী সরকার

৪। উপরের ছকে বর্ণিত সরকার কোথায় শপথ গ্রহণ করে?

(ক) কলিকাতার পার্ক সার্কাস এভিনিউয়ে

(খ) আগরতলায়

(গ) শিলিগুড়িতে

(ঘ) মেহেরপুরের ভবের পাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথ তলায় আম্রকাননে

পাঠ-২.১৪ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অপারেশন সার্চ লাইট, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থী শিবির, সেক্টর কমান্ডার

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বাঙালিদের উপর অপারেশন চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়। অপারেশন সার্চলাইট নামক ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর তত্ত্বাবধানে প্রথম সদর দপ্তরটি গঠিত হয়। এখানে ৫৭ তম বিগ্রেডের বিগ্রেডিয়ার আরবাবকে ঢাকা নগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং মেজর জেনারেল খাদিম রাজাকে প্রদেশের অবশিষ্টাংশে অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। অপারেশনের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান। পরিকল্পনা মোতাবেক ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ওয়ারলেস বসানো জিপ ও ট্রাকে করে ঢাকার রাস্তায় নেমে পড়ে। তাদের প্রথম সাঁজোয়া বহরটি ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এক কিলোমিটারের মধ্যে ফার্মগেট এলাকায় ব্যারিকেডের মুখে পড়ে। কয়েকশ লোক প্রায় ১৫ মিনিট ধরে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেয়। সেনাবহর শহরময় ছড়িয়ে গণহত্যা শুরু করে । নিরস্ত্র জনগণের উপর এই হামলা ও নির্বিচার গণহত্যা অভিযান বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সকল এলাকায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ তৎপর হয়ে উঠে। শত্রু সেনারা সংখ্যায় অনেক ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, তাই এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৭ মার্চ বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাঁর সরকারের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। বাঙালিদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে ভারত তার সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত বরাবর শরণার্থী শিবির স্থাপন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে মুক্তিবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তেলিয়াপাড়ায় অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের সদর দপ্তরে একত্রিত হন। এ সভায় চারজন সিনিয়র কমান্ডারকে অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। মেজর সফিউল্লাকে সিলেট-ব্রাহ্মণ বাড়িয়া অঞ্চলের অধিনায়কের দায়িত্ব দেয়া হয়। কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চলের অধিনায়কের দায়িত্ব পান মেজর খালেদ মোশাররফ। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মেজর জিয়াউর রহমান এবং কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলের অধিনায়ক হন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বময় নেতৃত্ব দেয়া হয়।

১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার তথা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। পরদিন তাজউদ্দীন আহমদ আরও তিনজন আঞ্চলিক অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেন। ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ রংপুর অঞ্চলের, মেজর নাজমুল হক

দিনাজপুর-রাজশাহী-পাবনা অঞ্চলের এবং মেজর এম. এ. জলিল বরিশাল-পটুয়াখালি অঞ্চলের অধিনায়কত্ব লাভ করেন। প্রতিটি অঞ্চলকে একেকটি সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১০ থেকে ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের এক সম্মেলনে অপারেশন চালানোর সুবিধার্থে সমগ্র বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টর ও বিভিন্ন সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

১ নং সেক্টরঃ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশের সমগ্র এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। এ সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল হরিনাতে। সেক্টর প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর জিয়াউর রহমানকে। পরে মেজর রফিকুল ইসলাম সে দায়িত্ব পান।

২ নং সেক্টরঃ ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত হয় ২ নং সেক্টর। আগরতলার ২০ মাইল দক্ষিণে মেলাঘরে ছিল এ সেক্টরের সদর দপ্তর। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। পরবর্তীতে মেজর এ.টি.এম হায়দার দায়িত্ব পান।

৩ নং সেক্টরঃ উত্তরে চূড়ামনকাঠি (শ্রীমঙ্গলের নিকট) থেকে সিলেট এবং দক্ষিণে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার সিঙ্গারবিল পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত হয় ৩ নং সেক্টর। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর কে.এম শফিউল্লাহ। পরে দায়িত্ব পান মেজর এ.এন.এম নূরুজ্জামান।

৪ নং সেক্টরঃ উত্তরে সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা থেকে দক্ষিণে কানাইঘাট থানা পর্যন্ত ১০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা নিয়ে ৪নং সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত। পরে দায়িত্ব পান ক্যাপ্টেন এ রব। এর হেডকোয়ার্টার ছিল প্রথমে করিমগঞ্জ এবং পরে আসামের মাসিমপুরে।

৫ নং সেক্টরঃ সিলেট জেলার দুর্গাপুর থেকে ডাউকি (তামাবিল) এবং জেলার পূর্বসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। হেড কোয়ার্টার ছিল বাঁশতলাতে।

৬ নং সেক্টরঃ সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা নিয়ে গঠিত। প্রধানত রংপুর ও দিনাজপুরের ইপিআর বাহিনী নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার। সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল পাটগ্রামের নিকটবর্তী বুড়িমারিতে।

৭ নং সেক্টরঃ রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া এবং দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে গঠিত হয়। ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক এবং পরে সুবেদার মেজর এ. রব ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল বালুরঘাটের নিকটবর্তী তরঙ্গপুরে।

৮ নং সেক্টরঃ এপ্রিল মাসে এই সেক্টরের অপারেশনাল এলাকা ছিল কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী জেলা। মে মাসের শেষে অপারেশন এলাকা সঙ্কুচিত করে কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলা, সাতক্ষীরা মহকুমা এবং ফরিদপুরের উত্তরাংশ নিয়ে এই সেক্টর পুনর্গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং পরে মেজর এম.এ মঞ্জুর। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল পশ্চিমবঙ্গের বেনাপোলে।

৯ নং সেক্টরঃ বরিশাল ও পটুয়াখালি জেলা এবং খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। এই সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ছিল পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাটের নিকটবর্তী টাকিতে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.এ জলিল এবং পরে মেজর এম.এ মঞ্জুর ও মেজর জয়নাল আবেদিন।
১০ নং সেক্টরঃ নৌ-কমান্ডো বাহিনী নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়।

১১ নং সেক্টর: টাঙ্গাইল জেলা এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. আবু তাহের। মেজর তাহের যুদ্ধে গুরুতর আহত হলে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহকে সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়।

কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়।
১২ এপ্রিল থেকে এই সদর দপ্তর কার্যক্রম শুরু করে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম. এ. রব এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে যথাক্রমে চিফ অব স্টাফ এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়। নাগাল্যান্ডের দিমাপুরে ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয়। অনুরূপভাবে, পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা নৌসেনাদের নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর প্রথম নৌবহর বঙ্গবন্ধু নৌবহর উদ্বোধন করা হয়।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন।

আত্মসমর্পণ
এগারো নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সৈন্যরা ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার টঙ্গীর কাছে পৌঁছে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে তারা সাভারে অবস্থান নেয়। সকাল দশটায় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকায় প্রবেশ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের খসড়া দলিল নিয়ে অপরাহ্ণ এক ঘটিকায় ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বিকাল চারটায় ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছেন। মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিলে সাক্ষর করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমপর্ণের বর্ণনা দিন।

সারসংক্ষেপ

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-যুবকসহ সর্বস্তরের মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। নয় মাসের সর্বাত্মক যুদ্ধ আর ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বিজয়ী হয় বীর বাঙালি। আমরা পেলাম একটা নতুন দেশ। অভ্যুদয় হল স্বাধীন বাংলাদেশের ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?

(ক) ১০ (খ) ১১
(গ) ১৩ (ঘ) ১৫

২। প্রবাসী সরকার বা মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) তাজউদ্দীন আহমেদ

(গ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমদ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। জীবনের বেশিরভাগ সময়ই শোষক গোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে জেলে কাটিয়েছেন। তাঁর এই প্রতিবাদের সফল পরিণতি দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীনতার পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসান।

৩। নেলসন ম্যান্ডেলা কে কোন বাঙালি নেতার সাথে তুলনা করা যায়?

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (ঘ) মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

৪। শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচয় কোনটি?

ক) শেখ সাহেব খ) বঙ্গবন্ধু গ) জাতির পিতা ঘ) সবটি

পাঠ-২.১৫ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা পারবেন।
- জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, জাতিসংঘ, আন্তজার্তিক, সম্প্রদায়, ভেটো, একাত্মতা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ব ইতিহাসে এক অসামান্য ঘটনা। বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার এ লড়াই বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক মাত্রা পায়। এর বড় প্রমাণ হচ্ছে, পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন, অন্যদিকে বাংলাদেশের পক্ষে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরাসরি অবস্থান গ্রহণ। বস্তুত, তৎকালীন দুই পরাশক্তির মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রতিফলিত হয়।

ভারতের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চূড়ান্ত বিজয় আসার আগেই ভারত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের শেষ দিক পর্যন্ত সময়কালে ভারত বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আশ্রয়দান করে। কলকাতায় অবস্থিত প্রবাসী সরকারের কার্যক্রমে সহায়তা দেয় ভারত। এছাড়াও পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য সামরিক সহায়তা প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য কূটনৈতিক প্রচারণা অব্যাহত রাখে ভারত। মে মাসের প্রথম দিক থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করে। জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলার সমস্যার প্রত্যাশিত সমাধানের জন্য কূটনৈতিক ও সামরিক প্রচেষ্টা জোরদার করে ভারত। এ সময় ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সব ধরনের সমর্থনদানে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট থেকে কার্যকর সমর্থন পায়। ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিক্সনের একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার। নিক্সন-কিসিঞ্জার নিয়ন্ত্রিত মার্কিন নীতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পরিচালিত হয়। যুদ্ধচলাকালীন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও বস্তুগত উভয়ভাবেই সহায়তা করে। নিক্সন মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাদের কিছুই করার নেই বলে জানান। উল্লেখ্য, মধ্য-পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সিয়াটো ও সেন্টো নামে দুটি প্রতিরক্ষা চুক্তি তথা মৈত্রী জোট গঠন করে। ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র তার বিশ্বস্ত মিত্রকে রক্ষা করতেই মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন দেয়। ২৫ মার্চ থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধে না জড়িয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে। জুলাই মাসে কিসিঞ্জার গোপনে পাকিস্তানের সহায়তায় চীন সফর করেন। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী চুক্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো হয়। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমস্যার কূটনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করে এবং ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য আহ্বান জানায়।

পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিক সরকার ও বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সংলাপ আয়োজনের চেষ্টা করে। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তেমন ফল লাভ হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন দেখল যে, জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার করা যাচ্ছে না তখন তাঁরা সামরিক হুমকির আশ্রয় নেয়। দেশটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে যুদ্ধবিরতি মানতে বাধ্য করা, পাকিস্তানকে রক্ষা করা এবং মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করা। ৯ ডিসেম্বর নিক্সন ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে বঙ্গোপসাগরে মোতায়ন করেন, যাকে ভারত সরকার পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করার হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে। যুক্তরাষ্ট্রের এই হুমকির জবাবে সোভিয়েত নৌ বাহিনী নিউক্লিয়ার মিসাইলবাহী দুটি ডুবোজাহাজ বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করে। যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য যুদ্ধ পরিহার করার জন্য তার নৌবহর বঙ্গোপসাগর থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমর্থনদানের নীতির অংশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমর্থন দেয়। এছাড়াও বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও চীনকে হীনবল করার বিষয়টি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাবনায় থাকতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ২ এপ্রিল, ১৯৭১ সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিকোলাই পদগোনি পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানকে একটি পত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা জরুরিভিত্তিতে বন্ধ করার এবং বিদ্যমান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আহ্বান জানান। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তান চীনের সহযোগিতা পায়। ১৯৬৭-১৯৬৮ সালে পাকিস্তান, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একত্রিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষ শক্তিতে পরিণত হয়। এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাষ্ট্রকে সমর্থন দিত সোভিয়েত ইউনিয়ন সাধারণত তার প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকে সমর্থন দিত। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে চীনের ভূমিকা কী হবে তা সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। জুলাই পর্যন্ত দেশটি নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। জুলাই মাসে কিসিঞ্জারের চীন সফরের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবস্থান পরিবর্তন করে। আগস্ট মাসে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়। ১-১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে তিনবার ভেটো দেয়। উল্লেখ্য, পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

চীনের ভূমিকা

চীনের অবস্থান ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে। এশিয়া মহাদেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র ছিল ভারত । ১৯৬০ দশকের শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ প্রশ্নে মত পার্থক্য শুরু হয়। তখন থেকেই দুটি রাষ্ট্র ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করতে শুরু করে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এই সীমান্ত যুদ্ধে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে সমর্থন না করে ভারতকে সহযোগিতা করে। পক্ষান্তরে, ১৯৫২ সাল থেকেই পাকিস্তান ছিল চীনের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার ওপরে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কিছুটা হলেও নির্ভর করত। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পক্ষ নেয়।

জাতিসংঘের ভূমিকা

১৯৭১ সালে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম। বাংলাদেশের গণহত্যা ও নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থানট ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট পত্র লেখেন। তিনি বাংলার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ত্রাণ প্রেরণের প্রস্তাব দেন । ১৯৭১ সালের ১৯ মে মহাসচিব পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে আগত এক কোটি শরণার্থীর জরুরি সাহায্যের জন্য সকল রাষ্ট্র ও সংগঠনের প্রতি আহবান জানান। তাদের আশ্রয় ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য জাতিসংঘ খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করে। এর উল্টোদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মত পরাশক্তির চাপে জাতিসংঘকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরণের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির বাঁচা-মরার লড়াই। এ যুদ্ধে বৃহৎ শক্তিসমূহ নিজ-নিজ মতাদর্শিক অবস্থান ও জাতীয় স্বার্থের আলোকে ভূমিকা গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত বাংলাদেশকে অনবদ্য সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কত তারিখে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ?

(ক) ৫ ডিসেম্বর (খ) ৬ ডিসেম্বর
(গ) ৭ ডিসেম্বর (ঘ) ৮ ডিসেম্বর

২। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী দেশ কোনটি?

(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) সোভিয়েত ইউনিয়ন
(গ) ভারত (ঘ) কোনটি নয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মলি তার নানার কাছে গল্প শুনেছে যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিল, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতিও দিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর অনেক দেশই আমাদের রাষ্ট্র পূণর্গঠনে সাহায্য করেছে।

৩। বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে কোন দেশ?

(ক) ভারত (খ) যুক্তরাজ্য
(গ) ইরাক (ঘ) ইরান

৪। বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রসমূহ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করায় স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছে-

i. সামরিক সহায়তা
ii. কূটনৈতিক তৎপরতা
iii. বিশ্বব্যাপী প্রচার-প্রচারনা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল:-

১। ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৪৭ সালে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এর মধ্যে একটি রাষ্ট্রের পূর্ব অংশে বাস করতো মোট জন সংখ্যার প্রায় ৫৬ ভাগ জনগণ। রাষ্ট্রটির রাজধানী, স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় পশ্চিম অংশে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য পদে ছিলেন সব পশ্চিমারা। তারা পূর্ব অংশের অধিবাসীদের উপর সব সময় বৈষম্যমূলক আচরণ করতো। পূর্ব অংশের ছাত্র সমাজ ষড়যন্ত্র রুখতে আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য দেশটির সরকার নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য লোকের প্রাণ হানি ঘটায়।

(ক) উর্দু ও ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি উথাপন করেন কোন গণপরিষদ সদস্য?
(খ) ১৯৫৪ সালে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের পটভূমি উল্লেখ করুন।
(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত ছাত্র-আন্দোলনের মধ্যে কি কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পান ? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ছাত্র সমাজের আন্দোলটির অবদান মূল্যায়ন করুন।

২। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে 'ছয়দফা' কর্মসূচি একটি অনন্য দলিল। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে বাঙালির বাঁচার দাবি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ছয় দফা কেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ বেয়েই উনসত্তরের গণঅভ্যুথান এবং সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে গণরায় আসে। যা জন্ম দেয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। তাই ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বা বাঙ্গালির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

(ক) কখন কোথায় আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় ?
(খ) কখন কোথায় এবং কীভাবে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ?
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের যোগসূত্র ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) "ছয়দফা বাঙালির মুক্তি সনদ বা বাঙালীর ম্যাগনাকার্টা" উক্তিটি মূল্যায়ন করুন।

৩। নিচের ছকটি লক্ষ করুন ও প্রশ্নের উত্তর দিন।

সরকার

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপরাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমেদ
অর্থমন্ত্রী	এম মনসুর আলী
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	এএইচএম কামরুজ্জামান

(ক) কত মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়?
(খ) বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কেন ?
(গ) উল্লিখিত ছকটি বাংলাদেশের কোন সরকারকে নির্দেশ করে ?
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধে উক্ত সরকার গঠনের তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন।

৪। রহিম সাহেব তার নাতনীকে একটি গণঅভ্যুত্থানের গল্প শুনাচ্ছিলেন । তিনি এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে এ আন্দোলন সারা দেশজুড়ে প্রবল হয়ে উঠলে শাসক গোষ্ঠী মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সকল আসামীকে মুক্তিদান করে।

(ক) কে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন ?

(খ) ছাত্রদের **১১** দফার গুরুত্বপূর্ণ দুটি দাবি উল্লেখ করুন।

(গ) উদ্দীপকে যে মামলার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকে যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তার ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১	ঃ	১। ক	২। গ	৩। গ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২	ঃ	১। গ	২। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩	ঃ	১। ঘ	২।গ	৩। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪	ঃ	১। খ	২। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫	ঃ	১। খ	২। খ	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭	ঃ	১। ক	২। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। ঘ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৯	ঃ	১। খ	২। খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১০	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১১	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১২	ঃ	১। ক	২। ক	৩। খ	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৩	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। গ	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৪	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ক	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৫	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ক	৪। ঘ

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

ইউনিট ৩

বাঙালি তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সরল রৈখিক নয়। স্বাধীনতাকামীদেরকে কখনও মোকাবেলা করতে হয়েছে বিদেশীদের; আবার কখনো বা দেশীয় চক্রের। বাঙালির ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অদম্য আন্দোলনের ইতিহাস, পাকিস্তানী শাসক চক্রের বিরুদ্ধে **১৯৫২** সালের ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় গাঁথা, যা পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি, **১৯৭১** সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাহসী ইতিহাস ইত্যাদি। বাংলাদেশ **১৯৭১** সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছে দীর্ঘকাল পূর্বেই। পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর ব্রিটিশরা এদেশের মানুষকে পরাধীনতার শিকলে বেঁধে ফেলে। সে শিকল ভাঙ্গার জন্য যুগের পর যুগ বরেণ্য ব্যক্তিরা লড়াই-সংগ্রাম করেছে। এ ইউনিটে এ ধরনের কয়েকজন সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের জীবন, কর্ম ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-**১**: হাজী শরীয়তুল্লাহ্
পাঠ-**২**: শহীদ তিতুমীর
পাঠ-**৩**: নওয়াব আবদুল লতিফ
পাঠ-**৪**: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
পাঠ-**৫**: নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
পাঠ-**৬**: শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক
পাঠ-**৭**: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
পাঠ-**৮**: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
পাঠ-**৯**: মাস্টারদা সূর্যসেন
পাঠ-**১০**: নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু
পাঠ-**১১**: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাঠ-৩.১ হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র আদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র অবদান নিরূপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরাধীনতা, মুসলিম সম্প্রদায়, ঐক্যবদ্ধ, ওয়াহাবি মতবাদ, ফরায়েজি

১৭৫৭ সালে পলাশীতে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের পর ব্রিটিশরা এদেশের মানুষকে পরাধীনতার শিকলে বেঁধে ফেলে। শিকল ভাঙ্গার কাজটি করার জন্য যুগের পর যুগ যে সব ব্যক্তি লড়াই-সংগ্রাম করে গেছেন হাজী শরীয়তুল্লাহ তাদের মধ্যে একজন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌ই প্রথম উপলব্ধি করেন যে ব্রিটিশ শোষণ ও উৎপীড়নের কবল থেকে রেহাই পেতে হলে এখানকার মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে দাঁড়াতে হবে। আর এ কারণে ফরায়েজি ও ওয়াহাবিদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি একটি ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র আদর্শের প্রতি নিম্নবিত্ত মুসলমান পেশাজীবী শ্রেণীসমূহ আকৃষ্ট হয়। দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতী ও তেলী সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর পতাকাতলে জড়ো হয়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র জীবন বৃত্তান্ত

হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ সালে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর নামানুসারে শরিয়তপুর জেলার নামকরণ করা হয়েছে। মাত্র আট বছর বয়সে পিতাকে হারানোর পর চাচার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন শরীয়তুল্লাহ্। কলকাতা ও হুগলীতে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি আঠারো বছর বয়সে মক্কা গমন করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি ওয়াহাবি মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ওয়াহাবি মতবাদের ভিত্তিতেই হাজী শরীয়তুল্লাহ্ তাঁর সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করেন। সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারমূলক এই আন্দোলন এক পর্যায়ে অত্যাচারী জমিদারদের শোষণ হতে কৃষকদের মুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র আন্দোলন পরবর্তীতে 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে পরিচিতি পায়। ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমেই তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আমৃত্যু সোচ্চার থাকেন। ১৮৪০ সালে শরীয়তুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে, পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েজিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র অবদান

ফরায়েজি মতাদর্শ: হাজী শরীয়তুল্লাহ তৎকালীন আরবের ওহাবিদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মানসে একটি ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিদেশী "বিধর্মীদের" রাজত্বে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন উৎপীড়নের কবল থেকে রেহাই পেতে হলে মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে দাঁড়াতে হবে। এ জন্য ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ কার্যকর করতে হবে। আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্যসমূহকে ফরজ বলা হয়। শরীয়তুল্লাহ মুসলমানদের স্থানীয় লোকাচার পালনের বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে, অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্যসমূহকে কার্যকর করতে হাজী শরিয়তউল্লাহ ফরায়েজি মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব: হাজী শরীয়তুল্লাহ ধর্মীয় চিন্তার পাশাপাশি মুসলিম সমাজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলিম সমাজে অসাম্য ও বর্ণ বা শ্রেণীভেদের কোন জায়গা নেই।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ফরায়েজি আন্দোলন ইসলামী ধর্মের ভিত্তিতে হলেও এক পর্যায়ে এসে এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে নীলকর ও জমিদারদের উৎপীড়নে মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় যখন জর্জরিত তখন এই সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ্ উদাত্ত আহবান জানান।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হাজী শরীয়তুল্লাহ্র অবদান আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ওয়াহাবি মতবাদে দীক্ষিত হাজী শরীয়তুল্লাহ বাংলার দরিদ্র মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকের জুলুম থেকে বাঁচানোর সংগ্রাম করেন। শরীয়তুল্লাহ উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইকে ধর্মীয় শুদ্ধতাবাদের সাথে যুক্ত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হাজী শরীয়তুল্লাহ কোন মতবাদে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন?

(ক) শিয়া (খ) সুন্নি
(গ) সুফি (ঘ) ওয়াহাবি

২। ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল–

i. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
ii. মুসলমানদের ধর্মমুখী করা
iii. শাসকদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। হাজী শরীয়তুল্লাহ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম
গ) ফরিদপুর ঘ) মাদারীপুর

পাঠ-৩.২ শহীদ তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শহীদ তিতুমীরের জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- শহীদ তিতুমীরের চিন্তা-চেতনা জানতে পারবেন।
- শহীদ তিতুমীরের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সম্পর্ক দেখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংস্কার, প্রতিরোধ পর্ব, নীলকর, জমিদার. ধর্মসংস্কারক, বাঁশের কেল্লা।

স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অন্যতম এক নাম তিতুমীর। নিম্নবর্গের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার সাহসী এক লড়াই গড়ে তুলেছিলেন তিতুমীর।

শহীদ তিতুমীরের জীবন বৃত্তান্ত

শহীদ তিতুমীরের প্রকৃত নাম সাইয়িদ মীর নিসার আলী। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর (মতান্তরে হায়দারপুর) গ্রামে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলাই তাঁর চরিত্রে দুটি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল। একদিকে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ,সত্যনিষ্ঠ ও অপরদিকে অসমসাহসী। গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিতুমীর স্থানীয় এক মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। আরবি ও ফারসি সাহিত্যে একদিকে যেমন তাঁর ছিল দক্ষতা, অপরদিকে ছিল গভীর অনুরাগ। তিনি ইসলামি শাস্ত্রে পন্ডিত ছিলেন। মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিতুমীর একজন দক্ষ কুস্তিগীর হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। বিশিষ্ট মল্লবীর হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল বলে তিনি নদীয়ার জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর অধিনায়ক পদ লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ঔপনিবেশিক শাসন ও জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়নে বিপর্যস্ত মুসলমান জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য চেষ্টা এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিতুমীর ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর নারকেলবাড়িয়ায় ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শহীদ হন।

চিন্তা-চেতনার বিকাশ

ছোটবেলা থেকেই আরবি ও ফারসি সাহিত্যে তিতুমীরের বেশ দক্ষতা ছিল। ১৮২২ সালে চল্লিশ বছর বয়সে তিতুমীর হজ্বব্রত পালনের জন্য মক্কা শরীফ যান এবং সেখানে বিখ্যাত ইসলামি ধর্মসংস্কারক ও ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৮২৭ সালে মওলানা বেরেলভীর মতাদর্শে দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম ধর্মের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিতুমীর মনে করতে শুরু করেন যে, ইসলামকে তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার হলেও, তা ধীরে-ধীরে নীলকর, অত্যাচারী জমিদার এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসন থেকে বাংলার মানুষকে মুক্ত করার আন্দোলনে রূপ নেয়।

তিতুমীরের অবদান

তিতুমীরের সংগ্রাম একদিকে ছিল ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, অপরদিকে ছিল শোষক শ্রেণী অর্থাৎ জমিদার ভূ-স্বামীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম। তিতুমীর যখন থেকে বিদেশী আধিপত্যমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন, ঠিক তখনই ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও দেশীয় শোষক-উৎপীড়ক শ্রেণী তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। এমতাবস্থায়, সাহসী তিতুমীর কায়েমী স্বার্থচক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। উন্নত রণকৌশল ও মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য, তিতুমীর ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে

নারকেলবাড়িয়ায় এক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। এ পর্যায়ে তিতুমীর নিজেকে 'বাদশা' ঘোষণা করেন। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। ১৯ নভেম্বর তিনি শহীদ হন।

শিক্ষার্থীর কাজ	তিতুমীরের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম দিককার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব তিতুমীর। উপনিবেশিক শাসক ও তাদের দেশীয় চক্রের বিরুদ্ধে তিতুমীরের লড়াই আমাদের ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। ১৮৩১ সালের নভেম্বরে তিতুমীর নারকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে ব্রিটিশ প্রতিরোধ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। অসম এই লড়াইয়ে তিতুমীর শহীদ হন। তিতুমীরের এই প্রতিরোধ লড়াই বাঙালির জন্য এক অপরিসীম অনুপ্রেরণার উৎস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাঁশের কেল্লা কে নির্মাণ করেছিলেন?

(ক) স্যার সলিমুল্লাহ (খ) নওয়াব আবদুল লতিফ

(গ) শহীদ তিতুমির (ঘ) সৈয়দ আহমেদ

২। তিতুমির ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শহীদ হন। তাঁর আন্দোলনের মূলধারা কী ছিল?

(ক) হিন্দুদের দমন করা (খ) ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা

(গ) অর্থ উপার্জন করা (ঘ) ইংরেজ শাসন প্রতিরোধ করা

৩। তিতুমিরের আন্দোলনের সাথে জড়িত–

i. শিক্ষা বিস্তারে অনুকূল চেতনা সৃষ্টি

ii. জমিদার ও নীলকরদের বিরোধিতা

iii. ইংরেজ শাসন বিরোধীতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৩ নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নওয়াব আবদুল লতিফের আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নওয়ার আবদুল লতিফের জীবন বৃত্তান্ত বলতে পারবেন।
- নওয়ার আবদুল লতিফের রাজনৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সহযোগী, নীলকর, মুসলিম সমাজ, সংস্কার

ঊনিশ শতকে বাংলার ধ্বংসোন্মুখ মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবনের কাজে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন নওয়াব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ফরায়েজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। নওয়াব লতিফ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংগ্রামের পথে গিয়ে নয় বরং ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ ও ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলিমদের পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আর তাহলেই এ জনপদের মুসলিম সমাজের একদিন মুক্তি ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে, আবদুল লতিফ স্বদেশের রাজনীতিক স্বার্থে এই জনপদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সদা সচেষ্ট থেকেছেনও বটে। আমরা যদি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পিছনের অনুঘটকগুলোকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, তাহলে দেখব যে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতৃত্বের মধ্যে উদার গণতন্ত্র, সংসদীয় ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ইত্যাদি পাশ্চাত্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা প্রবলভাবে রয়েছে। তাঁরা এটা বিশ্বাস করতেন যে, এ সকল ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মধ্যেই এ অঞ্চলের মানুষের মুক্তি আসবে। আর এ উদার গণতন্ত্র, সংসদীয় ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি মতাদর্শ ও শাসনব্যবস্থার সাথে মুসলিম সমাজের পরিচয় ঘটানোর জন্য নবাব আব্দুল লতিফ সারাজীবন অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এবং ব্রিটিশ সরকার ব্যবস্থার কাছাকাছি থেকেই এ জনপদের পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের মধ্যে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া বহমান করা সম্ভব। বস্তুত এ অঞ্চলে মুসলিম সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নবাব আবদুল লতিফের অবদান অনেক।

নওয়াব আবদুল লতিফের জীবন বৃত্তান্ত

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ সনে ফরিদপুর জেলার রাজাপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল লতিফের বাবা ছিলেন একজন আইনজীবী। সচেতন মানুষ হিসেবে লতিফের বাবা ছেলেকে আরবির সাথে সাথে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে কলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। কলকাতা মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষালাভের পর মাত্র উনিশ বছর বয়সে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন প্রথম সরকারি আমলা যিনি নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে নীল চাষীদের রক্ষায় এগিয়ে আসেন। আবদুল লতিফ বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিভিন্ন পদে চাকরি করেছেন। এছাড়াও তিনি ভুপালের নবাবের দরবারে কিছুকাল প্রধানমন্ত্রীর পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৮৮৪ সালে সরকারি চাকরি থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই নওয়াব আবদুল লতিফের জীবনাবসান হয়।

নওয়াব আবদুল লতিফের রাজনীতি চিন্তা

রাজনৈতিক পদ্ধতি বিষয়ে আবদুল লতিফ যে পথ নির্দেশ করেছেন, তা পূর্ববর্তী মুসলিম ধর্মীয়-সামাজিক নেতৃবৃন্দের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। তিনি প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পথ বর্জন করে আপোষ ও সহযোগিতার পথে লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিরূপ মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি ব্যথিত হন। এ বিরূপ মনোভাব প্রশমিত করার জন্যে তিনি মোটামুটিভাবে তিনটি লক্ষ্য স্থির করেন। লক্ষ্য তিনটি হচ্ছে-

ক) মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিদ্বেষভাব দূরীকরণ

খ) মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
গ) হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা

নওয়াব আবদুল লতিফের উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, তিনি মূলত ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক মুক্তি এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন।

আবদুল লতিফ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ ও ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রথমে মুসলিমদের পুনরুজ্জীবিত করতে না পারলে, এ জনপদের মুসলিমদের মুক্তি কোনদিনও সম্ভব হবে না। আবদুল লতিফ স্বদেশের স্বার্থে এই জনপদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতেও সচেষ্ট থেকেছেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুসলিম সমাজ সম্পর্কে নওয়াব আব্দুল লতিফের ধ্যান-ধারণা বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ঊনিশ শতকের মুসলিম পুনর্জাগরণের আন্দোলনে যে কয়জন সংস্কারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নওয়াব আবদুল লতিফ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ফরায়েজি বা ওহাবি আন্দোলনের ধাঁচে নয়; বরং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ইংরেজদের আনুকল্য লাভের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনাধীনে মুসলমানদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তিনি দেখলেন যে, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দূর্বলতা শিক্ষা ক্ষেত্রে। ইংরেজি শিক্ষায় মুসলিমরা একেবারেই অনগ্রসর। তাই তিনি মুসলমানদের শিক্ষিত করতে ১৮৬৭ সালে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি স্থাপন করেন। এ ছাড়া নীলকরদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার তাগিদে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলার মুসলিম সমাজে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নওয়ার আবদুল লতিফ কাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন?
(ক) সামরিক বাহিনী (খ) পুলিশ
(গ) নীলকর (ঘ) আমলা

২। নওয়াব আবদুল লতিফ ইংরেজদের সাথে মুসলিমদের কী ধরনের সম্পর্ক চাইতেন?
(ক) সহযোগিতামূলক (খ) বিচ্ছিন্নতাবাদী
(গ) ঘৃনামূলক (ঘ) কোনটিই নয়

৩। নওয়ার আবদুল লতিফ কোথায় বিদ্যালাভ করেন?
(ক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) কলকাতা মাদ্রাসা
(গ) প্রেসিডেন্সি কলেজ (ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ-৩.৪ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক আন্দোলন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক নিষ্ঠা, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, অসহযোগ আন্দোলন, বিশ্বশান্তি, স্বরাজ পার্টি, বেঙ্গল প্যাক্ট।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে গভীর নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের জন্য চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবন্ধু আখ্যা দেওয়া হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন একজন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। বিলেতে পড়ালেখা করার সময়ই তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দাদাভাই নওরোজির সান্নিধ্যে আসেন। বলা যায়, তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছিল দাদাভাই নওরোজির সান্নিধ্যে এসে। রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকে তিনি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনকে মেনে নিতে পারেননি। চিত্তরঞ্জন দাশ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর নির্মমতা ও অপশাসনের বিরোধিতা করেছেন তীব্রভাবে। রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মা গান্ধীর সাথে থাকলেও নানান বিষয়ে বিশেষ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করতেন যে, আইন পরিষদে থেকেই সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, আইন, অধ্যাদেশ ইত্যাদির বিরোধিতা করতে হবে। অর্থাৎ শত্রুকে ঘায়েল করতে হলে তাদের মধ্যে থেকেই অন্যায়, নিপীড়নমূলক কাজের বিরোধিতা করতে হবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবন বৃত্তান্ত

সি. আর দাশ নামেও পরিচিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে। তাঁর পিতা ভুবনমোহন দাস কলকাতা হাইকোর্টের সলিসিটার ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন। ভবানীপুরের লন্ডন মিশনারী সোসাইটি স্কুল থেকে ১৮৮৬ সালে এন্ট্রান্স পাশ করার পর চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য তিনি ইংল্যান্ডে গমন করেন এবং ১৮৯৪ সালে তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে তিনি রাজনীতিতে জড়িত হন। অনুশীলন সমিতি ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কার্যক্রমে তিনি যুক্ত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি লাভজনক আইনজীবির পেশা পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আরো বেশী সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কিন্তু গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করলে সি.আর দাশ সিদ্ধান্তটিকে গুরুতর ভুল বলে নিন্দা করেন। পরবর্তীতে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। ক্ষণজন্মা এই দেশবন্ধু ১৯২৫ সালের ১৬ জুন অসুস্থ অবস্থায় দার্জিলিংয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক চিন্তা

চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ অর্জনের জন্য আন্দোলনকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পথ মনে করলেও, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির গুরুত্বও তিনি স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর ন্যায় তিনিও অহিংস পন্থায় স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি মনে করতেন যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান হলো আইন পরিষদ। অর্থাৎ তিনি স্বদেশে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন সমর্থন করতেন না ঠিকই কিন্তু মনে করতেন ইংরেজ প্রবর্তিত আইন সভার অভ্যন্তরে থেকেই ব্রিটিশ সরকার বিরোধী চাপ সৃষ্টি করতে হবে। নিম্নে চিত্তরঞ্জন দাশের আরো কিছু রাজনৈতিক চিন্তা তুলে ধরা হলো।

- জাতীয়তাবাদকে চিত্তরঞ্জন দাশ বিশ্ব শান্তির সোপান মনে করতেন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান কোনদিনও এদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে পারবে না।
- চিত্তরঞ্জন দাশ সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার হিসেবে মনে করতেন। কারণ প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত সংসদই জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
- চিত্তরঞ্জন দাশের সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে সমস্যাটি অত্যন্ত প্রকট ছিল তা হলো হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সমস্যা। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সমস্যা জিইয়ে রেখে স্বরাজ আন্দোলনের গন্তব্যে পৌঁছানো অনেক কঠিন হবে। আর তাই ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পূর্বে তিনি নিজ প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে একটি চুক্তি করেন যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত। 'বেঙ্গল প্যাক্ট' এ সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়। যতদিন মুসলমানরা ৫৫ শতাংশে না পৌঁছায়, ততদিন পর্যন্ত মোট সরকারি চাকুরির ৮০ ভাগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বদেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে নিগূঢ়ভাবে ভালবেসেছেন। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ বাঙালি। স্বরাজ পার্টি গঠন, বেঙ্গল প্যাক্ট এর মত উদ্যোগগুলি নিয়ে এ জনপদের রাজনীতিকে অসাম্প্রদায়িক ধারায় প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হন চিত্তরঞ্জন দাশ।

শিক্ষার্থীর কাজ	চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক অবদান আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক নিষ্ঠা ও গভীর দেশপ্রেমের জন্য এই উপমহাদেশের জনগণ চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে। একজন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অনঢ় অবস্থান। তিনি রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনকে মেনে নিতে পারেননি। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি লাভজনক আইনজীবির পেশা পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আরও বেশি সোচ্চার হয়ে দেশপ্রেমের অমোঘ স্বাক্ষর রাখেন। 'বেঙ্গল প্যাক্ট' দেশবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চিত্তের অনন্য উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বেঙ্গল প্যাক্টের রূপকার কে?

(ক) পন্ডিত মতিলাল নেহেরু (খ) মহাত্মা গান্ধী

(গ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (ঘ) মাওলানা শওকত আলী

২। দেশবন্ধু নামে খ্যাত কে?

(ক) ফজলুল হক (খ) চিত্তরঞ্জন দাশ

(গ) আব্দুল লতিফ (ঘ) সুভাস চন্দ্র বসু

৩। বেঙ্গল প্যাক্ট হল-

i. হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়ানোর চেষ্টা

iii. হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বৃদ্ধি

iii. হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ানো

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নবাব স্যার সলিমুল্লাহর জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- নবাব স্যার সলিমুল্লাহর রাজনীতির ক্ষেত্রে অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মানব সেবায় তাঁর অবদান বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বঙ্গভঙ্গ, মুসলিম লীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সম্প্রদায়, ন্যায্য, শিক্ষা বিস্তার

ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও চিন্তা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ ছিলেন অনেকের থেকে আলাদা। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী নবাব সলিমুল্লাহ বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ভেবেছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে তিনি খুশি হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এই বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এ অঞ্চলের দূর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের সরকারি ও প্রশাসনিক সুবিধা পাওয়ার কিছুটা হলেও সুযোগ সৃষ্টি হবে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে তিনি বঙ্গভঙ্গ রদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন যে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে দ্বার খুলেছিল সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্বশাসিত স্থানীয় সংস্থা ও আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দাবী তুলেছিলেন।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এর জীবন বৃত্তান্ত

১৮৭১ সালের ৭ জুন ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে খাজা সলিমুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবাব খাজা আহসানউল্লাহ। খাজা সলিমুল্লাহ নবাবী পরিবারের বিত্ত-বৈভবের মধ্যে বেড়ে উঠলেও চিন্তা-চেতনায় ছিলেন আলাদা। নবাব পরিবারের মধ্যে সলিমুল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যৌবনকালে তিনি কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকুরি করলেও পরে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০১ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে তিনি নবাবের পদসহ পারিবারিক কর্তত্ব লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সৎ, সাহসী ও ধার্মিক ছিলেন। নবাব সলিমুল্লাহ ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতায় মারা যান।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে তিনি খুশি হয়েছিলেন এটা ভেবে যে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এ অঞ্চলের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের উন্নয়নের দ্বার কিছুটা হলেও খুলবে। শুধু বঙ্গভঙ্গই নয়, এ জনপদের মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেকোন রাজনৈতিক ব্যাপারেই তিনি আগ্রহী ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ ও নবাব সলিমুল্লাহ

নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরে ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হলে দারুণ খুশি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলে তিনি বঙ্গবিভাগ টিকিয়ে রাখার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালান। কংগ্রেসের আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করলে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ খুবই মর্মাহত হন।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও নবাব সলিমুল্লাহ

১৯০৬ সালে ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নবাব সলিমুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বাংলার বাইরের মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের আশায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অবশ্য সর্বভারতীয় পর্যায়ে ভারতের মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তাগিদ ও চিন্তা-ভাবনা বঙ্গভঙ্গের আগেও চলছিল। সে যা হোক, নবাব সলিমুল্লাহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় এক অধিবেশনে মিলিত করে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।

মুসলিম স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ সকল প্রদেশের স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায়, আইনসভায় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নবাব সলিমুল্লাহ নানামুখী অবদান রাখেন। এছাড়াও মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক সামগ্রিক উন্নয়নে নবাব সলিমুল্লাহ আজীবন নানামুখী ভূমিকা রেখেছেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণে নবাব সলিমুল্লাহর অবদান আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ সারাজীবন ধরেই বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ভেবেছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে তিনি খুশি হয়েছিলেন। সলিমুল্লাহ মনে করেছিলেন বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এ অঞ্চলের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের সরকারি ও প্রশাসনিক সুবিধা পাওয়ার কিছুটা হলেও সুযোগ সৃষ্টি হবে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে তিনি এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে থাকেন। তিনি বলেন, বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে দ্বার খুলেছিল সেটাও বন্ধ করে দিল। নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এতে তিনি সফল হন। বস্তুত: নবাব সলিমুল্লাহ সারা জীবন মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণে নানামুখী ভূমিকা রেখেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নবাব সলিমুল্লার পিতার নাম কী?
(ক) নবাব খাজা আলীমুল্লাহ (খ) নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ
(গ) নবাব খাজা আহসান উল্লাহ (ঘ) খাজা হাসান আশকারী

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কে অবদান রেখেছিলেন?
(ক) নবাব সলিমুল্লাহ (খ) নবাব খাজা আলীমুল্লাহ
(গ) নবার সিরাজউদ্দৌলা (ঘ) নবাব আলীবর্দী খান

৩। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নবাব সলিমুল্লাহর সবচেয়ে বড় উদ্যোগ কোনটি?
(ক) মিটফোর্ড হাসপাতাল (খ) সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ
(গ) আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (ঘ) মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

পাঠ-৩.৬ শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অবগত হবেন।
- কৃষক-শ্রমিক প্রজাদের জন্য তাঁর বিভিন্ন অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জনদরদী, কৃষক সমাজ, জমিদারি, পৃথকরাষ্ট্র, বঙ্গীয় আইন সভা, নিখিল বঙ্গ প্রজাসমিতি, লাহোর প্রস্তাব।

বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশে যে সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আজীবন সংগ্রাম করেছেন শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক তাদের একজন। তাঁকে একজন জনদরদী রাজনীতিবিদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি সবসময় তৎপর থাকতেন। এ জন্য তাঁকে অবহেলিত কৃষক সমাজের যোগ্য অভিভাবক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলার সাধারণ মানুষ তথা কৃষকের জীবন মানোন্নয়ন করার জন্য তিনি শিক্ষার অগ্রগতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। কৃষকের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারটি মাথায় রেখেই এবং তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়েই এ কে ফজলুল হক ১৯৩৫ সালে তাঁর সৃষ্ট রাজনৈতিক দলের নতুন নামকরণ কৃষক প্রজা পার্টি করেন। মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের মুক্তিদান ও জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার জন্য ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি গণ-আন্দোলন পর্যন্ত করেছে। তিনি নানান সময়ে রাষ্ট্রীয় পদে আসীন থাকা অবস্থায় সর্বনাশা ঋণের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী থাকা অবস্থায় এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে বঙ্গীয় আইনসভায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করে আইন পাশ করা হয়। বাংলার হতদরিদ্র প্রজাকূলের জন্য আজীবন লড়াই করেছেন শেরেবাংলা। লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। এই লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমেই প্রথম বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখানো হয়।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের জীবন বৃত্তান্ত

১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক বৃহত্তর বরিশাল জেলার রাজাপুর থানাধীন সাতুরিয়া গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার বাড়ি বরিশালের চাখার। তাঁর পিতা কাজী ওয়াজেদ ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। ফজলুল হক বাল্যকাল থেকেই তীক্ষ্ণ মেধা শক্তির পরিচয় দেন। তৎকালে জমিদারের জুলুম ও ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর শোষণ তাঁর অন্তরে মর্মপীড়া সৃষ্টি করেছিল। ফজলুল হক সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দারুণভাবে অনুভব করতেন। তাঁর সারা জীবনের রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন। ফজলুল হকের কর্মময় জীবন ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি পত্রিকা সম্পাদনা, আইন ব্যবসা, অধ্যাপনা, সরকারি চাকরি এবং রাজনীতি সবই করেছেন। ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল তিনি মারা যান।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড

পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ কে ফজলুল হক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় সকল সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ব্রিটিশ শাসন এবং অবাঙালি নেতৃত্বের বিরোধিতা ছিল তাঁর চেতনামূলে। কৃষক-প্রজা সাধারণ মানুষ ছিল তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের কাছে সমান জনপ্রিয় ছিলেন এ কে ফজলুল হক। নিম্নে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কিছু রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড তুলে ধরা হল-

- ১৯১৬ সালের হিন্দু-মুসলমান 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' সম্পাদনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন।
- ১৯১৮-১৯ সালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

- ১৯২৯ সালে তিনি 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯৩৬ সালে যার নতুন নামকরণ হয় কৃষক-প্রজা পার্টি।
- ১৯৩০-১৯৩২ সালে লন্ডনে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষে যে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং জোরালো বক্তব্য রাখেন।
- ১৯৪২ সালে সামান্য কয়েক দিন বাদে, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আসীন ছিলেন।
- ১৯৪০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবে একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। ১৯৪২ সাল থেকেই শেরেবাংলা সাম্প্রদায়িক "দ্বিজাতি তত্ত্বের" জোরালো বিরোধীতা শুরু করেন।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকই এ জনপদের রাজনীতিতে জমিদার-অভিজাত নেতৃত্বের চিরাচরিত বেষ্টনী ভেঙ্গে দেন। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য 'ডাল-ভাত' কর্মসূচি প্রবর্তন করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শেরেবাংলার রাজনৈতিক জীবন আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

একজন জনদরদী, সাহসী ও বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসেবে বাংলার কৃষক, বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। বাংলার সাধারণ মানুষ তথা কৃষকের স্বার্থরক্ষার তাগিদে ফজলুল হক ১৯৩৫ সালে তাঁর সৃষ্ট রাজনৈতিক দলের নতুন নামকরণ করেন কৃষক প্রজা পার্টি । জোতদার-মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের মুক্তিদান ও জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার জন্য ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি গণ-আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য একাধিক আলাদা রাষ্ট্রের দাবি সম্বলিত "লাহোর প্রস্তাব" উত্থাপন করেছিলেন শেরেবাংলা। ১৯৪০ সালে এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেও, ১৯৪২ সাল থেকেই তিনি সাম্প্রদায়িক "দ্বিজাতি তত্ত্বের" বিরোধীতা শুরু করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ১৮৫২ সালে (খ) ১৮৬৪ সালে

(গ) ১৮৭৩ সালে (ঘ) ১৮৮১ সালে

২। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় এ কে ফজলুল হক-

i. ঋণ সালিসী বোর্ড স্থাপন করেন

ii. প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করেন

iii. ডাল-ভাত কর্মসূচি চালু করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নাম জড়িয়ে আছে

(ক) কৃষক প্রজা পার্টি (খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(গ) ভাষা আন্দোলন (ঘ) ছয় দফা

পাঠ-৩.৭ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন-বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- তাঁর সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	সাম্রাজ্যবাদ, মজলুম, কৃষক-শ্রমিক, অধিকার, অসহযোগ, মুক্তিযুদ্ধ।

সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলার যেসব সন্তান আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন তাঁদের অন্যতম মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মওলানা ভাসানী এমন এক রাজনৈতিক নেতা ছিলেন ক্ষমতার মস্নদ যাকে কোন দিন বশীভূত করতে পারেনি। মওলানা ভাসানীর জন্মই হয়েছিল যেন বাংলার খেটে খাওয়া কৃষক-শ্রমিকের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে জীবনাতিপাত করার জন্য। তাঁর আপোষহীন রাজনীতির পিছনে ছিল এ জনপদের কৃষক-জনতার স্বার্থ। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল অবহেলিত সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক মুক্তি। ভাসানী এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এ তিন রাষ্ট্রেরই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সংগ্রামী অবদান রেখেছেন। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখা থেকে শুরু করে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন তিনি। সর্বোপরি, জেনারেল আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন দানের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন বৃত্তান্ত

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা শহরের অদূরবর্তী ধনপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হাজী শরাফত আলী খান। অতি অল্প বয়সে ভাসানী পিতা-মাতাকে হারান। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর আরো দুই ভাইকে হারিয়ে বালক আব্দুল হামিদ ওরফে চেকা মিয়া তাঁর চাচা ইব্রাহিম খানের আশ্রয়ে থেকে স্থানীয় মাদ্রাসায় কিছুকাল পড়াশুনা করেন। তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের দুঃখ জর্জরিত জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল বলে তিনি উৎপীড়িত মানবতার ডাকে দরদী বন্ধুর মত সাড়া দিয়েছেন। টাঙ্গাইলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। সারাজীবন তিনি নিপীড়িত মানুষের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে গেছেন । ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। টাঙ্গাইলের সন্তোষে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে ক্ষমতার মোহ কখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড আবর্তিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মুক্তিকে ঘিরে। তিনি শোষণ ও বঞ্চনা থেকে বাংলার নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

- মওলানা ভাসানী ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি হন।
- তৎকালীন পাকিস্তানের মুসলিম লীগের পূর্ব বাংলার ক্ষুদ্ধ সদস্যরা ১৯৪৯ সালের ২৪ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে এবং এই নতুন রাজনৈতিক দলটির সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী।

- ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ঢাকায় পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হলে ভাসানী এক তীব্র প্রতিবাদী বিবৃতি দেন। পুলিশ তাঁকে গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়।
- ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি বিরোধী দলীয় মোর্চা গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ২২৮ টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের আসন ১৪৩টি পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৭ টি আসন পায়।
- ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী ঢাকায় পাকিস্তানের সকল বামপন্থী দলের একটি সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলনের মাধ্যমে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামক নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।
- ভাসানী আইয়ুব সরকারকে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় হিসেবে গণ্য করেন এবং এই স্বৈরশাসকের অপসারনের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার এবং মুক্তিদানের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।
- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যে উপদেষ্টা কমিটি বানানো হয় ভাসানী সেই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সারা জীবন রাজনীতি করেছেন মেহনতী মানুষকে শোষক ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলার জন্যে। জীবনভর মেহনতী মানুষের সঙ্গে থাকায় তাঁকে মজলুম জননেতা খেতাব দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মওলানা ভাসানীর রাজনীতির দর্শন আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার আদায়ের এক সরব সৈনিক। ক্ষমতার মসনদ কখনও তাঁকে আকর্ষণ করে নি। সাধারণ মানুষের পাশে তিনি ছিলেন সদা ঢাল হয়ে, বন্ধু হয়ে। আর এ কারণে মাওলানা ভাসানীকে বলা হয়ে থাকে ‘মজলুম জননেতা’। তিনি সারাজীবন রাজনীতি করেছেন মেহনতী মানুষকে শোষক ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলার জন্যে। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল অবহেলিত সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক মুক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মওলানা ভাসানীর মুসলিম লীগে যোগদান করেন কত সালে?

(ক) ১৯১৫ সালে (খ) ১৯১৬ সালে
(গ) ১৯১৭ সালে (ঘ) ১৯৩৭ সালে

২। ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানী কোন দলের সভাপতি হন?

(ক) মুসলিম লীগ (খ) জনতা পার্টি
(গ) ন্যাপ (ঘ) আওয়ামী মুসলিম লীগ

পাঠ-৩.৮ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রতিভাবান, গণতন্ত্রমনা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক, অখন্ড, বাংলা, সংবিধান।

ভারত বিভাগের প্রাক্কালে বাংলা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি অখন্ড স্বাধীন বাংলা নামে আর একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তীতে এ দলটিই আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়। শুধু তাই নয় এমনকি ব্রিটিশ-ভারতেও তিনি একজন তুখোড় প্রতিভাবান রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। একজন শ্রমিক নেতা হিসেবে কলকাতায় রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু করলেও, অল্প সময়ে তিনি মেহনতি মানুষের জন্য প্রায় ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। তিনি ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং আইনসভায় জনগণের অধিকারের প্রশ্নে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের কারণেই ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করে। গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তিনি আমৃত্যু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষা পেয়েছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন বৃত্তান্ত

১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জাহিদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। সোহরাওয়ার্দীর শিক্ষাজীবন ছিল পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারায় পূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনশাস্ত্র ইত্যাদিতে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। ১৯১৮ সালে তিনি বিলেত থেকে বার-এট-ল পরীক্ষা পাশ করে স্বদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যেই কলিকাতার একজন নামকরা আইনজীবি এবং বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। এরপর থেকে শুরু করে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় আইন ব্যবসা ও রাজনীতি করে কাটিয়েছেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড

১৯২১ সনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর দেশপ্রেম দ্বারা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও বাগ্মিতার বলে তিনি একজন উঁচুদরের রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেন। অবহেলিত ও অসংগঠিত মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের জন্য সোহরাওয়াদী সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সারা জীবন ধরে চেয়েছিলেন যে এ জনপদে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক; যার মাধ্যমে মানুষের মুক্তি ঘটবে। নিম্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আরো রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড তুলে ধরা হল-

- ১৯২১ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় আইন পরিষদে সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।
- তিনি ব্রিটিশ শাসন অবসানের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এর নেতৃত্বে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তি সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

- ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন।
- শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের প্রাক্কালে ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি একটি অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন।
- ১৯৪৯ সালের আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
- পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন হয় তার পিছনেও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।
- তিনি মূলত একজন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ ছিলেন। ভারত বিভাগের পূর্বে তিনি মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার জন্য পৃথক নির্বাচনের সমর্থন দিতেন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যৌথ নির্বাচনের সমর্থন দিতেন।
- ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।
- সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পদে আসীন থেকেছেন।

এছাড়াও পুরোধা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সারাজীবন একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সংগঠক হিসেবে বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টি করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবন আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রীতিনীতির প্রতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি আমৃত্যু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও বাগ্মিতার বলে তিনি একজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেন। অবহেলিত ও অসংগঠিত মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। পরবর্তীতে এ দলটিই আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর যে রাজনৈতিক দীক্ষা তা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সোহরাওয়াদী কোন দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা?

(ক) কংগ্রেস (খ) মুসলিম লীগ
(গ) আওয়ামী লীগ (ঘ) কৃষক-প্রজা পার্টি

২। সোহরাওয়ার্দী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) মেদিনীপুর খ) বর্ধমান
(গ) কলকাতা ঘ) ঢাকা

পাঠ-৩.৯ মাস্টারদা সূর্যসেন (১৮৯৪-১৯৩৪)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাস্টারদা সূর্যসেনের এর জীবন-আদর্শ ও সংগ্রামের পটভূমি বলতে পারবেন।
- মাস্টারদা সূর্যসেনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নিপীড়ণ, সশস্ত্র প্রতিরোধ, বিপ্লবী, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন তাদের মধ্যে মাস্টারদা সূর্যসেনের নাম অগ্রগণ্য। সূর্যসেন পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। তাই তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বলা হত মাস্টারদা সূর্যসেন। ছাত্রজীবন থেকেই ভারতবর্ষের গরীব-দুঃখী মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে ব্যাথিত করে তোলে। রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের চট্রগ্রাম অঞ্চলের নেতা হিসেবে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তৎপর হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাতে তাঁর চিত্ত শান্ত হয় নি। ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের উপর ব্রিটিশ সরকারের নিপীড়ন দ্রুত বন্ধের জন্য তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি বেছে নেন। সূর্যসেন মনে করতেন বিপ্লব ছাড়া ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ থেকে সরানোর স্বপ্ন সুদূর পরাহত। সূর্যসেন তাঁর নেতৃত্বের গুণে অনেক তরুণ-তরুণীদের সংগঠিত করতে পেরেছিলেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামী বাহিনীর সদস্য করতে পেরেছিলেন। এই সশস্ত্র সংগ্রামীদের সাথে নিয়েই ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্যে মাস্টারদা ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সূর্যসেনকে ফাঁসি দেয়া হয়।

মাস্টারদা সূর্যসেনের জীবন বৃত্তান্ত

মাস্টারদা সূর্যসেন ১৮৯৪ সালে চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম সূর্যকুমার সেন। বাবা রাজমনি সেন এবং মা শশীবালা দেবী। সূর্যসেনের বাবা পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। সূর্যসেন স্থানীয় দয়াময়ী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯১২ সালে চট্টগ্রাম ন্যাশনাল হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন।

সূর্যসেন যখন নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন বঙ্গভঙ্গকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। ক্রমে এই আন্দোলন বিশেষ করে চট্রগ্রাম এলাকায় বিপ্লবী আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯১৬ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বি.এ. শ্রেণিতে পড়াকালীন শিক্ষক শতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক বৈপ্লবিক আদর্শে দীক্ষিত হন সূর্যসেন। সূর্যসেন চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন।

মাস্টারদা সূর্যসেনের রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড

সূর্যসেনের শিক্ষক অধ্যাপক শতীশচন্দ্র চক্রবর্তী যুগান্তর নামক বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশে বিপ্লবীরা তখন অনুশীলন ও যুগান্তর এই দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। ১৯১৮ সালে বহরমপুর থেকে ফিরে এসে সূর্যসেন 'যুগান্তর' দলে যোগ দিয়ে সংগঠনটিকে সক্রিয় করে তোলেন এবং বিবাদমান দল দুইটিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ক্রমে তাঁর দলই চট্টগ্রামে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালের পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের ছাত্ররা ক্লাস বর্জনসহ সভা-সমাবেশ করে। সভায় সূর্যসেন তাঁর বক্তৃতায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। এক পর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তিনি স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করেন এবং দেওয়ানবাজার এলাকায় 'সাম্যশ্রম' নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 'সাম্যশ্রম' থেকেই কংগ্রেসের কাজ ও গোপনে বিপ্লবীদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকেন সূর্যসেন। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা স্বরাজ অর্জন ব্যর্থ হলেও পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে

সংকল্পবদ্ধ হয়। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সংগঠিত করেন মাস্টারদা। এক পর্যায়ে সূর্যসেন গ্রেফতার হন এবং ১৯২৮ সালের শেষ দিকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় বিপ্লবীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। চট্টগ্রামে তিনি `ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, এর একটি শাখা গড়ে তোলেন।

১৯২৯ সালে চট্টগ্রামের জেলা কংগ্রেসের সম্মেলনে সূর্যসেন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। এ সময়ে বিভিন্ন বিক্ষোভ মিছিল ও বিপ্লবী কার্যক্রমের পরিকল্পনাও নির্দেশনা দিতে থাকেন। ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিলের সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং অস্ত্রাগার লুটের ঘটনা ছিল সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফসল। ১৯৩২ সালের জুন মাসে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্তকে চট্টগ্রাম কারাগার ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। পরে ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রীতিলতা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে সফল আক্রমণ চালান। এ সময় প্রীতিলতা গুলিবিদ্ধ হন এবং সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এ ঘটনার পর মাস্টারদা পটিয়া এলাকার গৈরালা গ্রামে আত্মগোপন করেন। একজন গ্রামবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মাস্টারদা গ্রেফতার হন। পরের বছর ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর ফাঁসি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাস্টার দা সূর্যসেন এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে অকুতোভয় এক সৈনিক মাস্টারদা সূর্যসেন। ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের ওপর ব্রিটিশ সরকারের নিপীড়ন দ্রুত বন্ধের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি বেছে নেন এই অকুতোভয় সৈনিক। সূর্যসেন মনে করতেন বিপ্লব ছাড়া ব্রিটিশদেরকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার আর কোন পথ নেই। গণমানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে সূর্যসেন ব্রিটিশদের কাছে দেশদ্রোহী হিসেবে পরিগণিত হয়। এ অভিযোগে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মাস্টারদা কোন গ্রামে আত্মগোপন করেন?

(ক) চাখার (খ) নোয়াপাড়া

(গ) হায়দারপুর (ঘ) গৈরালা

২। মাস্টাদা সূর্যসেনকে বৈপ্লবিক আর্দশে উদ্বুদ্ধ করেন কে?

(ক) মহাত্মা গান্ধী (খ) সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী

(গ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (ঘ) সুভাষচন্দ্র বসু

পাঠ-৩.১০ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।
- নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন-বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- ভারতীয়-স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কংগ্রেস, স্বাধীনতা, আজাদ হিন্দ ফৌজ, সশস্ত্রপন্থা, বিপ্লবী

ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদেরকে বিতাড়িত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামপন্থী রাজনীতিকদের মধ্যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু অন্যতম। রাজনৈতিকভাবে নেতাজির পরিবার ছিল খুবই সচেতন। পারিবারিক কারণে অথবা তৎকালীন ভারতের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার কারণে সুভাষ বসু ছোটবেলা থেকেই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে বড় হতে থাকে। কলেজ জীবন থেকেই তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতের বিপন্নদশা দেখে মর্মযাতনায় ভূগতে থাকেন। বিশেষ করে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পরে তিনি শোকে মূ্যহমান হয়ে যান এবং ভাবতে থাকেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া আর কোনভাবেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব না। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই সুভাষ বসু ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতির প্রশ্নে, কঠোর আন্দোলনের পক্ষে থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধীর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উভয়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। সুভাষ বসু ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীর ন্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তিনি খুব শক্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবাসীর মধ্যে অফুরন্ত চিত্তশক্তি আছে; আর এ কারণেই ভারত এক দিন স্বাধীন হবে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন বৃত্তান্ত

১৮৯৭ সনের ২৩ জানুয়ারি ভারত উপমহাদেশের অন্যতম বীর সন্তান স্বাধীনতাকামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। নেতাজির বাবার নাম জানকীনাথ বসু। তাঁর পিতা পেশায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ও বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য। রাজনৈতিকভাবে নেতাজীর পরিবার ছিল খুবই সচেতন। পারিবারিক প্রভাবের কারণে হোক বা তৎকালীন ভারতে বিরাজমান উত্তপ্ত রাজনীতিক আবহাওয়ার কারণেই হোক, সুভাষ বসু কৈশোর থেকেই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করার পরও দেশসেবার ও স্বদেশের মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেননি। সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৪৫ সনের ১৮ আগস্ট রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক চিন্তা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পুরোটা জুড়ে ছিল ভারতবাসীর মুক্তি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত একদিন স্বাধীন হবে। সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার অবসান হবে। নিম্নে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কয়েকটি পদক্ষেপ তুলে ধরা হল-

- ১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধীতার মধ্যেই সুভাষ বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, গান্ধীর সাথে মতদ্বৈততার কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করে অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক নামে দল গঠন করেন।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে ভারত ছেড়ে রাশিয়া চলে যান। রাশিয়া থেকে তিনি বার্লিন যান। সেখানে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের লক্ষ্যে জার্মানির সমর্থন লাভ করেন। সুভাষ বসু ভারতের জন্য একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন।
- ১৯৪৩ সালে তিনি 'আজাদ হিন্দ ' ফৌজের দায়িত্ব নেন এবং আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন।
- ১৯৪৪ এর মার্চ মাসে তাঁর বাহিনী বার্মা পৌঁছে যায়।
- সুভাষ বসুর লক্ষ্য ছিল সামারিক অভিযানের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর রাজনৈতিক চিন্তা আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নে যে কয়জন রাজনীতিক উদ্যোগী হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর তাঁদের অন্যতম। পারিবারিকভাবে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং তৎকালীন ভারতের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার কারণে সুভাষ বসু ছোটবেলা থেকেই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে বড় হতে থাকেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। এক পর্যায়ে সুভাষ বসু দেশের বাইওে চলে যান এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) লক্ষ্ণৌ (খ) কটক

(গ) গুজরাট (ঘ) সুরাট

২। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাহিনীর নাম কি ছিল?

(ক) মুক্তি ফৌজ (খ) আজাদ হিন্দ ফৌজ

(গ) রেড আর্মি (ঘ) গণবাহিনী

পাঠ-৩.১১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির জনক হয়ে উঠা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	টুঙ্গিপাড়া, পাকিস্তান, আওয়ামী লীগ, ছয় দফা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতির জনক, নির্মম হত্যাকান্ড, বিপদগামী সেনা

পাকিস্তানী অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বাঙালির দুই যুগ দীর্ঘ সংগ্রামের সর্বাগ্রে গণ্য নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত অধ্যায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুগের পর যুগ বাঙালির লড়াই সংগ্রাম পরিণতি পায় বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী নেতৃত্বের মাধ্যমে। তিনি স্কুল ছাত্র থাকা অবস্থায় জনহিতকর ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। তরুন বয়সেই বঙ্গবন্ধু ভারতীয় উপমহাদেশের তুখোড় রাজনৈতিক নেতা হোসেন সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর যোগ্য রাজনৈতিক শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন।

ভারত ভাগ হবার পর শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করায় তাঁকে ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরোধী তথা বাঙালির স্বাধিকারের লড়াইয়ে শেখ মুজিব অগ্রসৈনিক। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা বঙ্গবন্ধুকে অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন শেষ বিচারে বঙ্গবন্ধু অমোঘ নেতৃত্বের পরিচয় বহন করেন। নির্বাচনে জয় লাভ করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ তথা বাঙালিকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরুতেই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। এই অসহযোগ ছিল মূলত পাকিস্তানের মৃত্যু পরোয়ানা। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যাবতীয় সঙ্কেত প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু। অত:পর ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ থেকে নি:সৃত হয় স্বাধীনতার ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বৃত্তান্ত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সনের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল পথ চলতে বাধা-বিপত্তিতে পড়লে তিনি কখনো তা এড়িয়ে চলেননি; বরং সাহসিকতার সঙ্গে তার মোকাবেলা করেছেন। ১৯৪৭ সালে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাস করার পর একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন। শেখ মুজিব ছিলেন আজীবন রাজনীতিক। রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি শেরেবাংলা এ কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত পুরোধা রাজনীতিবিদদের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ ছাড়া নেতাজী সুভাষ বসুর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়াস বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে দৃশ্যত সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতকের হাতে নির্মমভাবে সপরিবারে নিহত হন।

বিদেশে অবস্থান করছিলেন বিধায় বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধু হত্যার দৃশ্যপটে বিপদগামী সেনাসদস্যরা থাকলেও, এ কথা আজ প্রতিষ্ঠিত যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড ছিল সর্বোতোভাবে একটি দেশি-বিদেশী চক্রান্তের ফল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়, তিনি মনে প্রাণে ছিলেন একজন উদারনৈতিক মুক্তিকামী মানুষ। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড পুরোটা জুড়ে ছিল বাংলার গণমানুষের মুক্তি। নিম্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আরও কিছু রাজনৈতিক চিন্তা তুলে ধরা হল-

- পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকলেও, সাম্প্রদায়িক 'দ্বিজাতি তত্ত্বে' বঙ্গবন্ধুর অবিশ্বাস ছিল। তাই পাকিস্তানের জন্মের অল্প সময় পর থেকেই তিনি অসাম্প্রদায়িক উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথে হাঁটতে শুরু করেন।
- পাকিস্তানের একেবারে সূচনা পর্বেই বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের ন্যায্য হিস্যা কখনোই বুঝিয়ে দেবে না।
- দল ও দলের বাইরে বিরোধীতা স্বত্ত্বেও **১৯৬৬** সালে ছয় দফা উত্থাপনের দূরদর্শিতা দেখান বঙ্গবন্ধু। ছয় দফা পরবর্তীতে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে চিহ্নিত হয়।
- **১৯৭০** সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে সর্বোচ্চ মাত্রার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন বঙ্গবন্ধু। তিনি কখনোই বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রামকে তথাকথিত বিচ্ছিনতাবাদের তকমার মধ্যে আটক হতে দিতে চাননি। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে, **১৯৭১** সালের ৫ই এপ্রিল প্রকাশিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ম্যাগাজিন নিউজউইক এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' অর্থাৎ 'রাজনীতির কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

স্বাধীনতার পরে জাতি গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একের পর এক আদর্শিক ও বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। দেশের ভেতরে নানামুখী শক্তির অরাজকতা ও বিদেশী চক্রান্তের পরিণতিতে একের পর এক বাধাগ্রস্ত হলেও, আমৃত্যু বাংলার মানুষের মুক্তির লড়াই চালিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির জনক হয়ে উঠার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাঙালির স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। **১৯৭১** এর মুক্তিযুদ্ধের তিনিই নেতা। এর আগে পাকিস্তানী শাসনের চব্বিশ বছরে বাঙালির সংগ্রামের সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু। তাঁর শেখ মুজিব থেকে শেখ সাহেব; শেখ সাহেব থেকে বঙ্গবন্ধু; বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে ওঠা মূলত: বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান বয়ান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি কে?

(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(গ) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক (ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

২। ছয় দফা কে উত্থাপন করেন?

(ক) শেরেবাংলা (খ) মওলানা ভাসানী

(গ) শহীদ সোহরাওয়ার্দী (ঘ) বঙ্গবন্ধু

৩। ১৯৭১ সালের কোন মাসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়?

(ক) জানুয়ারি (খ) ফেব্রুয়ারি

(গ) মার্চ (ঘ) এপ্রিল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আলীপুর গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধরনের লোকাচার লক্ষ্য করা যায়। আবদুল মালেক এসব লোকাচার অনুশীলনের বিরোধীতা করেন।

১। আবদুল মালেকের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ব্যক্তির সাথে মিল খুঁজে পান?

(ক) নবাব আবদুল লতিফ (খ) শহীদ তিতুমীর

(গ) হাজী শরীয়তুল্লাহ (ঘ) স্যার সলিমুল্লাহ

২। উদ্দীপক বর্ণিত ব্যক্তির আন্দোলনের ধরণ ছিল-

i. সামাজিক

ii. ধর্মীয়

iii. রাজনৈতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দেশে ফিরে আসেন-

i. ১৮৯৪ সালে

ii. বার-এট-ল ডিগ্রি লাভ করে

iii. ইটালি থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

শামসুল আলম একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। তিনি কৃষক দরদি ও শিক্ষানুরাগী। কৃষকের কল্যাণার্থে তিনি নানামুখী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পক্ষপাতী।

৪। উদ্দীপকে বর্ণিত শামসুল আলমের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মিল পাওয়া যায়?

(ক) নবাব আবদুল লতিফ (খ) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

(গ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৫। পাঠ্য বইয়ের ব্যক্তিত্বের কর্মকান্ডের ফলে তদানীন্তন ভারতবর্ষের কৃষকেরা-

i. জমিদারের কবল থেকে রক্ষা পায়

ii. বন্ধকি জমি ফিরে পায়

iii. রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে যেসব নির্দেশনা ছিল সেগুলো হলো-

i. স্বন্ধি স্থাপনের আহবান

ii. স্বাধীনতার সঙ্কেত

iii. শত্রু মোকাবেলার উপায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

(খ) সৃজনশীল রচনামূলক অংশ

১। দেলোয়ার হোসেন হজব্রত পালন শেষে ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে দেশে ফিরে এসে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কৃষকদেরকে ব্রিটিশ শাসক, জমিদার ও মহাজনদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলেন। সরকার তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তাঁকে প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়। তিনি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

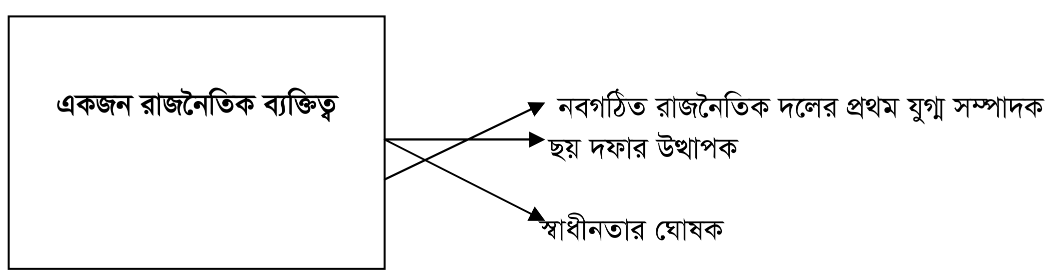
(ক) আজাদ হিন্দ ফৌজ কি?

(খ) ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

(গ) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয় কেন?

(ঘ) দেলোয়ার হোসেনের কার্যক্রমের সাথে উপমহাদেশের কোন ব্যক্তিত্বের কর্মকান্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

২। ছকটি লক্ষ্য করুন



ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কি?

খ. লাহোর প্রস্তাবের মূল কথা কি ছিল?

গ. উদ্দীপকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ ঃ ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯ ঃ ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০ ঃ ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

ইউনিট ৪

সংবিধান হল একটি রাষ্ট্রের দর্শন বা প্রতিচ্ছবি। উৎপত্তিগত অর্থে সংবিধান বলতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রতিষ্ঠা করাকে বোঝায়। একটি রাষ্ট্রের গঠন কাঠামো, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো সংবিধানে সুনির্দিষ্ট থাকে। সরকারের রূপ সংবিধান দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক দেশের সংবিধানই সমসামময়িক কালে সমাজে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি এবং প্রচলিত বিশ্বাসের ফলস্বরূপ। হাল ছাড়া যেমন নৌকা চলে না, তেমনি সংবিধান ব্যতীত রাষ্ট্র ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। তাই একটি রাষ্ট্রে সংবিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচ্য ইউনিটে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, সংবিধানের সংশোধনী ও সুশাসন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -১ : বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন
পাঠ -২ : ১৯৭২ সালের সংবিধান
পাঠ -৩ : রাষ্ট্রীয় মূলনীতি
পাঠ -৪ : মৌলিক অধিকার
পাঠ -৫ : সংবিধানের সংশোধনীসমূহ
পাঠ -৬ : বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

পাঠ-৪.১ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণপরিষদ, অধিবেশন, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, বিল, অনুমোদন, কার্যকর

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসে সদ্য

স্বাধীন দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের অস্থায়ী গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। এ গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে।

গণপরিষদ আদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। আদেশটি ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সাল থেকে কার্যকর হয়। এই আদেশ অনুসারে ডিসেম্বর, ১৯৭০ এবং জানুয়ারি, ১৯৭১ সালে নির্বাচিত প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য বলে বিবেচিত হয়। মৃত্যু এবং আইনে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার ফলে উভয় পরিষদ মিলে সর্বমোট ৪৬৯ জন সদস্যের স্থলে ৪০৪ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদের উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। গণপরিষদ তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করে।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন

১০ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আইন ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে কমিটি প্রথম বৈঠক করে। এই কমিটি সংবিধান সম্পর্কে মতামত লাভের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকগুলো বৈঠক করে। 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে ৯৮টি প্রস্তাব ও সুপারিশ পায়। ১০ জুন, ১৯৭২ সালে কমিটির শেষ বৈঠকে সংবিধানের প্রাথমিক খসড়াটি অনুমোদন করা হয়। ১১ জুন, ১৯৭২ সালে কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ১১ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে কমিটি সর্বশেষ আলাপ-আলোচনা করে এবং সেদিনই সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন

১২ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে খসড়া সংবিধানটি বিল আকারে পেশ করা হয়। গণপরিষদে বিলটির ওপর বক্তব্য দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'এই সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত।' তিনি আরো বলেন, 'এই সংবিধান দেশের সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে।' বিল উত্থাপনকালে আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেন, ''এই সংবিধান গণতান্ত্রিক উপায়ে এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় আইনের শাসন, জনগণের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।'

খসড়া সংধিানের চূড়ান্ত অনুমোদন

১৯ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধানের প্রথম পাঠ শুরু হয় এবং ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। অত:পর ৩১ অক্টোবর দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয় এবং ৩ নভেম্বর পর্যন্ত এ পাঠ চলে। ৪ নভেম্বর সংবিধানের ওপর তৃতীয় ও সর্বশেষ পাঠ শুরু হয়। ঐ দিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে গণপরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশের সংবিধানকে তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ করেন। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বলেন, ''একটি জাতি হিসেবে বাঙালিরা ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সংবিধান প্রণয়ন করল।'' গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত এ সংবিধান বিজয় দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সাল থেকে কার্যকর করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন ছিল যুগান্তরী পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বের অন্যতম ফসল স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান। এই সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন, স্বাধীনতা, সাম্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নয় বছরে পাকিস্তান প্রথম সংবিধান প্রণয়নে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে বিজয় অর্জনের মাত্র এক বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করে। এই সংবিধানে বাঙালি জাতির সকল আশা-আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশ সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন কখন?

(ক) ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ (খ) ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২

(গ) ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ (ঘ) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

২। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

(ক) ২৮ (খ) ৩০

(গ) ৩২ (ঘ) ৩৪

৩। অস্থায়ী গণপরিষদ আদেশ কে জারী করেন?

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) তাজউদ্দীন আহমেদ

(গ) ড. কামাল হোসেন (ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমদ

পাঠ-৪.২ ১৯৭২ সালের সংবিধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মৌলিক অধিকার, মূলনীতি, নাগরিকত্ব, সংবিধানের সার্বভৌমত্ব, সংসদীয় সরকার পদ্ধতি, জনগণের সার্বভৌমত্ব।

বাংলাদেশের জনগণ বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে স্বত:স্ফূর্ত সাড়া দেয় এবং বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বিজয় অর্জনের এক বছরের মধ্যেই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন, যা ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর কার্যকর হয়। নিম্নে ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল :

১. প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনা : বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগে ১নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারায় প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনা রয়েছে। এ প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা ''গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'' নামে পরিচিতি।

২. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি : ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৮(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি। যথা : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই নীতিসমূহ এবং তার সঙ্গে এই নীতিসমূহ হতে উদ্ভূত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত।

৩. মৌলিক অধিকার : সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নাগরিকদের জন্য কতকগুলো মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে। নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং অধিকারের পথ উন্মুক্ত করার জন্য প্রগতিশীল সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান ঘোষিত মৌলিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে; আইনের দৃষ্টিতে সমতা, সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, সাম্যের অধিকার, চলাফেরা, সভা-সমিতি, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা সম্পত্তির অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি।

৪. সংসদীয় সরকার পদ্ধতি : সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান। নিয়মতান্ত্রিক প্রধান থাকবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদ হবে দেশের প্রকৃত শাসক। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।

৫. লিখিত সংবিধান : বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত এবং গ্রন্থীত। সংবিধানের ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং একটি প্রস্তাবনাসহ ৭টি তফসিল রয়েছে। সংবিধানে সরকারের তিনটি বিভাগসহ গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী যেমন- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেলসহ অন্যান্যদের ক্ষমতা, কার্যাবলি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

৬. জনগণের সার্বভৌমত্ব : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের পক্ষে সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। সংবিধানে বলা হয়েছে, ''জনগণই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বা প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবে।''

৭. সংবিধানের সার্বভৌমত্ব : বাংলাদেশ সংবিধানে শাসনতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের বিধান রয়েছে। এখানে সংবিধান বা শাসনতন্ত্রই হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন যে কোন আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. নাগরিকত্ব : বাংলাদেশ সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবে।

৯. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত হচ্ছে 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট'। আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী অর্থাৎ প্রশাসনিক আদেশসমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে।

১০. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান : বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনগত দিক থেকে দুষ্পরিবর্তনীয়। অর্থাৎ এ সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না। তবে শর্তসাপেক্ষে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন করা যায়। এ জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি দরকার।

১১. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র : সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। বাংলাদেশে কোন প্রদেশ নেই। সে কারণে এখানে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্র থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা করে।

১২. মালিকানা নীতি : বাংলাদেশ সংবিধানে এ দেশের নাগরিকদের তিন ধরনের মালিকানা নীতি স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এগুলো হচ্ছে (i) রাষ্ট্রীয় মালিকানা (ii) সমবায়ী মালিকানা ও (iii) ব্যক্তিগত মালিকানা

১৩. এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা : বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'। এটি এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়।

১৪. সংবিধান সংশোধনীর বিধান : সংবিধানের যে কোনো ধারা সংশোধন বা বাতিল করার জন্য পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসূচক প্রস্তাব বা ভোট গ্রহণের বিধান সংবিধানে রয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা বা অংশগ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭২ সালের সংবিধান বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাকর। কেননা এ সংবিধানের মাধ্যমেই নাগরিকদের প্রকৃত স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭২ সালের সংবিধানে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব, সংগ্রাম, স্বাধীনতা এবং অধিকারগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে। এ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কার্যপরিধিসহ সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকরী হয় কখন?

(ক) ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ (খ) ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর
(গ) ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর (ঘ) ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর

২। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি?

(ক) ৪টি (খ) ৬টি
(গ) ৮টি (ঘ) ১০টি

৩। বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি?

(ক) কংগ্রেস (খ) পার্লামেন্ট
(গ) জাতীয় সংসদ (ঘ) লোকসভা

৪। বাংলাদেশের আইনসভার মোট সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) ৩০০　　(খ) ৩১৫

(গ) ৩৩০　　(ঘ) ৩৫০

৫। বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হল-

i.দুষ্পরিবর্তনীয়

ii.জনগণের সার্বভৌমত্ব

iii. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii　　(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii　　(ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৪.৩ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে আনীত পরিবর্তনসমূহ জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান, মূলনীতি, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক এক বছর পর, অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু প্রথম সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের আমলে সংবিধানের মূলনীতিতে অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রথম সংবিধানের মূলনীতিগুলো পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির উল্লেখ রয়েছে।

১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় অধ্যায়ের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো বর্ণিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি বিষয়কে রাষ্ট্রের স্তম্ভ বা মৌলিক আদর্শ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, উপরোক্ত চারটি নীতিসহ ২য় ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে গণ্য হবে। নিম্নে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

i. জাতীয়তাবাদ : ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। (অনুচ্ছেদ ৯)।

ii. সমাজতন্ত্র : মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হল রাষ্ট্রের লক্ষ্য। (অনুচ্ছেদ ১০)

iii. গণতন্ত্র : প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। (অনুচ্ছেদ ১১)

iv. ধর্মনিরপেক্ষতা : ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেওয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিপীড়নের অবসান। (অনুচ্ছেদ ১২)

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির শ্রেণিকরণ :

বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহকে চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। নিম্নে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির শ্রেণিকরণ করা হল -

১. অর্থনৈতিক সম্পর্কিত নীতিসমূহ : বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগের ১৩, ১৫, ১৬, ১৯ (২) এবং ২০ নং অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক সম্পর্কিত নীতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

   i. রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে সচেষ্ট হবে;

ii. নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে;
iii. গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করবে;
iv. রাষ্ট্র কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটাবে।
v. যোগ্যতা ও কর্ম অনুযায়ী প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবে।
vi. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
vii. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র তিন ধরনের মালিকানা যথা- রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

২. সামাজিক সম্পর্কিত নীতিসমূহ : বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগের ১৪, ১৫, ১৭ এবং ১৮নং অনুচ্ছেদে সামাজিক সম্পর্কিত নীতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

i. রাষ্ট্র জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করবে;
ii. আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্য হানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
iii. গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
iv. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।
v. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কার্যকর ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে।
vi. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. আইন ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতিসমূহ : বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগের ৯, ১০, ২২, ২৩ ও ২৪ নং অনুচ্ছেদে আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতির ব্যাখ্যা রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

i. রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
ii. জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প কলাসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
iii. রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নীতিসমূহ : বাংলাদেশ সংবিধানে ২৫ নং অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত নীতির উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

i. অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।
ii. আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করা
iii. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করা।
iv. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করা।
v. সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে আনীত পরিবর্তনসমূহ :

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির চারটি মূল স্তম্ভে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকান্ডের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা দখল করেন জিয়াউর রহমান। এই সামরিক শাসক ১৯৭৯

সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চারটি মূল স্তম্ভের তিনটিতে পরিবর্তন আনেন। সংশোধনী বা পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ-

১. জাতীয়তাবাদ : 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশি' জাতীয়তাবাদ করা হয়। তবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধরণ বা ভিত্তি কি হবে সংশোধনীতে তার কোনো উল্লেখ করা হয় নি।
২. সমাজতন্ত্র : সমাজতন্ত্রেও পরিবর্তন আনা হয়। এতে বলা হয় সমাজতন্ত্রের স্থানে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র।
৩. ধর্মনিরপেক্ষতা : সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয়। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপিত হয়।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২৯ আগস্ট, ২০০৫ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে। পরবর্তীতে আপিল বিভাগ ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ সালে হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রাখে। এই ধারাবাহিকতাতে ২০১১ সালের ২৫ জুন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভূক্তিকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ৮(২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ''এ নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাই নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।''

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কয়টি?
(ক) ২টি (খ) ৪টি
(গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

২। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ ছিল?
i. জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র
ii. গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা
iii দ্বিজাতি তত্ত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) I (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

৩। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ করে অবৈধ ঘোষণা করে?
ক) ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ খ) ১০ জুন, ২০১২
(গ) ৫ মার্চ, ২০১৫ (ঘ) ১০ জুলাই, ২০১৬

পাঠ-৪.৪ সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মৌলিক অধিকার বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশ সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মৌলিক অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, জবরদস্তি শ্রম, বাক স্বাধীনতা, ধর্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা।

মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার বলতে বোঝায়, রাষ্ট্র প্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধা যা নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। সংবিধানের সংশোধন কিংবা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা ছাড়া মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করা যায় না। সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকার কারণে এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। উত্তম সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে মৌলিক অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা। মৌলিক অধিকার নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

সুতরাং মৌলিক অধিকার হল নাগরিক জীবনের ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য শর্ত, ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ যা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত থাকে, সরকার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে না।

বাংলাদেশ সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহ

আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার অন্তর্ভূক্ত থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ নং অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশ সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহ তুলে ধরা হল-

১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা : সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী। [অনুচ্ছেদ-২৭]

২. নানান কারণে বৈষম্য : ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ-২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩)]

৩. সরকারি নিয়োগলাভের সুযোগের সমতা : প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না। কিংবা সে ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ- ২৯(১), ২৯ (২)]

৪. বিদেশি খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ : রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করবে না। [অনুচ্ছেদ-৩০]

৫. আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার : আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত: আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। [অনুচ্ছে-৩১]

৬. জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ : আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ-৩২]।

৭. গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ : গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা যাবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁর মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শের ও তাঁর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না। গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হাজির করা হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাকে অতিরিক্ত সময় প্রহরায় আটক রাখা যাবে না। [অনুচ্ছেদ- ৩৩(১), ৩৩(২), ৩৩(৩ক)]

৮. জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ : সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ। এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হলে তা আইনত: দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। তবে ফৌজদারি অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না। [অনুচ্ছেদ-৩৪(১), ৩৪(২ ক)]

৯. বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ : এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাবে না। ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অদিকারী হবে। কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাবে না। [অনুচ্ছেদ- ৩৫(১), ৩৫ (২), ৩৫ (৩), ৩৫ (৪), ৩৫ (৫)]

১০. চলাফেরার স্বাধীনতা : জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থান এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুন:প্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। [অনচ্ছেদ- ৩৬]

১১. সমাবেশের স্বাধীনতা : জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। [অনুচ্ছেদ- ৩৭]

১২. সংগঠনের স্বাধীনতা : জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। [অনু-৩৮]

১৩. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা : বাংলাদেশ সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অন্যান্য আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হয়। [অনুচ্ছেদ- ৩৯(১), ৩৯ ২ক), ৩৯ ২খ)]

১৪. পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা : আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকবে। [অনুচ্ছেদ- ৪০]

১৫. ধর্মীয় স্বাধীনতা : আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হলে তাঁকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসানায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে হবে না। [অনুচ্ছেদ- ৪১(১), ৪১(২), ৪১(১ক), ৪১(১খ)

১৬. সম্পত্তির অধিকার : আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ- ৪২(১)

১৭. গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ : রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা

লাভের অধিকার থাকবে এবং চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তারক্ষার অধিকার থাকবে। [অনুচ্ছেদ ৪৩, ৪৩(ক), ৪৩(খ)]

১৮. মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ : বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ- ৪৪(১)]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ সংবিধানে যে সকল মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে তা নাগরিকের জন্য কল্যাণকামী এবং যুগোপযোগী। সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে দায় মুক্তির বিধান এবং কতিপয় আইনের হেফাজতের কথাও সন্নিবেশিত রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

মৌলিক অধিকার হলো এমন কিছু অধিকার যা কোনো দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক সরকার তার শাসনতান্ত্রিক উৎকর্ষ বিকাশের জন্য মৌলিক অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। বস্তুত বর্তমান আধুনিক বিশ্বে শাসক শ্রেণির সফলতা নির্ণয়ের অন্যতম মাপকাঠি হলো তাঁরা জনগণকে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা কতটুকু দিতে পেরেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধানের কোন ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত?

(ক) ১ম ভাগ (খ) ২য় ভাগ
(গ) ৩য় ভাগ (ঘ) ৪র্থ ভাগ

২। ‘আইনের দৃষ্টিতে সমতা’ সংবিধানে কত নাম্বার অনুচ্ছেদে রয়েছে?

(ক) ২৪ নং (খ) ২৫ নং
(গ) ২৬ নং (ঘ) ২৭ নং

৩। মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য হলো-

i. নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্যে অপরিহার্য শর্ত
ii. সংবিধান হতে প্রাপ্ত
iii. আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৪.৫ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংবিধানের সংশোধনীসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান সংশোধন, জরুরি অবস্থা, সামরিক শাসক, গণতন্ত্র, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা।

সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজনে জনগণের কল্যাণার্থে সংবিধানের সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের দশম ভাগে ১৪২ নং অনুচ্ছেদে এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতির কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে বাংলাদেশে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী প্রেসিডেন্টরা নিজেদের স্বার্থের সংবিধান সংশোধন করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধান জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল-

১. প্রথম সংশোধনী : প্রথম সংশোধনীর শিরোনাম হচ্ছে সংবিধান [প্রথম সংশোধন] আইন, ১৯৭৩। বিলটি সংসদে পাশ হয় ১৫ জুলাই, ১৯৭৩। প্রথম সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু ছিল 'গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনে অন্যান্য অপরাধ' এর বিচার ও শাস্তি অনুমোদন।

২. দ্বিতীয় সংশোধনী : দ্বিতীয় সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [দ্বিতীয় সংশোধন] আইন, ১৯৭৩। সংসদে বিল পাশের তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। দ্বিতীয় সংশোধনীর দ্বারা জরুরি অবস্থাকালীন নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়।

৩. তৃতীয় সংশোধনী : তৃতীয় সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [তৃতীয় সংশোধন] আইন, ১৯৭৪। সংসদে পাশের তারিখ ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৪। তৃতীয় সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় ও সীমান্ত রেখা সংক্রান্ত একটি চুক্তি কার্যকর করা।

৪. চতুর্থ সংশোধনী : চতুর্থ সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [চতুর্থ সংশোধন] আইন, ১৯৭৫। সংসদে পাশের তারিখ ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫। চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন পদ্ধতি এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন করা হয়।

৫. পঞ্চম সংশোধনী : পঞ্চম সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [পঞ্চম সংশোধন] আইন, ১৯৭৯। বিলটি সংসদে পাশের তারিখ ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯। পঞ্চম সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা থেকে শুরু করে ৫ এপ্রিল, ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডের বৈধতা দান।

৬. ষষ্ঠ সংশোধনী : ষষ্ঠ সংশোধনীর শিরোনাম ছিল সংবিধান [ষষ্ঠ সংশোধন] আইন, ১৯৮১। বিলটি সংসদে পাশ হয় ৮ জুলাই, ১৯৮১। ষষ্ঠ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল উপ-রাষ্ট্রপতির পদে থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিত করা।

৭. সপ্তম সংশোধনী : সপ্তম সংশোধনীর শিরোনাম হচ্ছে সংবিধান [সপ্তম সংশোধন] আইন, ১৯৮৬। বিলটি সংসদে পাশ হয় ১১ নভেম্বর, ১৯৮৬। সপ্তম সংশোধনীর বিষয়বস্তু ২৪ মার্চ, ১৯৮২ থেকে ১১ নভেম্বর, ১৯৮৬ পর্যন্ত সামরিক শাসকের অধীনে যে সকল আদেশ জারি হয় তা বৈধতা দান।

৮. অষ্টম সংশোধনী : অষ্টম সংশোধনীর শিরোনাম ছিল সংবিধান [আষ্টম সংশোধন] আইন, ১৯৮৮। বিলটি সংসদে পাশ হয় ৭ জুন, ১৯৮৮। অষ্টম সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা। এ ছাড়া ঢাকার ইংরেজি বানান Dacca থেকে Dhaka এবং Bengali এর নাম Bangla করা হয়।

৯. নবম সংশোধনী : নবম সংশোধনীর শিরোনাম ছিল সংবিধান [নবম সংশোধন] আইন, ১৯৮৯। এই সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ এক ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ পরপর দুই মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও প্রয়োজন হলে জাতীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগের বিধান করা হয়।

১০. দশম সংশোধনী: দশম সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [দশম সংশোধন] আইন, ১৯৯০। বিলটি সংসদে পাশ হয় ১২ জুন, ১৯৯০। দশম সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল- সংসদে নারীদের জন্য পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণ করা।

১১. একাদশ সংশোধনী : একাদশ সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [একাদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯১। বিলটি সংসদে পাশ হয় ৬ আগস্ট, ১৯৯১। একাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের পূর্ববর্তী পদে ফিরে যাবার বিধান।

১২. দ্বাদশ সংশোধনী: দ্বাদশ সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [দ্বাদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯১। বিলটি সংসদে পাশ হয় ৬ আগস্ট, ১৯৯১। দ্বাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পুন:প্রবর্তন।

১৩. ত্রয়োদশ সংশোধনী: ত্রয়োদশ সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [ত্রয়োদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯৬। সংসদে বিলটি পাশ হয় ২৭ মার্চ, ১৯৯৬। ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৪. চতুর্দশ সংশোধনী: এ সংশোধনীর শিরোনাম [চতুর্দশ সংশোধন] আইন, ২০০৪। বিলটি সংসদে পাশ হয় ১৬ মে, ২০০৪। চতুর্দশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ৪৫টি নারী আসন সংরক্ষণ। এছাড়াও এই সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারি অফিস সহ অন্যান্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিধান করা হয়।

১৫. পঞ্চদশ সংশোধনী: পঞ্চদশ সংশোধনীর শিরোনাম ছিল সংবিধান [পঞ্চদশ সংশোধন] আইন, ২০১১। বিলটি সংসদে পাশ হয় ৩০ জুন, ২০১১। পঞ্চদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল।

১৬. ষোড়শ সংশোধনী : ষোড়শ সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [ষোড়শ সংশোধন] আইন, ২০১৪। বিলটি সাংসদে পাশ হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪। ষোড়শ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া।

বাংলাদেশের সংবিধান এখন পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে। এর মধ্যে একাধিক সংশোধনী হয়েছে অবৈধ ক্ষমতা দখলদারদের আমলে। ভবিষ্যতে হয়তো সংবিধানের আরো সংশোধনী হতে পারে। তবে তা অবশ্যই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধান এখন পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সরকার ও অবৈধ ক্ষমতা দখলদারদের দ্বারা ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে। জাতীয় প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধনী একটি স্বাভাবিকতা। কিন্তু এই পরিবর্তন কোনভাবেই ক্ষমতা দখলের বৈধতা দান কিংবা কোন দলের ক্ষমতা কুক্ষীগত করণের স্বার্থে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধান এ পর্যন্ত কত বার সংশোধন করা হয়েছে?

(ক) ১৪ (খ) ১৫

(গ) ১৬ (ঘ) ১৭

২। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কবে গৃহীত হয়?

(ক) ১৯৭২ সাল (খ) ১৯৭৩ সাল

(গ) ১৯৭৪ সাল (ঘ) ১৯৭৪ সাল

৩। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু কি ছিল?

(ক) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তন (খ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার

(গ) রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম (ঘ) বহুদলীয় গণতন্ত্র

৪। পঞ্চদশ সংশোধনীর মূল বৈশিষ্ট্য হল-

(ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন (খ) রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন

(গ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তন (ঘ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তিকরণ

পাঠ-৪.৬ বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান সংশোধন, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, জাতীয় সংসদ, রাষ্ট্রপতির সম্মতি, সংসদ কর্তৃক গ্রহণ।

সময়ের প্রয়োজনে যে কোন দেশের সংবিধানের পরিবর্তন ও সংশোধন আবশ্যক হয়ে যেতে পারে। তাই প্রায় প্রত্যেক দেশেই সংবিধান সংশোধনীর বিধান থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংবিধান এ যাবৎ ১৬ বার সংশোধন হয়েছে। কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পবির্তনীয় সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত। এ সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সংবিধান সংশোধনীর জন্য অন্তত দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হয়। সংবিধানের দশম ভাগে ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদ আইন দ্বারা সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন বা রহিত করার ক্ষমতা রাখে। তবে এ জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো মেনে চলতে হয়।

১. শিরোনাম/বিষয় নির্ধারণ : সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের শিরোনামে, এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হবে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ- ১৪২(ক)]
২. সংসদ কর্তৃক গ্রহণ : সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে না। [অনুচ্ছেদ- ১৪২(খ)]
৩. উপরোক্ত নিয়মে কোন বিল গৃহীত হবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হলে, উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিকে সম্মতিদান করবেন, এবং তিনি সম্মতিদানে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে। [অনু: ১৪২(গ)]

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংবিধানের সংশোধন অনেক সময় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই সংবিধান প্রণয়নের সময়ই বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র তা সংশোধনের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানেও এর ব্যতয় ঘটেনি। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন একটি জটিল প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে সংবিধান-সংশোধন পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে?

ক) ১৩৭ খ) ১২৯
গ) ৫৭ ঘ) ১৪২

২। কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশের সংবিধান কোন প্রকৃতির?

ক) সুপরিবর্তনীয় খ) অলিখিত

গ) দুষ্পরিবর্তনীয় ঘ) কোনটি নয়

৩। বাংলাদেশের সংবিধান মোট কতবার সংশোধিত হয়েছে?

ক) ১৫ খ) ১৬

গ) ১৪ ঘ) ১২

৪। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের নূন্যতম কত সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়?

ক) এক-তৃতীয়াংশ খ) দুই-তৃতীয়াংশ

গ) এক-চতুর্থাংশ ঘ) এক-পঞ্চমাংশ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সকল ধর্মাবলম্বীদের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার কথা কোথায় বলা হয়েছে?

(ক) ছয় দফা (খ) সংবিধান

(গ) সামরিক ফরমান (ঘ) গোপন নথি

২। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ করা হয়েছে কোন সংশোধনীতে?

(ক) চতুর্থ সংশোধনী (খ) দ্বাদশ সংশোধনী

(গ) চতুর্দশ সংশোধনী (ঘ) ষোড়শ সংশোধনী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাসে মুনিরা জাহান ম্যাডাম বললেন, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গঠন কাঠামো ও কর্ম পরিসর জটিল ও ব্যাপক। এ কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল ও নীতিগুলো সুস্পষ্ট ও লিখিত হওয়া আবশ্যক। একজন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে বলল, ম্যাডাম বাংলাদেশে কি এর রকম লিখিত সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে যা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। ম্যাডাম বললেন, হ্যাঁ।

৩। বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়-

(ক) গণপরিষদের মাধ্যমে (খ) ডিক্রি জারির মাধ্যমে

(গ) প্রথার ভিত্তিতে (ঘ) নির্বাহী আদেশে

৪। বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হল-

i. গণতন্ত্র

ii. বাঙালি জাতীয়তাবাদ

iii. ধর্ম নিরপেক্ষতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ নং ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

গীতি ‘ক’ নামক একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে সে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। আর এ সুবিধাগুলো তাকে ব্যক্তিত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

৫। উদ্দীপকে গীতি রাষ্ট্র কর্তৃক যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তা কোন অধিকারের অন্তর্ভূক্ত?

(ক) ব্যক্তিগত অধিকার (খ) মৌলিক অধিকার

(গ) সামাজিক অধিকার (ঘ) রাজনৈতিক অধিকার

৬। বাক স্বাধীনতা, সমাবেশ করার মত অধিকার ক্ষুন্ন করা যায় না-

i. সরকারের ইচ্ছা ছাড়া

ii. সংবিধান সংশোধন ছাড়া

iii. জরুরি অবস্থা জারি ছাড়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

৭। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না-

i. টাকা-পয়সা

ii. সাহায্য-সহযোগিতা

iii. উপাধি, ভূষণ বা সম্মান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) iii (ঘ) ii ও iii

৮। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি?

(ক) ৩ (খ) ৪

(গ) ৫ (ঘ) ৬

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সংবিধান রাষ্ট্রের দর্শন স্বরূপ। আদর্শ পরিস্থিতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এতে সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক করা হয় এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে উঠেন এবং আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক) সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে?

খ) ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে কী বুঝায়?

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি সংবিধানের কততম সংশোধনী এবং তা কোন ধরণের শাসন ব্যবস্থা চালু করে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) ''দ্বাদশ সংশোধনীটি বাংলাদেশের সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে''- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

২। আসিফ ও আমির দুই ভিন্ন দেশের নাগরিক। চাকুরির কারণে তারা কানাডায় বাস করে। আরিফ আমিরের দেশের সংবিধান পাঠ করে জানতে পারে যে আমিরের দেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। উক্ত সংবিধানে আইনসভার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে শাসন বিভাগকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হয়েছে। তবে আমিরের দেশের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয় নাই।

ক) বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ কয়টি?

খ) মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়?

গ) আমিরের দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের যে মিল পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) বাংলাদেশের সংবিধান কোন অর্থে আমিরের দেশের সংবিধান থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য? বিশ্লেষণ করুন।

৩। একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন মৌলিক দলিল। 'ক' রাষ্ট্রটি স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে উক্ত দলিলটি রচনা করে। দলিলটিতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়াদি উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিলটি জাতীয় প্রয়োজনে কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে।

ক) বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়?

খ) বাংলাদেশ সংবিধানের যে কোন একটি মূলনীতি ব্যাখ্যা করুন।

গ) উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্র বলতে কোন রাষ্ট্রের ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিলের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) উদ্দীপকে উক্ত রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিল সংশোধনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ ঃ ১। গ ১। ঘ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। খ ৪। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ ৬। খ ৭। গ

বাংলাদেশের সরকার ও শাসন কাঠামো

ইউনিট ৫

সরকার রাষ্ট্রের কান্ডারী স্বরূপ। সরকারের প্রকৃতির উপরই রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মুক্তির এ সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থাও জনগণের দ্বারা পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক, এককেন্দ্রিক ও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার রাষ্ট্র, যার সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ, জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে সরকার কাঠামো কেন্দ্রিয় ও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে সরকার প্রধানত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সেগুলি হলো আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র কার্যক্রম রয়েছে। এ ইউনিটে বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ, সরকারের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, কেন্দ্রিয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-১: বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ	পাঠ-৮: বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন
পাঠ-২: আইনসভা: জাতীয় সংসদ	পাঠ-৯: বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো
পাঠ-৩: জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি	পাঠ-১০: কেন্দ্রীয় প্রশাসন
পাঠ-৪: শাসন বিভাগের গঠন ও জবাবদিহিতা	পাঠ-১১: সচিবালয়: গঠন ও কার্যাবলি
পাঠ-৫: রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি	পাঠ-১২: বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
পাঠ-৬: প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি	পাঠ-১৩: স্থানীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক
পাঠ-৭: বিচার বিভাগ	

পাঠ-৫.১ বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ সরকারের ধরণ বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শাসন ব্যবস্থা, কাঠামো, বিভাগ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য, মন্ত্রিসভা, পরামর্শ, সংবিধান

সরকার যে কোন দেশের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। সরকারকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মূলত: রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয় সরকারের মাধ্যমে। আর এ কারণে সরকার ব্যতিত একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্র গঠিত হয় চারটি মূল উপাদানের সমন্বয়ে যেমন, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, জনগণ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এই চারটি উপাদানের একটি ব্যতিত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। তবে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে সরকারের কাঠামো ও কার্য প্রণালীই একে গুরুত্ববহ করে তোলে। এ কারণে সরকারকে কখনো কখনো দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক বলে আখ্যা দেয়া হয়। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কাঠামো ও কার্যগতভাবে কতগুলো বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক ও সংসদীয় কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এই সরকার কাঠামোয় একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারই রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল সূতিকাগার হিসেবে আইন প্রণয়ন,বাস্তবায়ন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকা পালন করবে। সরকারের তিনটি অঙ্গ- আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। প্রতিটি অঙ্গ 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য' নীতির মাধ্যমে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কার্যকরি। একটি বিভাগ কখনও অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার কাঠামো

আইন বিভাগ   শাসন বিভাগ   বিচার বিভাগ

সংসদীয় সরকার কাঠামোর নিয়ম মেনে বাংলাদেশে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংসদকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী শাসন বিভাগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হল রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। এই সরকার ব্যবস্থায় একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ৫৫-র ৩ অনুসারে মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে; কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদেরও প্রধান। মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে দায়দায়িত্ব বন্টন করেন প্রধানমন্ত্রী। সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী সরকার ব্যবস্থার প্রধান নীতিনির্ধারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে আইন বাস্তবায়নগত সকল ক্ষমতা শাসন বিভাগের এখতিয়ারে। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ এর ব্যাপ্তি সমুন্নত রেখেছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ থেকে একেবারে তৃণমূল পযায় পর্যন্ত। এ কারণে সরকারের এই বিভাগটির মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সকল স্তরে আইন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

আইন বিভাগ

বাংলাদেশ সরকারের আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করার অধিকার রাখে, যা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতি গৃহীত হওয়ার দরুণ আইনসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের হাতেই নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। সরকার কর্তৃক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করার ক্ষমতা মহান সংসদের হাতে থাকার কারণে বাংলাদেশে সংসদের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হল-আইন ও শাসন প্রণয়নগত সকল বিষয়ে সংসদ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালাই প্রযোজ্য হবে এবং তা শাসন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। এর ব্যতয় হওয়া সাংবিধানিকভাবে আইন লংঘনের শামিল।

বিচার বিভাগ

বাংলাদেশের সরকার কাঠামোতে বিচার বিভাগ সরকারের সকল প্রকার বিচারিক কার্য সম্পাদন করে থাকে। বিচারিক কার্যের অংশ হিসেবে এই বিভাগটি মূলত: সংবিধান ও আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে থাকে ও জনগণের অধিকার রক্ষা করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে থাকে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে আইনের শাসন

প্রতিষ্ঠার বিষয়টি দেশের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। সেদিক থেকে বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি সংবিধান কর্তৃক রীতিসিদ্ধ। এ ছাড়া সংবিধান সমুন্নত রেখে বিচার বিভাগ তার বিচারিক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে।

উপরিউল্লিখিত সরকারের তিনটি বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা দান, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি নিশ্চিতকরণসহ সকল প্রকার জনকল্যাণমূলক কার্যাদি করে থাকে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের অধিকার সংবিধান কর্তৃক প্রণীত। বাংলাদেশের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারই সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ সরকারের কাঠামো চিত্রায়িত করুন।

সারসংক্ষেপ

সরকার যেকোন শাসন ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে সরকারের ভূমিকা অপরিসীম। এ দেশের সরকার ব্যবস্থা চালিত হয় তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে। এগুলি হলঃ আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এই তিনটি বিভাগের কার্যাবলির ওপর সরকারের সফলতা নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা দান, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি নিশ্চিত করে থাকে সরকার। এছাড়াও অন্যান্য অনেক কার্যাদি সম্পাদনেও সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের বিভাগ কোনটি?

i. নির্বাচন কমিশন
ii. শাসন বিভাগ
iii. আইন বিভাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i. (খ) i. ও ii. (গ) ii. ও iii. (ঘ) কোনটি নয়

২। বাংলাদেশ সরকারের নির্বাহী প্রধান একই সাথে-

i. সংসদ নেতা
ii. মন্ত্রিপরিষদ প্রধান
iii. স্পীকার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i. (খ) i. ও ii. (গ) ii. ও iii. (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৫.২ আইন সভা : জাতীয় সংসদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইন সভা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জাতীয় সংসদের গঠন জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন প্রণয়ন, সংবিধান, কক্ষ, ফোরাম, সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিল, সম্মতি, রাষ্ট্রপ্রতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, সংসদ সদস্য

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান একটি অঙ্গ হিসেবে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা আইনসভায় সংসদীয় প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা হয় ও আইন বাস্তবায়নের পথ নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম ভাগে উল্লিখিত আইনানুসারে বাংলাদেশের আইনসভা হিসেবে জাতীয় সংসদকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন থেকে শুরু করে সকল প্রয়োজনীয় আইন এই জাতীয় সংসদই প্রণয়ন করে থাকে। এদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু থাকায় সংসদই শাসন বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী যেমন- রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার জন্য এই জাতীয় সংসদ হল সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

জাতীয় সংসদের বিবরণ

আইন অনুসারে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ হল এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত ৫০ জন নারী সংসদ সদস্য নিয়ে এই জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। পূর্ণ মেয়াদে প্রতি পাঁচ বছর পর পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রত্যেক বয়স্কপ্রাপ্ত নাগরিক তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকে। আর প্রচলিত আইন মেনে বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এই সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর বয়স ৩৫ বছর হতে হবে। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ২৫ বছর হওয়ার শর্ত দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। জাতীয় সংসদে কোন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংসদ সদস্যগণের মতামত গৃহীত হয়। মূলত: জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের সম্মুখে সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক তুমুল আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে কোন আইন সংসদে পাশ হয়। তবে আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনের জন্য যথাক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সম্মতি থাকতে হয়। এরপর সরকার প্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পরিশেষে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির লিখিত সম্মতির মধ্য দিয়ে একটি আইনকে কার্যকরি রূপ প্রদান করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের আইন সভার নাম কী? এর গঠন বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আইন সভা মূলত: আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি বিশেষ করে সংবিধান প্রণয়ন করে থাকে। এ কারণে আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইন কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না। যে কারণে বর্তমানকালে বাংলাদেশের আইন সভার কার্যাবলি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন সভা সার্বভৌম হওয়ার কারণে সরকারের অন্য দুটি অঙ্গ সংগঠন থেকে আইন সভা বেশি গুরুত্ব বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে সংবিধানের কোন বিভাগে?

(ক) দ্বিতীয় (খ) তৃতীয়

(গ) চতুর্থ (ঘ) পঞ্চম

২। জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কতটি আসন সংরক্ষিত রয়েছে?

(ক) ৪০ (খ) ৫০

(গ) ৬০ (ঘ) ৭০

পাঠ-৫.৩ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতা জানতে পারবেন।
- জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাচিত, সংবিধান, মৌলিক নীতি, অধিবেশন, স্পীকার, বিল, চূড়ান্ত ব্যাখ্যা।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে বিস্তৃত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চমভাগে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত ৫০ জন নারী সংসদ সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। এই সংসদের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

জাতীয় সংসদের কার্যাবলি

বাংলাদেশের আইনসভার কার্যাবলিসমূহ সংবিধান কতৃক স্বীকৃত। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল–

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি : আইন প্রণয়ন করার কাজটি আইন সভার প্রধান কাজ। বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন বিভাগ এই কাজটি করে থাকে। এই বিভাগটি নতুন আইন প্রণয়ন ও পুরাতন আইন বাতিলের ক্ষমতা রাখে। বাংলাদেশের আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারাই শাসন বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করে ও বিচার বিভাগ তার বিচারিক কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। মূলত: আইনের উৎস হিসেবে এই বিভাগটি তার প্রাধান্য শাসন ব্যবস্থায় সমুন্নত রাখে।

সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন : বাংলাদেশের আইন সভা সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। দেশের সংবিধান উল্লিখিত দুইটি ক্ষমতাই আইন সভাকে প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে আইন সভা সংবিধান সংশোধনকল্পে বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ ও প্রয়োজনে গণভোটের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি : প্রয়োজনের নিরীখে কখনও বাংলাদেশের আইন সভা বিচার সম্পর্কিত কার্যাদিও সম্পাদন করে থাকে। এমনকি রাষ্ট্রপতিও যদি কোন গুরুতর অসদাচরণ করেন তাহলে সংবিধানের ৫২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ তাঁর অভিশংসন অর্থাৎ বিচারিক কাজটি করতে পারবে। আইনসভার সদস্য ও অন্যান্য নির্বাচিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন বিভাগ সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে কাজ করে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারেও বাংলাদেশের আইনসভা ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যাবলি : তত্ত্বগতভাবে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণকল্পে অর্থাৎ শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে আইন বিভাগ ভূমিকা পালন করে। তবে রাষ্ট্রভেদে তা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করতে দেখা যায়। বাংলাদেশের আইন সভা সার্বভৌম হওয়ার দরুণ আইন বিভাগের এ ধরনের ভূমিকা রাখার কথা থাকলেও, ভারসাম্যপূর্ণ শাসন ও প্রশাসনের তাগিদে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকে। তবে আইন সভা কর্তৃক প্রণীত সাংবিধানিক আইন নির্বাহী বা শাসন বিভাগ মেনে চলতে বাধ্য থাকে। আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইন অমান্য করার অর্থ হল সংবিধানকে অগ্রাহ্য করা।

অর্থ-সংক্রান্ত কার্যাবলি : বাংলাদেশের আইন সভা নানাবিধ অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। বিশেষ করে অর্থের অপচয় রোধে আইন সভা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির চর্চা করে তা নিয়ন্ত্রণ করে। বাজেট পেশসহ সরকারি আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা, পরবর্তী বছরের ব্যয় বরাদ্দের কাজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যকর করে তোলে। বাংলাদেশের আইন সভার অনুমতি ছাড়া কর ধার্য বা পুরাতন কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সম্ভব হয় না।

শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি : বাংলাদেশের আইন সভা বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগসহ বিভিন্ন সন্ধি বা চুক্তি অনুমোদন করা, যুদ্ধ ঘোষণা প্রভৃতি শাসন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে।

নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাবলি : বাংলাদেশের আইন সভা নির্বাচন সংক্রান্ত কতকগুলো কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেমন, আইন সভার সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

প্রতিনিধিত্বশীল কার্যাবলি :
আইন সভার সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকার জনগণের সমস্যাবলী সম্পর্কে আইন সভায় আলোচনা করে এবং এসব পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে আইন সভা আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।
এ সকল কার্যাবলি ছাড়া বাংলাদেশের আইনসভা তদন্ত, বিচারকদের গুরুতর অসদাচরণের বিচারিক কাজ, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনাসহ আরও বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।
বাংলাদেশের আইন সভার পরোক্ষ কার্যাবলিগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতির বৈধকরণ, অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক মতৈক্য সৃষ্টি, দল ও জাতিসমূহের মধ্যকার বিরোধ দূরীকরণ, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ইত্যাদি নানাবিধ কাজ ও আইনসভা করে থাকে।

বাংলাদেশের আইন সভার কার্যাবলি আলোচনার পর এ কথা বলা যায় যে, আইন সভা সার্বভৌম হওয়ার কারণে এর কার্যাবলি ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর তাই আইন সভা অন্য যেকোন দুইটি বিভাগ থেকে গুরুত্বের বিচারে কার্যত এগিয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের আইনসভার পাঁচটি কাজ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আইন সভাকে জাতীয় সংসদ বলে আখ্যা দেয়া হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ মূলতঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংসদীয় গণতন্ত্রের মৌলনীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রধান নির্বাহী। জাতীয় সংসদের কার্যাবলি সংবিধান প্রণীত নীতি অনুযায়ী সংঘটিত হয়। আইন প্রণয়ন হলো জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ। এছাড়া জাতীয় সংসদ আইন ও শাসন সংক্রান্ত নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে সরকার পরিচালনায় ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রত্যেক সরকারেরই আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের জন্য একটি বিভাগ থাকে। এ বিভাগের সদস্যগণ আবার শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশও বটে। এ বিভাগটি হল-

i. জাতীয় সংসদ
ii. আইন বিভাগ
iii. আইন পরিষদ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i. (খ) i. ও iii. (গ) ii. ও iii. (ঘ) সবকটি

২। কোনটি আইন বিভাগের প্রধান কাজ নয়?

(ক) আইন প্রণয়ন (খ) বিচার সংক্রান্ত
(গ) আইন সংশোধন (ঘ) জবাবদিহিতা

পাঠ-৫.৪ শাসন বিভাগের গঠন ও জবাবদিহিতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শাসন বিভাগের গঠন-কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অঙ্গ, সংসদীয়, নামমাত্র, নির্বাহী প্রধান, কার্যবন্টন, জবাবদিহিতা

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সরকারের যে তিনটি অঙ্গ **সংগঠনে**র ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে নির্বাহী বিভাগ অন্যতম শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কেননা, রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদ দুটি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এই নির্বাহী বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থভাগে নির্বাহী বিভাগ অর্থাৎ শাসন বিভাগের গঠন ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত সাংবিধানিক আইন লিপিবদ্ধ আছে।

শাসন বিভাগের কাঠামো

রাষ্ট্রপতি : শাসন বিভাগের কার্যক্রম মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে সম্পন্ন হয়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু থাকায় রাষ্ট্রপতি প্রকৃত অর্থে নামমাত্র শাসক। রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে। তবে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা। এই সংসদই যে কোন বড় ধরনের ব্যর্থতার জন্য রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। রাষ্ট্রপতি মূলতঃ অলঙ্কারিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সংসদীয় প্রথা অনুযায়ী তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ :

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে যে নির্বাহীর উদ্ভব ঘটে তা হল সংসদীয় নির্বাহী। এখানে প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা সংবিধানভূক্ত হয়। এই ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ও অনুমোদিত না হলে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, সরকার প্রধান হিসেবে বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাহী ক্ষমতা মূলত: প্রধানমন্ত্রীর ওপরই ন্যস্ত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের প্রধান থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ তার সকল কর্মকান্ডের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। কেননা, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদ নেতা।

অ্যাটর্নি জেনারেল :

অ্যাটর্নি জেনারেল নির্বাহী বিভাগের বা সরকারের পক্ষে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারিক কর্মকান্ডে প্রধান কুশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন :

দেশের সকল প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন নির্বাহী বিভাগের অধীনে থাকে। মূলত: নির্বাহী আদেশ বলে আইনের বাস্তবায়ন করাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা

বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় আইন সভা বা জাতীয় সংসদের ভূমিকা ও কার্যাবলি বিস্তৃত হয়েছে। আর এ কারণে জাতীয় সংসদ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আইন সভায় মূলত: জাতীয় সংসদের সদস্যরাই উপস্থিত থাকে এবং তাদের নিয়েই সরকার গঠিত হয়। শাসন বিভাগের আইন বাস্তবায়নকারী অংশ অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনের কাজ করে থাকে। এ কারণে তিনি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন হয়ে থাকেন। তবে বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫ (৩) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট

দায়ী থাকে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দকে শাসন বিভাগের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। জবাবদিহিতার এই বিষয়টি বিদ্যমান থাকায় সরকারকে সদা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে হয়। অনেকক্ষেত্রে, সরকারের ভুল-ক্রটি শুধরে দিতেও জাতীয় সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা হল বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ অন্যান্য কর্মকতারা তাঁদের ওপর অর্পিত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করছেন কিনা সে ব্যাপারে সংসদ বা আইন সভায় অবহিত করা। মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত কার্যক্রম যদি জনগণের প্রতিকূলে যায়, সেক্ষেত্রে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জাতীয় সংসদ করে থাকে। এছাড়া শাসন বিভাগকে সদা সতর্ক রাখার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে শাসন বিভাগকে জবাবদিহি করে থাকে। সংসদ কখনও প্রশ্ন উত্থাপন করে মন্ত্রীদের কার্যাবলির হিসাব নিয়ে থাকে। শাসন বিভাগ কর্তৃক আয় ও ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ করে ও নির্দেশনা দিয়ে আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এভাবে জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।

কখনও বা সংসদ একাধারে মূলতবি বা নিন্দা প্রস্তাব এনে শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা করে শাসন বিভাগ তথা সরকারের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা করে থাকে। এসব আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা শাসন বিভাগ পরবর্তী কার্যাবলি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে থাকে। জাতীয় সংসদে গঠিত স্থায়ী কমিটিগুলো মন্ত্রণালয় বা শাসন বিভাগের ওপর অর্পিত নির্ধারিত কার্যসমূহের ব্যাপারে সুপারিশ প্রদান করে শাসন বিভাগকে কার্যকরি জবাবদিহিতামূলক করে তোলে। এছাড়া সংসদ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর নীতির মাধ্যমে শাসন বিভাগকে জবাবদিহি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে; কিন্তু বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদের কারণে বাংলাদেশ সংসদ সে কাজটি করতে পারে না। বস্তুত: সংসদ কর্তৃক শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতিই হল শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ করে সংবিধান প্রণীত আইন শাসন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শাসন বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এই বিভাগ ক্ষমতার দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী। শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিস্তর। তবে শাসন বিভাগও জবাবদিহিতার বাইরে নয়। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দকে শাসন বিভাগের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। জবাবদিহিতার এই বিষয়টি বিদ্যমান থাকায় সরকারকে সদা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শাসন বিভাগের নির্বাহী প্রধান কে?

(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রধানমন্ত্রী (গ) মন্ত্রী (ঘ) স্পীকার

২। শাসন বিভাগের কাজ-

i. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ii. বাজেট প্রণয়ন iii. বিচার সংক্রান্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i. (খ) i. ও ii. (গ) ii. ও iii. (ঘ) সবকটি

পাঠ-৫.৫ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অবস্থান জানতে পারবেন।
- রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হবেন।
- রাষ্ট্রপতির প্রধান প্রধান কার্যাবলি বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্রপতি, পরামর্শ, সর্বাধিনায়ক, বাণী, অধিবেশন, ক্ষমা, অভিসংশন

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রধান। রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত বিধানসমূহ বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ অংশের ৪৮-৫৪ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিয়মমাফিক রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত এবং তিনি সংবিধান ও আইন বলে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সরকারের যাবতীয় কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ১ম পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্ধারিত আছে। বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত এবং এ দেশকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল কারণেই রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধান নির্বাহী; কিন্তু অলঙ্কারিক প্রধান। রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব পালনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রবিরুদ্ধ কর্মকান্ডের জন্য সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের মুখোমুখি করতে পারে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮ (৪) অনুসারে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক নির্দিষ্ট আইনের আওতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। তাঁকে অবশ্যই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। এছাড়া এই সংবিধানের আওতায় তিনি কখনও এই পদ থেকে অপসারিত হননি এই শর্তটিও পূরণ করতে হবে। তবে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে তিনি কখনই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে নানাবিধ ক্ষমতা প্রদান করেছে-

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ায় সরকারের সকল কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও তিনি অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীকে নিয়োগ প্রদান করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি প্রধান বিচারপতি, এটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ দান করে থাকেন। তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক।

সংসদ ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করে। নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশন ও প্রতি নতুন বছরের অধিবেশনের সূচনায় ভাষণ প্রদান করেন। তিনি সংসদে বাণী প্রদান, সংসদ অধিবেশন মূলতবি ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙেও দিতে পারেন। কোন বিল সংসদে পাশ হলে তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। সংসদ ভেঙে দেয়া হলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে আইন তৈরি করতে পারেন যা সংসদে আইন হিসেবে গণ্য হয়।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা :

বিচারিক ক্ষমতার অংশ হিসেবে সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত শাস্তি মার্জনা, স্থগিত, বিলম্বিত ও হ্রাস করতে পারেন।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা :

আর্থিক ক্ষমতার অংশ হিসেবে সরকারি ব্যয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোন বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিত সংসদে পেশ করা যাবে না।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা :

রাষ্ট্রপতি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্থল, জল ও আকাশ পথে আক্রমণের ক্ষেত্রে তিনি তা প্রতিরক্ষার জন্য এই সকল বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্মানসূচক পদক বা খেতাব প্রদান করে থাকেন। তাঁর অনুমতি ব্যতিত দেশের কোন নাগরিক বিদেশী কোন খেতাব বা সম্মান গ্রহণ করতে পারেন না। এ সকল ক্ষমতার বাইরে তিনি রাষ্ট্রদূত প্রেরণ ও গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির ওপর বর্তানো কাজের অংশ হিসেবে তিনি সকল জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দায়িত্বপূর্ব শপথ বাক্য পাঠ করান।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি একটি অলঙ্কারিক পদ-বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির কার্যকর কোন ক্ষমতা না থাকলেও তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে অভিভাবক হিসেবে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদটি প্রধানমন্ত্রী পদের পরিপূরক নয়; তবে প্রধানমন্ত্রীর কাজে সহায়ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কে?

(ক) স্পীকার (খ) প্রধানমন্ত্রী

(গ) রাষ্ট্রপতি (ঘ) সংসদ নেতা

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-

i. সাংবিধানিক প্রধান

ii. অলংকারিক

iii. নামমাত্র প্রধান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i, ii ও iii (ঘ) সবকটি

পাঠ-৫.৬ প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা জানতে পারবেন।
- প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংখ্যাগরিষ্ঠ, মন্ত্রিপরিষদ, সংসদ নেতা, উপদেষ্টা, প্রজাতন্ত্র, শাসন বিভাগ, পরামর্শদাতা।

প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রধান। সংবিধানের ৫৫ ও ৫৬ নং ধারা মতে, প্রধানমন্ত্রী পদায়িত হবেন মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষে। তিনি তাঁর মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী নির্বাচন করবেন। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভা তাদের কার্যাবলীর জন্য যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন। সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রকৃত নির্বাহী। জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পর সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মনোনীত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগকালীন সময়ে সংসদের যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের সমর্থন রয়েছে মর্মে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতীয়মান হবে, উক্ত সদস্যকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবেন।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান পরিষদ অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। জাতীয় সংসদের নেতা ও মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হিসেবে আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সর্বাধিক। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শাসন বিষয়ক, আইন বিষয়ক, নিয়োগ সংক্রান্ত, বাজেট সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। সংবিধানের ৫৬ ধারা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কমপক্ষে ৯০ শতাংশ সদস্য জাতীয় সংসদ সদস্যের মধ্য থেকে থেকে নিয়োগ প্রদান করবেন। এছাড়া বাইরে থেকে ১০ শতাংশ সদস্য তিনি মন্ত্রিসভায় যোগ করতে পারবেন। তবে শর্ত হল, এ সকল ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই জাতীয় সংসদ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'রুলস অব বিজনেস' অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা' পদেও নিয়োগ দিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি :

সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শাসন ক্ষমতার মধ্যমণি। তাঁকে কেন্দ্র করেই প্রজাতন্ত্রের সকল শাসন ও প্রশাসন পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

নির্বাহী বা শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা :

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি শাসন সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শাসনকার্য পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন ও তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করেন।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা :

যেকোন আইন প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃত্বশীল ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁর মতামত অনুযায়ী সংসদে আইন উত্থাপিত ও পাশ হয়।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা :

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রণয়ন ও তা সংসদে পেশ করেন। তাঁর পরামর্শের আলোকে দেশের রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহে অর্থ মঞ্জুরী প্রদান করেন।

সংসদ পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা: প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা হওয়ার দরুণ মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর পরামর্শক্রমে সংসদের অধিবেশন আহবান ও ভেঙে দিতে পারেন। জাতীয় সংসদের পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি স্পীকারকে সহযোগিতা করেন।

দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী :

প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের ও দলীয় সংসদীয় দলের নেতা। তিনি সংসদ ও সংসদের বাইরে দলের নীতি-নির্ধারণ ও দলীয় শৃঙ্খলা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া বিরোধী দলের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনেও কার্যকরি ভূমিকা রাখেন।
এ সকল কাজের বাইরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা হিসেবে, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় কাজে সমন্বয়কারী, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী পদের গুরুত্ব বেশি হবার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু থাকায় তিনি অনন্য ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের মধ্যমণি। কেননা তিনি ক্ষমতায় থাকলেই কেবল মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের টিকে থাকাও প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের কর্ণধার, মুখপাত্র ও জনগণের নেতা হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কোন বিভাগের প্রধান?
(ক) বিচার বিভাগ (খ) শাসন বিভাগ
(গ) অর্থ বিভাগ (ঘ) কোনটি নয়

২। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন কে?
(ক) প্রধান বিচারপতি (খ) স্পীকার
(গ) দলীয় প্রধান (ঘ) রাষ্ট্রপতি

৩। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিচের কোন দায়িত্ব পালন করেন-
i. বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন
ii. বাজেট প্রণয়নে পরামর্শ দেন
iii. মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব দেন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৭ বিচার বিভাগ

উদ্দেশ্য

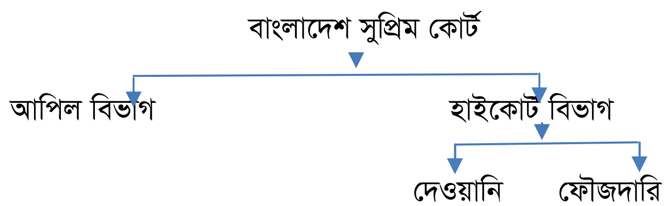
এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের কার্যাবলি ও ভূমিকা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ন্যায়বিচার, আশ্রয়, ব্যাখ্যাদাতা, বিচারপতি, সংবিধান, মৌলিক অধিকার অধস্তন আদালত।

রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। নাগরিকের অধিকার রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলাদেশের বিচার বিভাগ শেষ আশ্রয় হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ মূলত: দুই ভাগে বিভক্ত উচ্চতর বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট) ও অধস্তন বিচার বিভাগ (নিম্ন আদালতসমূহ)। সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট প্রধান বিচারপতি ও প্রত্যেক বিভাগের বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এসকল বিচারকবৃন্দ বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪ নং ধারা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদেরকে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে থাকেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ট বিভাগে বিচার বিভাগের কাঠামো, মর্যাদা এবং কার্যাবলি সম্পর্কিত বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিচার বিভাগের কাঠামো :



বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সালিশি আদালত। প্রতিটি জেলায় রয়েছে জেলা জজের আদালত ও সেশন জজের আদালত। এছাড়াও রয়েছে সহকারী জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। জেলা জজ আদালত আবার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সমন্বয়ে গঠিত।
সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে থাকে। প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত নির্ধারিত সংখ্যক বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত।

বাংলাদেশে আইনের বিধান অনুযায়ী অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি স্বীকৃত। রাষ্ট্রপতি এসব অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগের পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব প্রদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। দেশের সকল অধস্তন আদালত সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিচার বিভাগের কাজ :
বিচার বিভাগ সংবিধান রক্ষা, আইন প্রণয়নের সময় সাংবিধানিক মূলনীতির কোন ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তার পর্যালোচনা করে থাকে। এছাড়া রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও আইন লংঘিত হলে তার বিচারিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। হাইকোর্ট বিভাগ বিচারকার্য পর্যালোচনার ক্ষমতার অধিকারী। যেকোন ব্যক্তির মামলার বা আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগ

প্রজাতন্ত্রের যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর সংবিধানে প্রদত্ত যেকোন মৌলিক অধিকার কার্যকর করার নির্দেশনা বা আদেশ জারি করতে পারে। হাইকোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা ও বাস্তবায়নের একটি সোপান হিসেবে কাজ করে। তবে এই অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট যদি দেখতে পায় যে, কোনও আইন মৌলিক অধিকার বা সংবিধানের অন্য যে কোন অংশের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহলে সে আইনের ততটুকু অকার্যকর ঘোষণা করতে পারে। কোম্পানি, এ্যাডমিরালটি, বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রেও হাইকোর্টের মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে। নিম্ন আদালতে বিচারাধীন কোনও মামলার ক্ষেত্রে যদি সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত আইনের প্রশ্ন বা জনগুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় দেখা দেয়, তাহলে হাইকোর্ট সে মামলা অধস্তন বা নিম্ন আদালত থেকে প্রত্যাহার করে তার নিষ্পত্তি করতে পারে।

হাইকোর্ট বিভাগের আপিল বিবেচনা ও পর্যালোচনার এখতিয়ার রয়েছে। হাইকোর্ট প্রদত্ত কোনও রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দন্ডাদেশের সঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আইনের প্রশ্ন জড়িত থাকে, তাহলে ওই সব রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করা যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধানের ব্যাখ্যাকারী বলার কারণ কী?

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধান মোতাবেক বিচার বিভাগ অত্যন্ত মর্যাদাশীল আসনে প্রতিষ্ঠিত। আইনের শাসনকে সমুন্নত রেখে বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে থাকে। জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সংরক্ষণ করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে অটুট রাখে বিচার বিভাগ। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালতসমূহ ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল নিয়ে গঠিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিচারক নিয়োগ করেন-

(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রধানমন্ত্রী

(গ) প্রধান বিচারপতি (ঘ) স্পীকার

২। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের অংশ-

i. জেলা জজ আদালত

ii. হাইকোট

iii. সহকারী জজ আদালত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i. (খ) ii. (গ) i., ii. ও iii. (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৫.৮ বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইনের শাসন কী বলতে পারবেন।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নীতি, মীমাংসা, অভিযোগ, বিচারকার্য, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, ট্রাইব্যুনাল, মূলনীতি

গণপ্রজাতান্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে প্রতিটি নাগরিকের সম্পত্তি, মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জীবন রক্ষার সকল দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রের এ দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথমেই যেটি প্রয়োজন সেটি হল সকলের জন্য সমান আইন প্রণয়ন এবং তার সঠিক প্রয়োগ। এই ধারণা থেকেই মূলত: আইনের শাসনের বিষয়টি রাষ্ট্র চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ। আইনের শাসন হল রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সকল ক্রিয়া-কর্ম আইনের অধীনে পরিচালিত হয় এবং সেখানে আইনের স্থান সবকিছুর ঊর্ধ্বে। ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ এই যে, ক্ষমতাসীন সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে, যার ফলে রাষ্টের যেকোন নাগরিকের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হলে সে তার প্রতিকার পাবে। মোট কথা, আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে, যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সকল নাগরিকের সমান। আইন প্রয়োগের চূড়ান্ত দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছে বিচার বিভাগের উপর। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের মধ্যে যদি আইনের লংঘন হয় তাহলে বিদ্যমান আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, সংঘ ইত্যাদির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। বিচার বিভাগ যাতে বিনা বাধায় সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সে লক্ষ্যে বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা :

বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

- আইন তৈরীর সময় বাংলাদেশ সংবিধানের কোন মূলনীতির লংঘন করেছে কিনা, আইন বিভাগের এ কাজটিকে বলা হয় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।
- কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অধিকার লংঘিত হলে তার বিচারিক দায়িত্ব সম্পাদন করা।
- রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির কোন অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ আদালতে উত্থাপিত হলে তার মীমাংসাপূর্বক রায় প্রদান করা।
- রাষ্ট্রের যেকোন অংশে অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ হলে তার বিচারিক রায় প্রদান করা। এছাড়াও বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে যেকোন ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার বিচারিক কার্য সম্পাদন করে থাকে।

যেহেতু সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী নাগরিকের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের, সেহেতু কোনো ব্যক্তির এই অধিকার ক্ষুণ্ন হলে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। এভাবে বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংবিধান প্রদত্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ, যেমন--জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সমাবেশের স্বাধীনতা, চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্ম সংক্রান্ত স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি রক্ষা করে থাকে।

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে প্রহরায় আটকে রাখা যাবে না। গ্রেফতার হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিরেকে এর অতিরিক্ত সময় কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখা যাবে না। বিচার বিভাগ কর্তৃক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার এটি অন্যতম একটি পর্যায়। দেশের

সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখা আইনের শাসনের আরও একটি মৌলিক দিক। এক্ষেত্রে কোন রকম বর্ণ, শ্রেণি, ধর্ম বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বঞ্চিত করা যাবে না। কেউ যদি এই উপায়ে বঞ্চিত হয়, সেক্ষেত্রে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন।

বিচার বিভাগ কর্তৃক জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে শর্তটি মেনে চলতে হবে, তা হলো বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন বিচার বিভাগকে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা। শাসন বিভাগ যেন বিনা বিচারে কোন বিচারককে অপসারণ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বিচারকদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতাদি প্রদান, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার মাপকাঠিতে বিচারক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিচারকদের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি।

শিক্ষার্থীর কাজ	মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিচার বিভাগ সরকারের অন্যতম একটি অঙ্গ। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আইন বিভাগ প্রণীত আইন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে থাকে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্বটি বহুলাংশে বিচার বিভাগের হাতে। বিচার বিভাগ মূলত: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইনের বাস্তবায়ন করে-

i. বিচার বিভাগ

ii. আইন বিভাগ

iii. শাসন বিভাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

২। আইনের দৃষ্টিতে সমান এর অর্থ হল-

(ক) নিরপেক্ষতা (খ) লিঙ্গভেদ

(গ) বর্ণভেদ (ঘ) ব্যক্তি বিশেষ

পাঠ-৫.৯ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে অবগত হবেন।
- প্রশাসনিক কাঠামোর কার্যাবলি জানতে পারবেন।
- প্রশাসনিক কাঠামোর কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিন্যাস, আন্তঃসম্পর্ক, কল্যাণমূলক মন্ত্রিপরিষদ, দাপ্তরিক সচিবালয়, স্থানীয় প্রশাসন।

প্রশাসনকে রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থার হৃৎপিন্ড বলে আখ্যা দেয়া হয়। কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সামষ্টিকভাবে কর্মের সুষ্ঠু পরিচালনাকে প্রশাসন বলা হয়। সেদিক থেকে প্রশাসন হল সামষ্টিক কাজের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও বিন্যাস। বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক সরকার কাঠামোর অধীনে সংসদীয় সরকার ব্যস্থার ওপর গঠিত একটি রাষ্ট্র। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো সরকার পদ্ধতির নির্দেশনা ও কার্যকরণের সহমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার পদ্ধতি প্রদর্শিত নীতিমালা ব্যতিরেকে প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ ও সে অনুযায়ী প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন কাঠামোর মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। এই ভিন্নমাত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বজায় রেখে পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয় সাধন ও দায়-দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি শাসনের কাজটি করে থাকে। বাংলদেশ মূলত এককেন্দ্রিক সরকার কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ এদেশে একটি কেন্দ্রীয় সরকারই জনগণের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রের সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার পুরো দেশটিকে কেন্দ্র এবং মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করেছে। যেমন- সরকারের কেন্দ্রে একটি সচিবালয়, ৭টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং প্রায় পাঁচশতটি উপজেলায় পুরো দেশটিকে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তা বিধান ও কল্যাণমূলক নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিও তা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। এই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় শাসন ও প্রশাসন পরিচালিত করে।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন বা সরকারঃ

কেন্দ্রীয় সরকার বলতে মূলত সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: (ক) আইন বিভাগ, (খ) শাসন বিভাগ ও (গ) বিচার বিভাগকে বোঝানো হয়। সকল ধরনের আদালত সংক্রান্ত কার্যাবলি উচ্চ আদালত দেখভাল করে তার নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে। জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ করে এবং তার নিজস্ব সচিবালয়ের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য রাজধানী ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই সচিবালয়ের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার কার্যাবলি পরিচালনার জন্য এই সচিবালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আইন অনুসারে দেশের রাষ্ট্রপতি এই প্রশাসনিক দপ্তরের প্রধান এবং তাঁর নামেই সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। তবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকায় প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত প্রধান হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রীর মাধ্যমে এই সচিবালয়ের সকল কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। একজন মন্ত্রিপরিষদ সচিব যিনি রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রশাসনের প্রধান, প্রধানমন্ত্রীকে সকল কাজের দাপ্তরিক প্রধান হিসেবে সহযোগিতা করে থাকেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ, সচিবালয়, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখাসমূহে বিস্তৃত।

স্থানীয় প্রশাসন বা সরকার :

সরকারের প্রবর্তিত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় প্রশাসন বলে। স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ঠ যারা, তারা সকলেই সরকারী কর্মচারী। স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়।

মূলত: নাগরিকের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের দায়-দায়িত্বপালনের জন্য এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কাজ যুগোপযোগি করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা। বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রের পরই বিভাগীয় প্রশাসনের স্থান। বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি বিভাগের অন্তর্গত জেলাসমূহের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। বিভাগের পর জেলা হচ্ছে স্থানীয় সরকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। জেলা প্রশাসক জেলার সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। জেলার পর মূলতঃ সর্বশেষ স্তর হল উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে থাকেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন কাঠামো বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর কোন রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নির্ভর করে। এ কারণে প্রশাসনকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার হৃৎপিন্ড বলা হয়। সরকারি কাজের সুষ্ঠু পরিচালনা প্রশাসনের মাধ্যমে করা হয়। এ কারণে প্রশাসনিক কাঠামো অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসন সকল ক্ষেত্রে তৃণমূল সমস্যার সমাধানে যথেষ্ঠ নয়। সে জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের তাগিদে স্থানীয় প্রশাসন বিন্যাস করা হয়েছে। যা জনগণের দ্বার প্রান্তে সেবা পৌঁছে দিয়ে জনকল্যাণ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

i. এককেন্দ্রিক

ii. দুইস্তর বিশিষ্ট

iii. রাষ্ট্রপতি শাসিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

২। বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনের কয়টি স্তর?

(ক) একটি (খ) দুইটি

(গ) তিনটি (ঘ) চারটি

পাঠ-৫.১০ কেন্দ্রীয় প্রশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাঠামো জানতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কার্যপ্রক্রিয়া বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সরকার, প্রশাসনিক কার্যক্রম, সচিবালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত, বরাদ্দ, কার্যবিধি।

বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক সরকার কাঠামোভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত। রাজধানী ঢাকা থেকে সারাদেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে সারা দেশকে বিভিন্ন প্রশাসনিক এককে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। তবে সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কেন্দ্রীয় সচিবালয়। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতির নামে রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের কার্যকরি প্রধান হিসেবে সকল কার্য পরিচালনা করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকেন মন্ত্রীগণ এবং মন্ত্রীদের অধীনে থাকেন রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রশাসন অর্থাৎ সচিবগণ। সচিব হলেন বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অরাজনৈতিক প্রশাসনিক প্রধান। এই সচিবদের অধীনে থাকেন অন্যান্য সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। এই সচিবালয় বিভিন্ন দফতর, বিভাগ, উপবিভাগের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে সকল ধরণের সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। সারাদেশের মাঠ প্রশাসনের নেতৃত্ব মূলত এই সচিবালয় হতেই দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাঠামো নিম্নরুপঃ

রাষ্ট্রপতি
▼
প্রধানমন্ত্রী
▼
মন্ত্রী
▼
সিনিয়র সচিব
▼
সচিব
▼
অতিরিক্ত সচিব
▼
যুগ্ম-সচিব
▼
উপ-সচিব
▼
সিনিয়র সহকারী সচিব
▼
সহকারী সচিব

মন্ত্রণালয়ঃ মন্ত্রণালয় শাসন বিভাগের কার্য নির্বাহের জন্য জাতীয় পর্যায়ে গঠিত সরকারের প্রশাসনিক ইউনিট। ১৯৯৬ সালের কার্যবিধিতে সুনির্দিষ্ট সরকারি কার্য সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিটকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বিভাগ বা কতিপয় বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত প্রশাসনিক ইউনিটকে মন্ত্রণালয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যার প্রধান হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বা মন্ত্রণালয়ে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকবেন। সরকারের কার্যাবলি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে বন্টন করা হয়। সরকারি কার্যবণ্টনের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওপর ন্যস্ত। প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে রয়েছে অধিদপ্তর, অধীনস্থ দপ্তর এবং কতিপয় আধা সরকারি সংস্থা।

সচিবালয়ঃ সচিব হলেন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি এর প্রশাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ন্যস্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। সচিব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও অধীনস্থ অফিসসমূহে কার্যবিধি অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি করেন এবং এ সকল বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অবহিত করেন। এছাড়া সচিব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ বাজেট ও প্রচলিত হিসাববিধি অনুযায়ী ব্যয় হওয়ার বিষয়টিও তদারক করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি সম্পাদনের তাগিদে প্রয়োজনীয় উপাত্ত, তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্বও পালন করেন সংশ্লিষ্ট সচিব। সর্বোপরি, একজন সচিব অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে অর্পিত ক্ষমতা বন্টন এবং মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যসম্পাদনের ধরণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও স্থায়ী আদেশও প্রদান করে থাকেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	কেন্দ্রিয় প্রশাসনের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সরকার কাঠামো এককেন্দ্রিক। এই এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চালিত হয় সচিবালয়ের মাধ্যমে। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে তা আবার বিভিন্ন প্রশাসনিক এককে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মন্ত্রণালয়ে দুটি অংশ থাকে। মন্ত্রী হল মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক নির্বাহী প্রধান ও সচিব হল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অরাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রধান। বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতির নামে রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের কার্যকরি প্রধান হিসেবে সকল কার্য পরিচালনা করে থাকেন। মন্ত্রীদের অধীনে থাকেন রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রশাসন অর্থাৎ সচিবগণ এবং সচিবালয় থাকে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড কার নামে পরিচালিত হয়?

(ক) মন্ত্রী (খ) প্রধানমন্ত্রী

(গ) রাষ্ট্রপতি (ঘ) স্পীকার

২। কেন্দ্রিয় প্রশাসনের কর্মকর্তা হল-

i. বিভাগীয় কমিশনার

ii. সহকারী সচিব

iii. অতিরিক্ত সচিব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও iii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৫.১১ সচিবালয় : গঠন ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সচিবালয়ের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সচিবালয়ের কার্যক্রম বলতে পারবেন।
- সচিবালয়ের কার্যপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কেন্দ্রবিন্দু, পদসোপান, কার্যতালিকা, নীতি প্রণয়ন, তদারকি, সমন্বয়, কার্যবিধি, মূল্যায়ন।

বাংলাদেশকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও দক্ষ প্রশাসন। এ প্রশাসনিক কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য সরকারের একটি সচিবালয় রয়েছে। এই সচিবালয়ের মাধ্যমেই বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে। সচিবালয় দেশের গোটা প্রশাসন ও সরকারি কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। মূলত: সচিবালয়েই সরকারের অধিকাংশ নীতি-নির্ধারিত সংস্থা প্রতিস্থাপিত। সচিবালয়ে প্রধানত দুই ধরণের দাপ্তরিক প্রধান থাকেন। যথা- রাজনৈতিক নির্বাহী প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক প্রধান অর্থাৎ সচিব। সচিবদের উপরই রাষ্ট্রের সকল কার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব বর্তায়। মাঠ পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে সরকারের যাবতীয় নীতিমালার বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে সচিবদের উপর। এ কারণে সচিবালয় একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ সচিবালয় যথাক্রমে সিনিয়র সচিব, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব ইত্যাদি পদসোপান অনুযায়ী বিন্যস্ত।

সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদে অর্পিত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতির জারি করা আদেশে কার্যবিধি অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে মধ্যে দায়িত্ব বন্টন হয়। অধিকন্তু, সরকারি কার্যবিধির ৪ (১০) ধারার আওতায় প্রস্তুত 'সচিবালয় নির্দেশাবলী' নামে আরেকটি পৃথক দলিলের মাধ্যমে সচিবালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগে সরকারি কাজকর্ম সম্পাদনের ধরণ নির্ধারিত হয়। সচিবালয়ের কার্যাবলি নানাবিধ, যেমন- নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়নাধীন পরিকল্পনাগুলির মূল্যায়ন, জাতীয় সংসদে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিদের সহায়তা প্রদান, শীর্ষ পর্যায়ে কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন ইত্যাদি। যেহেতু সচিব হলেন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান, সেহেতু তিনি এর প্রশাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ন্যস্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। সচিবালয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও অধীনস্ত অফিসসমূহে কার্যবিধি অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি করে এবং এ সকল বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অবহিত করে। সচিবালয় সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ বাজেট ও প্রচলিত হিসাববিধি অনুযায়ী ব্যয় হওয়ার বিষয়টিও তদারক করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি সম্পাদনের তাগিদে প্রয়োজনীয় উপাত্ত, তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্বও পালন করে সংশ্লিষ্ট সচিবালয়। সর্বোপরি, সচিবালয় অধীনস্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে অর্পিত ক্ষমতা বন্টন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যসম্পাদনের ধরণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও স্থায়ী আদেশও প্রদান করে থাকে।

প্রশাসনিক নীতিমালা অনুযায়ী সচিবালয়ের নির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলি তুলে ধরা হল :

নীতি নির্ধারণ :

সচিবালয় হল সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব হলেন মন্ত্রীর উপদেষ্টা ও পরামর্শ দাতা। তিনি সরকারি নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রীকে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্ত্রী সচিবের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করেন।

হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা :
হলেন মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা। তিনিই মন্ত্রণালয়ের সকল হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করেন।

সরকারি নীতি বাস্তবায়নে সমন্বয় :

সরকারি নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, সচিবালয় সে বিষয়ে সমন্বয় সাধন করে। এক্ষেত্রে একজন সচিব নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা নির্ধারণ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন :

সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও সংযুক্ত অফিস-দপ্তর রয়েছে। সচিবালয় এসব অফিস বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে।

এছাড়া একজন মন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ, সংসদে তা উত্থাপন ও বক্তব্য প্রস্তুত করতে সহযোগিতা প্রদানসহ নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। জনগণের কল্যাণ সাধন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়টি সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় সচিবালয় এর একটি চিত্র তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

সচিবালয় হল বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। প্রশাসনিক সংগঠনের পদসোপানে সচিবালয়ের স্থান সর্বোচ্চ। সচিবালয় মন্ত্রীকে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ ও পরামর্শ দিয়ে মন্ত্রণালয়ের কাজকে এগিয়ে নিয়ে থাকে। এছাড়া মন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ, সংসদে তা উত্থাপন ও বক্তব্য প্রস্তুত করতে সহযোগিতা প্রদানসহ নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। সচিবালয় মন্ত্রণালয় চালনার অন্যতম প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেব কাজ করে। সচিবালয়ের সাহায্য সহযোগিতা ব্যতিত মন্ত্রণালয় কোন কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে না। বস্তুত প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়নে এই অরাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানটি গোটা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে চালিত করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কেন্দ্রিয় প্রশাসনের অতিগুরুত্বপূর্ণ কাঠামোর নাম-
(ক) অধিদপ্তর (খ) দপ্তর
(গ) সচিবালয় (ঘ) পরিদপ্তর

২। সচিবালয়ে কাজ হল-
i. নীতি নির্ধারণ
ii. হিসাব নিকাশ পরীক্ষা
iii. নীতির সমন্বয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৫.১২ বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভাগীয় প্রশাসন সম্পর্কে অবগত হবেন।
- জেলা প্রশাসন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জেলা প্রশাসনের কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- উপজেলা প্রশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রশাসনিক দপ্তর, বিকেন্দ্রীকরণ, আইনশৃংখলা, অবকাঠামো উন্নয়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, খাজনা, কর, বিচারক, নিষ্পত্তি।

বাংলাদেশ নাগরিকদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সমগ্র দেশকে মোট ৭টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ৪৮৬টি উপজেলায় ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক এই কাঠামোয় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তৈরী হয় একটি ইউনিয়ন পরিষদ। কিছু ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় একটি উপজেলা পরিষদ। একাধিক উপজেলা পরিষদ নিয়ে তৈরী হয় একটি জেলা এবং একইভাবে কয়েকটি জেলা নিয়ে গঠিত হয় একটি বিভাগ। এই বিভাগই মূলত কেন্দ্রীয় সচিবালয় ও জেলা প্রশাসনের মধ্যকার সমন্বয়কারীর কাজটি করে থাকে। বিভাগীয় কমিশনার হলেন প্রশাসনিক এই এককের প্রশাসনিক প্রধান। একজন যুগ্মসচিব পর্যায়ের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা বিভাগীয় প্রধান অর্থাৎ বিভাগীয় কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। অন্যদিকে জেলা বিভাগ ও উপজেলার মধ্যে সমন্বয়ের কাজটি করে থাকে। একটি জেলার মধ্যে সকল ধরনের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, কর আদায় এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার দায়দায়িত্ব বর্তায় জেলা প্রশাসনের হাতে। একজন ডেপুটি কমিশনার এই প্রশাসন এককের প্রধান।

জেলা প্রশাসনের কার্যাবলি :

ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক হল জেলা প্রশাসনের প্রাণ। তাকে কেন্দ্র করেই জেলার সকল কার্যপ্রণালি চালিত হয়। জেলার প্রধান হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যসমূহ নিম্নরূপ:

প্রশাসন সংক্রান্ত কাজ: জেলা প্রশাসক জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয় গৃহীত স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ তিনি তার অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে থাকেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে কার্য সম্পাদনের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সচিবালয়ে প্রেরণ করেন।

আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজ: জেলার শান্তি আনয়নের লক্ষ্যে ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জেলা প্রশাসক তার অধীনস্থ পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগান। এছাড়াও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার খাতিরে তিনি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারি কমিশনার ও পুলিশ তত্ত্বাবধায়কের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন।

রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ: জেলা প্রশাসক হলেন রাজস্ব আদায়ের প্রধান ব্যক্তি। তিনি ভূমি রাজস্ব, জলকর ও অন্যান্য রাজস্ব আদায় করে থাকেন। তিনি রাজস্ব আদায়কারীরূপে ভূমি রেজিস্ট্রেশন, বন্টন, নাম খারিজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া ভূমি দখল, উচ্ছেদ ও পদ্ধতিগত অন্যান্য বিষয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করে থাকেন।

উন্নয়নমূলক কাজ : জেলার কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও শিক্ষা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক তদারকির দায়িত্ব পালন করে থাকে। মূলত: সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি জেলা প্রশাসন গ্রহণ করে ও বাস্তবায়ন করে।

সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ : জেলা প্রশাসক জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল দপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যগত সমন্বয় সাধন করে থাকেন। এছাড়া জেলার মধ্যকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন।

স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কাজ: উপজেলা, থানা ও ইউনিয়ন পরিষদ জেলার অধীনে থাকায় জেলা প্রশাসক স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এসব প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার প্রদত্ত বিধানগুলো মেনে কাজগুলি সম্পন্ন করছে কিনা সে বিষয়ে তিনি তদারকি করেন।
বিচারিক কাজ: জেলা প্রশাসক একজন প্রথম শ্রেণির বিচারক হিসেবে ফৌজদারী মামলার বিচার করে থাকেন। তিনি দুই বছরের কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করার ক্ষমতা রাখেন।
এগুলি ছাড়াও জেলার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার তত্ত্বাবধানমূলক কাজ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক ও মানবতামূলক বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি একজন জেলা প্রশাসক সম্পাদন করে থাকেন।

উপজেলা প্রশাসনের কার্যাবলি :

উপজেলা প্রশাসন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বশেষ স্তর। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রশাসনের মধ্যমণি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ২০০৮ সালের জারিকৃত অধ্যাদেশ অনুযায়ী তিনি উপজেলা পরিষদের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি বলতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যাবলিকেই বুঝিয়ে থাকে। তার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

সরকারি নির্দেশের বাস্তবায়ন:

জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরকারি নির্দেশ বাস্তবায়ন করে থাকেন। কেন্দ্র থেকে সরকারি নির্দেশ সর্বপ্রথম জেলা প্রশাসকের নিকট আসে এবং সেখান থেকে প্রাসঙ্গিক কাজগুলো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে হস্তান্তর করা হয়।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান:

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় করে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকেন।
অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি: উপজেলার রাজস্ব ও বাজেট প্রশাসন তদারক সংক্রান্ত কাজ করা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অন্যতম কাজ।

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা:

উপজেলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নির্বাহী কর্মকর্তার ওপর বর্তায়। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে প্রয়োজনে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা পর্যন্ত জারি করার ক্ষমতা রাখেন।

শিক্ষামূলক কাজ:

নির্বাহী কর্মকর্তা সরকারের প্রাথমিক, বাধ্যতামূলক ও গণশিক্ষা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর ওপর তিনি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা কার্যক্রমকে সমুন্নত রাখেন।
এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ছাড়াও তিনি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি, দূর্যোগকালীন দায়িত্ব পালন, নির্বাচনকালীন নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে উপজেলা প্রশাসনের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে থাকেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	উপজেলা প্রশাসনের গুরুত্ব লিখুন

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের গোটা শাসন ব্যবস্থা বিশেষ করে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত। এগুলো হলো বিভাগ, জেলা ও উপজেলা। এই ব্যবস্থায় বিভাগ প্রদত্ত নির্দেশনা জেলাকে মেনে চলতে হয়। জেলা প্রদত্ত নির্দেশনা উপজেলা প্রশাসনকে মেনে চলতে হয়। এর মাধ্যমে প্রশাসনে ভারসাম্যমূলক অবস্থা বিরাজ করে। তবে বিভাগ প্রদত্ত নির্দেশনা জেলার প্রধান নির্বাহী হিসেবে জেলা প্রশাসক ও উপজেলার প্রধান নির্বাহী হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সম্পাদন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্থানীয় প্রশাসনে সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?

(ক) বিভাগীয় প্রশাসন (খ) জেলা প্রশাসন

(গ) উপজেলা প্রশাসন (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ

২। জেলা প্রশাসকের পদমর্যাদা সাধারণত-

(ক) যুগ্ম-সচিব (খ) সহকারী সচিব

(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (ঘ) উপ-সচিব

৩। উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের মুল পার্থক্য হল-

i. নির্বাচিত

ii. রাজনৈতিক

iii. স্থায়িত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১৩ স্থানীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নিবিড় সম্পর্ক, বিকেন্দ্রীকরণ, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আশা-আকাঙ্খা, প্রতিনিধি, জনকল্যাণ।

কোন দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে মাঠ প্রশাসনের নিবিড় সম্পর্কের ওপর। যেহেতু, মাঠ ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উপর বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু বাংলাদেশের উন্নয়ন উভয় প্রশাসনের সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে। এ কারণে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোয় কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশের মানুষের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও সেবা পৌঁছে দিতে সরকারকে প্রতিনিয়ত প্রচুর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এজন্যই সরকারকে সারা দেশে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। বাংলাদেশ সরকার বিকেন্দ্রীকরণের নিয়ম মেনে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এই প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে।

মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন মূলত কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত নিয়ম-নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সুসম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। তাদের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা প্রশাসনিক কাজের সফলতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে উঠতে পারে। তবে কখনও কখনও কর্মকর্তাগণের মধ্যকার কর্মবন্টন প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার দরুন প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে প্রশাসনের এই দুই স্তরের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্ক থাকা জরুরি।

রাজনৈতিক উন্নয়নের তাগিদে মাঠ প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মধ্যকার সুসম্পর্ক থাকা দরকার। রাজনৈতিক উন্নয়ন হল জাতি গঠনে অনুকূল রাজনৈতিক সংগঠন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃষ্টি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ ও স্থিতিশীল পরিবেশ রক্ষা করা। রাজনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসনের সম্পর্ক থাকা জরুরি।

রাষ্ট্র যন্ত্রের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে প্রশাসন ব্যবস্থা। যে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা জনগণের যত কাছাকাছি, সে দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খা তত বেশি পূরণ হয়। কেননা এর মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে মাঠ পর্যায়ে সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়। মাঠ পর্যায়ে সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে মাঠ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সহজ হয়েছে।

বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন তিনটি স্তরে বিভক্ত, এগুলো হচ্ছে, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন। বিভাগীয় নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসনের কার্যাদি ও জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলা পরিষদের কার্যাদি সংগঠিত হয়। কর্মকর্তাদের এই কার্যপ্রক্রিয়ায় কোন ধরনের জটিলতা লক্ষ্য করা গেলে সেক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা উপজেলা পর্যায়ের সকল ব্যবধান হ্রাস করা হয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মধ্যকার যোগাযোগ রচিত হয়।

জনগণের অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম শর্ত। উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের সাথে জনগণের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনও শক্তিশালী হয়। আর তা কেন্দ্রীয় প্রশাসন কর্তৃক

দারুণভাবে গৃহীত হয়। এভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিবিড় সম্পর্ক রচিত হয়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্কের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল।

শিক্ষার্থীর কাজ	কেন্দ্রিয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক নিবিড় হওয়ার দরুণ নিয়মমাফিক সকল প্রকার কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন মূলতঃ সাধিত হয়েছে এই দুটি প্রশাসনিক স্তরের মধ্যকার সুসম্পর্কের মধ্য দিয়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অংশীদারিত্ব গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের চাওয়া-পাওয়াকে কেন্দ্রিয় প্রশাসনে উত্থাপনের মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে এই দুইটি প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়, যা জনকল্যাণের সহায়ক হিসেবে দেখা দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্থানীয় ও কেন্দ্রিয় প্রশাসনের সমন্বিত রূপ হল-
(ক) আইন বিভাগ (খ) শাসন বিভাগ
(গ) বিচার বিভাগ (ঘ) কোনটি নয়

২। স্থানীয় ও কেন্দ্রিয় প্রশাসনের সমন্বয় করেন?
(ক) মন্ত্রী (খ) সচিব
(গ) স্পীকার (ঘ) প্রধান বিচারপতি

৩। প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হল-
i. জনগণের সেবা করা
ii. শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা
iii. অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তদারকি করা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। ‘ক’ রাষ্ট্রটি দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। নির্বাহী প্রধান রাষ্ট্রের নাগরিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করার জন্য দেশটিতে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তিনি বলেন সরকারের ক্ষমতার মালিক হবে জনগণ। জনগণকে অধিকতর সেবা পৌঁছে দেবার জন্য প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করলেন। সেখানে বিভিন্ন স্তরে সরকারি কার্যালয়গুলোকে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিভাগের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদেরকে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য একটি বিভাগের মাধ্যমে সরকারের সকল কর্মকাণ্ড এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা আইনের মাধ্যমে তা বলবৎ করার বিধান রাখা হয়েছে।

ক. সরকারের কয়টি বিভাগ থাকে?
খ. প্রশাসনিক কাঠামো কি? এটি সাধারণত কোন বিভাগের?
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের তিনটি বিভাগের সমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
ঘ. উদ্দীপকে একটি বিভাগের মাধ্যমে শাসন বিভাগের জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে। এই জবাবদিহিতা কীভাবে নিশ্চিত করা হয়? আলোচনা করুন?

২। গ্রাম এলাকায় একজন শিক্ষক ছাত্রদেরকে সচিবালয় সম্পর্কে পড়াচ্ছিলেন। তিনি ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁদের কেউ কখনো উপজেলা প্রশাসনে গিয়েছে কিনা? ছাত্রদের অনেকেই বলল গিয়েছে। তাঁরা সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাইনবোর্ড দেখেছে। সে প্রেক্ষিতে শিক্ষক বলল বাংলাদেশ সচিবালয়ও অনেকটা এ রকমই। সেটি হল বিভিন্ন দপ্তরের কেন্দ্রিয় দপ্তর বা মন্ত্রণালয়। যার সাচিবিক দায়িত্বে থাকেন সচিবগণ। অর্থাৎ কেন্দ্রিয় সচিবালয়েরই স্থানীয় একটি রূপ হল উপজেলা প্রশাসন।

ক. বাংলদেশ সরকারের প্রধান কে?
খ. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো দুটি স্তর কী কী?
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সচিবালয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কেন্দ্রিয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১ ঃ ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২ ঃ ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩ ঃ ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪ ঃ ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮ ঃ ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১০ ঃ ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১১ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১২ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৩ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ

স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

ইউনিট ৬

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সরকার ও প্রশাসনে গুরুত্ববহ হয়েছে মূলতঃ গত শতাব্দীর শেষের দিকে। কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত নীতি ও তার বাস্তবায়ন প্রায়শ রাষ্ট্রের ঊর্দ্ধতন অংশকেই সংশ্লিষ্ট করতো, যেখানে বৃহৎ জনগোষ্ঠী যারা তৃণমূলে বসবাস করে তারা সবসময়ই বঞ্চিত থেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা লাভে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের সরকার বিষয়ে প্রাজ্ঞ গবেষকগণ সেই জায়গা থেকে স্থানীয় শাসন ও প্রশাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তাঁরা মনে করেন, সামষ্টিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে ব্যস্টিক বা তৃণমূল উন্নয়ন ব্যতিরেকে কোনভাবেই সম্ভব নয়, যা সমাজের পরিবর্তনশীলতা বা উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরি। এভাবে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসনের বাইরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে আবির্ভূত হয়েছে। এই শাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব নির্বাচিত হয় স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে, যা জনগণের অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। বর্তমানকালে স্থানীয় জনগণের কল্যাণে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

পাঠ-৬.১ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ধারণা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ধারণাটি স্পষ্ট হবে।
- স্থানীয় স্বয়ত্ব শাসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	লোক প্রশাসন, সিদ্ধান্ত, স্থানীয় জনগণ, প্রতিনিধির অংশগ্রহণ, উন্নয়ন, কল্যাণ, স্বায়ত্বশাসন, বিতর্ক, জনগণের অংশগ্রহণ।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের অস্তিত্ব প্রাচীনকালেও এই জনপদের মানুষের মধ্যে ছিল। প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মূলত একটি স্বায়ত্বশাসিত ধরনের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনায় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ধারণাটি তুলনামূলকভাবে নতুন প্রত্যয়। এ প্রত্যয়টি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোকপ্রশাসন অধ্যয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বলতে স্থানীয় পর্যায়ে এমন এক ধরণের শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে আইনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত এখতিয়ারের মধ্যে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোনো ধরণের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মূলত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের একটি পর্যায়কে বুঝায়, যেখানে একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে স্থানীয়ভাবে শাসন করার জন্য স্বশাসিত স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ধারণা

স্থানীয় শাসনের সংজ্ঞা প্রদান করতে গেলে দেখা যাবে নানান বিশেষজ্ঞ বিভিন্নভাবে প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে স্থানীয় শাসন বলতে এমন এক ধরনের শাসনকে বোঝায়, যেখানে স্থানীয় জনগণ স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কিত বিষয়াবলীতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণ স্বশাসনের অধিকার ভোগ করে থাকে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনগণের ভোটে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হয় এবং নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক স্বশাসনের অধিকার লাভ করে। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠান কর আরোপ করতে পারে এবং নিজেদের জন্য বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারে।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ধারণা ও স্থানীয় সরকারের ধারণা সংক্রান্ত কিছু বিতর্ক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোকপ্রশাসন অধ্যয়নে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ধারণা ও স্থানীয় সরকারের ধারণাসংক্রান্ত কিছু বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়। আমরা যদি স্থানীয় সরকারের ধারণার উৎপত্তি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনার শুরুর দিকের তাত্ত্বিক আলোচনার দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যায় স্থানীয় সরকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের একটি পর্যায়ে এক ধরনের স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টি করার কথা বলা হয়। এই স্থানীয় সরকারের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকার কথাও বলা হয়, যার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে স্বায়ত্বশাসন। সুতরাং স্থানীয় সরকার বলতে মূলত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকেই বোঝানো হয়। যদিও ব্যবহারিক দিক থেকে অনেকেই স্থানীয় সরকার বলতে মাঠ প্রশাসনের স্থানীয় আমলাদের বুঝিয়ে থাকে। বাস্তবতার নিরীখে এটি একটি ধারণাগত ভুল প্রয়োগ। স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত স্বশাসনের অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকেই বুঝিয়ে থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের গুরুত্ব

আধুনিকীকরণের এই যুগে যেকোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্যই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ ব্যবস্থায় যখন গতিশীলতা সৃষ্টি হয়, তখন সরকারের কাছে জনগণের চাহিদা বহুগুণে বেড়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে একটি

নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজের সকল চাহিদা মেটানো এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং জনগণের কল্যাণের জন্যই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার আবশ্যক। এ শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব নিম্নে তুলে ধরা হল:

জনগণের অংশগ্রহণ:

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মূল কথাটিই হল স্থানীয় জনগণের ভোটে স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে জনগণ সম্পৃক্ত থাকবে। সুতরাং একথা বলাই যায় যে, স্থানীয় পর্যায়ের যেকোন উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ এ শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি করে দেয়।

স্থানীয় উন্নয়ন ও জনকল্যাণ:

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনে যেহেতু জনগণ নিজেরা নিজেদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে, সেহেতু স্থানীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোর সঠিক ব্যবহার করার দ্বার উন্মোচিত হয়। এ শাসন ব্যবস্থায় সরাসরি নিজেরা অথবা নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ অনেকগুণ বেড়ে যায়।

এছাড়াও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় নেতৃত্ব, নানান ধর্মের বর্ণের প্রতিনিধিত্ব, আমলাতন্ত্রের লাল ফিতার দৌরাত্ম হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক সুবিধাগুলোর সদ্ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার পরিব্যাপ্তি স্থানীয়ভাবে। এই ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ থাকে। এই শাসন প্রক্রিয়ায় আইনানুগভাবে স্থানীয় প্রশাসনকে স্বশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়। এই শাসনব্যবস্থা অন্য যেকোন শাসনব্যবস্থা থেকে ব্যতিক্রম এই অর্থে যে, এই স্থানীয় প্রশাসনটি নিজের আয়ের মাধ্যমে নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করবে। মূলত: এই চিন্তা থেকেই স্বায়ত্বশাসনের ধারণাটি বিস্তৃতি লাভ করেছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার কারণে প্রশাসনের স্বায়ত্বশাসনের রূপটি আরও প্রগাঢ় হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ (খ) উপজেলা পরিষদ

(গ) জেলা পরিষদ (ঘ) উপরের কোনটিই নয়

২। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, কেননা-

i. জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়

ii. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়

iii. রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.২ স্থানীয় শাসনের ধারণা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্থানীয় শাসন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- স্থানীয় শাসনের গুরুত্ব স্পষ্ট হবে।

মুখ্য শব্দ	নিয়মতান্ত্রিক, আর্থ-সামাজিক, অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, তৃণমূল, উন্নয়নমূলক, স্থানীয় শাসন, কেন্দ্রিয় প্রশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ, উন্নয়ন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোকপ্রশাসন আলোচনায় স্থানীয় শাসনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব বহু পুরোনো। যখন আধুনিক ধরণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখনো স্থানীয় পর্যায়েই শাসনের কাজটি হত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কিন্তু এই সকল শাসন পদ্ধতি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা তুলনামূলক নতুন। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসনের মধ্যেও কিছুটা ধারণাগত পার্থক্য রয়েছে। স্থানীয় সরকার বলতে বুঝায় স্থানীয় পর্যায়ের এক ধরণের সরকার কাঠামোকে যেখানে জনগণের প্রতিনিধিরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসনের কাজটি করে থাকে। আর স্থানীয় শাসন বলতে বুঝায় স্থানীয় পর্যায়ের সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে স্থানীয় সকল ধরণের আর্থ-সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনাকে স্থানীয় শাসনের ধারণায় স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের আমলা, সুশীল সমাজ, মিডিয়া ও কমিউনিটি ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন ইত্যাদির ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়। স্থানীয় শাসনে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয় বলে এর গুরুত্ব অধিক।

বাংলাদেশ একটি দ্রুত অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশ। জনবসতির দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর নিত্যনতুন চাহিদা সরকার কেন্দ্র থেকে কোনোভাবেই পূরণ করতে পারবে না। তাই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পাশাপাশি এদেশে যুগ-যুগ ধরে স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করছে। স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা বিধান, কষ্ট লাঘব ও চাহিদা পূরণ করার জন্য শাসন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের দ্বার খুলে দেয়।

স্থানীয় শাসনের গুরুত্ব:

কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা প্রতিষ্ঠিত যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যগত সফলতা মূলত: নির্ভর করে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের ওপর। তাই স্থানীয় শাসনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ অনেকাংশেই তৃণমূলের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। আর সেই ধারণা থেকেই বিকেন্দ্রীকরণ শাসন ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয়েছে। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের সফলতা নির্ভর করে শক্তিশালী স্থানীয় শাসনের উপর। বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ একমাত্র বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমেই সম্ভব। কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে নয়। এ দিক দিয়ে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের ঝুঁকি রোধ করতে স্থানীয় শাসন গুরুত্ব বহন করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থানীয় জনগণের সীমিত চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে তার অধিকাংশ স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। দেশের কোটি কোটি মানুষের সমস্যা ও সমাধান এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ স্থানীয় সরকার যত তৎপরতা ও দক্ষতার সাথে করতে পারে, তা কেন্দ্রীয় প্রশাসন কখনই করতে পারে না। কেননা, সরকারি যাবতীয় কাজ সম্পাদিত হয় আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু আমলাতন্ত্র প্রশাসনিক প্রয়োজনে সৃষ্টি হলেও তা স্বভাবতই জটিল, যা উন্নয়নমূলক কাজকে অনেক সময় ব্যাহত করে থাকে। আমলাতান্ত্রিক এই জটিলতা থেকে রক্ষা পেতে হলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই।

স্থানীয় সরকার নাগরিকদের অংশগ্রহণ যতটা নিশ্চিত করে থাকে, কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে তা অনেকাংশেই সম্ভব নয়। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সমুন্নত থাকে, যা কেবল স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই সম্ভব। এদিক বিবেচনায় স্থানীয় সরকার অসীম গুরুত্ব লাভ করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধিরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসনের কাজটি করে থাকে। স্থানীয় শাসন বলতে বুঝায় স্থানীয় পর্যায়ের সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে স্থানীয় সকল ধরণের আর্থ-সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনাকে। স্থানীয় শাসন কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত আইন দ্বারা স্বশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে পরিচালিত হয় এবং নাগরিকের কল্যাণার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়-দায়িত্বের অনেকাংশ নিজেদের এখতিয়ারের মধ্যে বাস্তবায়ন করে। কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার জটিলতা দূর করে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বলে স্থানীয় প্রশাসন গণতান্ত্রিক শাসন প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্থানীয় শাসন কাঠামোর সর্বশেষ স্তর কী?

(ক) থানা প্রশাসন (খ) বিভাগীয় প্রশাসন

(গ) উপজেলা প্রশাসন (ঘ) জেলা প্রশাসন

২। স্থানীয় সমস্যাগুলো কাদের দ্বারা সমাধান হওয়া উচিত?

(ক) রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে (খ) পুলিশের মাধ্যমে

(গ) রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা (ঘ) স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে

পাঠ-৬.৩ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যাল, শহুরে, গ্রামীণ, স্তর, তত্ত্বাবধান, উন্নয়ন, পরিবর্তনশীল, চৌকিদারি আইন, সংবিধান, জনগণের অংশগ্রহণ।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের ইতিহাস প্রাচীন। এই জনপদে যখন আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো ছিল না, তখনো এখানে পঞ্চায়েতের মত স্থানীয় সরকার কাঠামোর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের শাসনকার্য পরিচালিত হতো। হাজার বছরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন সময়ে নানান ধরণের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আইনী কাঠামোতে বাংলাদেশে আজকে যে স্থানীয় সরকার কাঠামো তার শুরু ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশ আমলে ১৮৭০ সালে চৌকিদারি আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আইনি কাঠামো দেওয়া হয়। এরপর ভাইসরয় লর্ড রিপনের সময়ে ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গর্ভমেন্ট এ্যাক্টের মাধ্যমে এ জনপদে তিনস্তর বিশিষ্ট পল্লী স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রবর্তন করা হয়। এগুলো হলো- জেলা পর্যায়ের জন্য জেলা বোর্ড, থানা পর্যায়ের জন্য লোকাল বোর্ড এবং গ্রামের জন্য ইউনিয়ন কমিটি। এছাড়াও ভাইসরয় লর্ড রিপনের সময়েই অর্থাৎ ১৮৮৪ সালে বেঙ্গল মিউনিসিপল এ্যাক্টের মাধ্যমে নগর স্থানীয় সরকার মিউনিসিপল্ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সময়ের সাথে সাথে নানান পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে এই সরকার কাঠামো এখনকার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে শহুরে ও গ্রামীণ দুই ধরনের স্থানীয় সরকার কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশে শহরের জন্য দুই স্তর বিশিষ্ট ও পল্লীর জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ	
শহুরে স্থানীয় সরকার: সিটি কর্পোরেশন	বিশেষ স্থানীয় সরকার বিষয়ক
পৌরসভা	আঞ্চলিক পরিষদ
পল্লী স্থানীয় সরকার: জেলা পরিষদ	
উপজেলা পরিষদ	
ইউনিয়ন পরিষদ	

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের অধিকার থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় সরকার নানানভাবে স্থানীয় সরকারের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে থাকে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তিন পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) স্থানীয় সরকারসমূহকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয় বলে তাদের কৃতকর্মের জন্য জনগণের নিকট এক ধরনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ অনুসারে জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা

স্থানীয় বিষয়াবলী পরিচালনা করার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইন তৈরী করে এই সরকারের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব

বাংলাদেশ আধুনিকীকরণের পথ ধরে চলা একটি পরিবর্তনশীল এবং উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারেরও দায়-দায়িত্ব অনেক। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এই স্থানীয় সরকারগুলো শাসনের কাজ করে থাকে বলে রাজনৈতিক অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয় এর মাধ্যমে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় যে, জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য এদেশের স্থানীয় সরকারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্রিটিশ আমলের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপরে আলোকপাত করুন।

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকারের ধারণা অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক চর্চা শুরু হয়েছে বৃটিশ আমল থেকে, যেখানে চৌকিদারি আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আইনি কাঠামো প্রদান করা হয়। জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার দরুণ প্রতিনিধিগণ তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারী হলেন-

(ক) সরকারি (খ) বেসরকারি

(গ) স্বায়ত্তশাসিত (ঘ) আধা-সরকারি

২। স্থানীয় সরকার কিসের অংশ?

(ক) জাতিসংঘের অংশ (খ) জনগণের অংশ

(গ) বিদেশি সংস্থার অংশ (ঘ) জাতীয় সরকারের অংশ

পাঠ-৬.৪ ইউনিয়ন পরিষদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পল্লী সমাজ, নির্বাচন, নীতিমালা, অবকাঠামো প্রণোদনা, শান্তি-শৃঙ্খলা, সরাসরি নির্বাচন, স্ট্যান্ডিং কমিটি, পল্লী উন্নয়ন, জনকল্যাণ।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তরটি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। প্রাচীন কাল থেকে এই জনপদে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটি কার্যকর ছিল সেটিই বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের ইউনিয়ন পরিষদের রূপটি নিয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকে বাংলাদেশের পল্লী সমাজের মানুষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ের শাসনের কাজ করে থাকে। অনেক দিন ধরে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ের মানুষের নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কার্যাবলি ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপঃ

১ জন চেয়ারম্যান
৯ জন সদস্য
৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য
১ জন সচিব, অফিস সহকারি ও গ্রাম পুলিশ

প্রতি পাঁচ বছর পরপর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে জনগণ ভোট দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ চেয়ারম্যান, নয়টি ওয়ার্ডের প্রতিটি থেকে একজন করে সদস্য ও প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত একজন নারী সদস্যকে নির্বাচিত করে। এই ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত সদস্য ছাড়াও ১৩ টি স্ট্যান্ডিং কমিটি থাকে। এই স্টান্ডিং কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য কমিটির চেয়ারম্যান এবং পাঁচ থেকে সাত জন স্থানীয় নাগরিক সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করার জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটি ও সচিব নানানভাবে সহযোগিতা করে থাকে। এই স্টান্ডিং কমিটি প্রশাসনের বাইরে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলিকে আরও ফলপ্রসূ করে তোলে। কেননা, গ্রাম উন্নয়নই হল ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের মূল উদ্দেশ্য। গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় চল্লিশটি কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এদের মধ্যে প্রধান হলো জনকল্যাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব সংগ্রহ, উন্নয়ন ও বিচার। ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের মধ্যে আছে রাজস্ব উৎস, সরকারি অনুদান, ট্যাক্স ও ফি ইত্যাদি। ইউনিয়ন পরিষদকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে এই পরিষদ নিজেদের আয়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিচালিত করবে। কিন্তু শাসন ও প্রশাসন নীতি-মালা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকলাপ ও সার্বিক কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ব্যবস্থায় সরকারী অনুদাননীতি গৃহীত হয়েছে। বস্তুতঃ স্থানীয় পর্যায়ে জনকল্যাণ সাধনের নিমিত্তে জনগণের একেবারে কাছ থেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখার তাগিদে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকরি ভূমিকা রাখে।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের সর্বনিম্ন স্তর। সুতরাং মাঠ বা পল্লী উন্নয়ন করাই ইউনিয়ন পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

উন্নয়নমূলক কাজঃ

ইউনিয়ন পরিষদ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটির শিল্প, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ, বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে জনকল্যাণ সাধন করে থাকে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে টিকা দান কর্মসূচি, খাদ্যে ভেজাল রোধ, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করাও ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম কাজ। এছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও বিনোদনের জন্য পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ ও সেগুলোর যত্ন, পরিচর্যা ও সংস্কার করে ইউনিয়ন পরিষদ জনকল্যাণ নিশ্চিত করে থাকে। দূর্যোগকালীন সময়ে দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনকরণ, কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

রাজস্ব সংক্রান্ত কাজঃ

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় জনগণের ওপর কর ধার্য ও আদায় করে থাকে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সহযোগিতা করে থাকে। জেলা প্রশাসকের নির্দেশমত কোন রেকর্ড প্রস্তুত, কর ধার্য, জরিপ, শস্য পরিদর্শন রাজস্ব প্রশাসনের সাথে জড়িত যেকোন কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা ইউনিয়ন পরিষদের কাজ।

কৃষি উন্নয়নমূলক কাজঃ

কৃষি উন্নয়নের জন্য এই পরিষদ উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ দান ইত্যাদি নানা ধরনের প্রণোদনামূলক কাজে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে থাকে।

বিচার ও শান্তিরক্ষামূলক কাজঃ

ইউনিয়নের অধীনে গ্রামসমূহে বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে থাকে। এছাড়া ইউনিয়নের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ করে এবং গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ সেবামূলক কাজ, সরকারের সংগে সংযোগ স্থাপন, খবরাখবর প্রদান ও প্রচার কার্য ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদন করে গ্রাম্য উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইউনিয়ন পরিষদ কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে?

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে নীচের স্তর হল ইউনিয়ন পরিষদ। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণ। এছাড়া স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হিসাবে অনির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে পল্লী উন্নয়ন কর্মে সহযোগিতা করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ের মানুষের নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কার্যাবলি এই ইউনিয়ন পরিষদ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) ১১ (খ) ১২

(গ) ১৩ (ঘ) ১৪

২। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিভাবে নির্বাচিত হন?

(ক) গণভোটে (খ) স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে

(গ) সদস্যদের ভোটে (ঘ) জেলা প্রশাসকের দ্বারা

৩। ব্যয় নির্বাহের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ করারোপ করতে পারে-

i. ঘরবাড়ির জন্য ও জমির ওপর ii. যানবাহনের ওপর

iii. হাটবাজারের ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৫ উপজেলা পরিষদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উপজেলা পরিষদের পটভূমি বলতে পারবেন।
- উপজেলা পরিষদের কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্ট্যান্ডিং কমিটি, হস্তান্তরিত, গ্রামীণ পরামর্শ, পাঁচসলা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, সংরক্ষিত, ২০০৯ সালের আইন।

বাংলাদেশের তিন স্তর বিশিষ্ট গ্রামীন স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যম স্তর হল উপজেলা পরিষদ। ১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে থানা পরিষদ নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নামকরণ করা হয়। এই স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে ১৮৮৫ সালের ব্রিটিশ বেঙ্গল লোকাল সেল্‌ফ গভর্মেন্ট এ্যাক্ট-র মাধ্যমে যে লোকাল বোর্ড গঠন করা হয় তারই পরিবর্তিত রূপ এই উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের মানুষের শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পরে সামরিক শাসন আমলে গঠিত উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। নানান পরিবর্তনের পরে ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদে উপজেলা পরিষদ আইনটি পাশ হয় এবং স্থানীয় সরকারের এই স্তরটি চালু হয়। দীর্ঘ বিরতির পর ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে উপজেলা পরিষদে প্রধানত দুই ধরনের প্রতিনিধি দেখা যায়। যথা: নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিনিধি। নির্বাচিত প্রতিনিধির একাংশ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। অন্যরা পরোক্ষভাবে অর্থাৎ একটি উপজেলা পরিষদের আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান ও মেয়র এবং সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের মধ্য থেকে নিজেদের দ্বারা নির্বাচিত এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য। ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপঃ

প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিঃ

একজন চেয়ারম্যান
দুইজন ভাইস-চেয়ারম্যান (একজন পুরুষ ও একজন নারী)

পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিঃ

উপজেলা পরিষদের অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র এবং এই দু'টি স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য।

সরকারি কর্মকর্তাঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেন এবং উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ অফিসার উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত সদস্য। এ সদস্যরা উপজেলা পরিষদের কোন সিদ্ধান্তে ভোট প্রদান করতে পারেন না।
এছাড়াও উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি ভালভাবে সম্পাদনের জন্য এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ পাওয়ার জন্য আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, কৃষি ও সেচ ইত্যাদির মত মোট ১৭ টি বিষয়ের জন্য একটি করে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের সহ-সভাপতি ও সংরক্ষিত আসনের সদস্যরা এই স্টান্ডিং কমিটির মিটিং এ সভাপতিত্ব করবেন এবং উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ঐ কমিটির অফিস

সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। স্থানীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকরি পরামর্শ পাওয়ার জন্য একজনকে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করা হবে।

২০০৯ সালের উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের পরামর্শকের ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। একটি উপজেলা পরিষদের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর।

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি:

স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যম স্তরের স্থানীয় সরকার হিসেবে উপজেলা পরিষদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ সম্পন্ন করা। এছাড়াও আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা।
- সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- উপজেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম আলোচনা এবং নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

এছাড়াও উপজেলা পরিষদ যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কুটির শিল্প ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং নারী, পানি সম্পদ, সংস্কৃতি, পরিবেশ বিষয়ক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	উপজেলা পরিষদের প্রধান কার্যাবলি উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

উপজেলা পরিষদকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যম স্তর বলে ধরে নেয়া হয়। কেননা এই ব্যবস্থাটি জেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে। ১৯৮৩ সালে চালু হলেও এক পর্যায়ে ব্যবস্থাটি স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে এর পুন:প্রবর্তন হয়। মধ্যম স্তরের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়াবলী সরকারকে অবহিত করে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কিভাবে নির্বাচিত হন?

(ক) সরকারের মনোনয়নের মাধ্যমে (খ) জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে

(গ) জনগণের পরোক্ষ ভোটে (ঘ) জেলা প্রশাসকের দ্বারা

২। প্রশাসনিক দিক থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মর্যাদা কার সমতুল্য?

(ক) বিভাগীয় কাউন্সিলর (খ) জেলা প্রশাসক

(গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ঘ) প্রতিমন্ত্রী

পাঠ-৬.৬ জেলা পরিষদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জেলা পরিষদের গঠন বলতে পারবেন।
- জেলা পরিষদের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সর্বোচ্চ স্তর, ইলেক্টরাল কলেজ, সমন্বয়, স্টান্ডিং কমিটি, অবশ্যকরণীয়, অর্পিত।

দেশে সুশাসন ও গণতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি। এ জন্য দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের গুরুত্ব নিয়ে তত্ত্বগত জগতে নানা ধরনের কথাবার্তা হয়ে আসছে। জেলা পরিষদ এ দেশের তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর। ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভর্মেন্ট এ্যাক্টের মাধ্যমে যে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়েছিল তারই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ আজকের এই জেলা পরিষদ। একটি জেলার সকল ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জেলা পরিষদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০০০ সালে জেলা পরিষদ এ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয় এবং ২০১৬ সালে এই আইনের কিছু সংশোধনী করা হয়। এই সংশোধিত আইনানুসারেই জেলা পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোন ফৌজদারী অভিযোগ বাংলাদেশের কোন আদালত গ্রহণ করে তাহলে তাকে সরকার কর্তৃক অপসারণের বিধান সৃষ্টি করা হয়েছে। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবারের মত এই স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একটি ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ২১ জন সদস্যকে নির্বাচিত করা হয়। একটি জেলার অন্তর্গত সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই ইলেক্টোরাল কলেজের ভোটার। আইনানুসারে প্রতি পাঁচ বছর পর পর জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একটি জেলার অন্তর্গত স্থানীয় সরকারের সকল কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন জেলা পরিষদের অন্যতম কাজ। এছাড়াও রাস্তা-ঘাট থেকে শুরু করে প্রায় সকল ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের দায়িত্ব পালন করে জেলা পরিষদ।

চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। জেলা পরিষদ তার কাজের সুবিধার্থে আইন-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও অবকাঠামোর মত বিষয়ের উপর একটি করে স্ট্যান্ডিং কমিটি করে থাকে। জেলা পরিষদের সদস্যের একজন একটি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

জেলা পরিষদের কার্যাবলি:

জেলা পরিষদ অবশ্য করণীয় এবং ঐচ্ছিক এই দুই ধরনের কাজ করে থাকে।

অবশ্য করণীয় কাজ:

জেলা পরিষদের অবশ্যকরণীয় কাজগুলো নিম্নরূপ:

- জেলার সকল উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করা।
- উপজেলা পরিষদ ও সকল নগর সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- সাধারণ লাইব্রেরীর রক্ষণাবেক্ষণ।
- জেলার অন্তর্গত যে সকল পানি পথ, কালভার্ট ও সেতু ইত্যাদি উপজেলা পরিষদ, নগর সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয় না সেগুলোর গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা।

- রাস্তার পাশে এবং পতিত সরকারি জায়গায় বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ করা।
- জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পার্ক, খেলার মাঠ এবং খোলা জায়গা সরবরাহ করা ও সংরক্ষণ করা।
- জেলার অন্তর্গত যে সকল ফেরিঘাট উপজেলা পরিষদ, নগর সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয় না সেগুলোর ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা।
- জেলার অন্তর্গত পান্থশালা, ডাকবাংলো ও বিশ্রামাগার রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- জেলা পরিষদের মত কাজ করে এ রকম অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে জেলা পরিষদের নিকট অর্পিত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে জেলা পরিষদের নিকট অর্পিত যে কোন দায়-দায়িত্বের বাস্তবায়ন।

ঐচ্ছিক কাজ:

এছাড়াও জেলা পরিষদের অনেক কাজ আছে যেমন- শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক কল্যাণ , গণস্বাস্থ্য, গণ-আবাসন ইত্যাদি জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং জেলা পরিষদ এর উন্নয়ন কল্পে নানান কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জেলা পরিষদের অবশ্য করণীয় কাজগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

জেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর। স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সর্ব প্রথম জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে। জেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন, যিনি জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হিসেবে বিবেচিত হবেন। জেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নকল্পে অবশ্যকরণীয় ও ঐচ্ছিক এই দুই ধরণের কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। একটি ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ২১ জন সদস্যকে নির্বাচিত করা হয়। এই সদস্যরাই জেলা পরিষদের অন্তর্ভূক্ত সকল কার্যাবলি সম্পন্ন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে কত সালে জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়?

(ক) ১৯৯৮ (খ) ১৯৯৯

(গ) ২০০০ (ঘ) ২০০১

২। জেলা পরিষদের অবশ্যকরণীয় কাজ-

i. উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা

ii. উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ

iii. গণ-আবাসন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) সবকটি

পাঠ-৬.৭ পৌরসভা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পৌরসভার গঠন-কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পৌরসভার কার্যাবলি জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্ট্যান্ডিং কমিটি, উন্নয়নমূলক কাজ, প্রধান নির্বাহী, মেয়র, ওয়ার্ড, কো-অপ্ট, জনকল্যাণ, কর্মসূচি, কাউন্সিলর।

বাংলাদেশে শহুরে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুই স্তরবিশিষ্ট নগর সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যথা: সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা। আমাদের জনপদে নগরায়নের এবং নগর কেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ব্রিটিশ শাসনামলের। বর্তমানে এখানে যে পৌরসভা ব্যবস্থা আছে তা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত। এ আইনানুসারে দুই স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় নগর সরকার কাঠামোর নিম্নস্তর পৌরসভা। এটি গঠিত হয় পৌরসভার অন্তর্গত প্রত্যেক বয়সপ্রাপ্ত নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে। পৌরসভার প্রধান নির্বাহী হচ্ছে পৌর মেয়র। এছাড়াও আইনানুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক পৌর কাউন্সিলর ও নির্ধারিত সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর এবং স্থায়ী প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। মেয়র, কাউন্সিলর ও নারী কাউন্সিলর পৌরসভার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

পৌরসভার গঠন:

আইনানুসারে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হয়ে থাকে, যথা:

১) এক জন মেয়র।
২) সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডের (তবে কমপক্ষে ৯টি ওয়ার্ড) প্রত্যকটি থেকে আলাদাভাবে এক জন করে ওয়ার্ড কাউন্সিলর।
৩) নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী কাউন্সিলর।

একটি পৌরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন হিসেবে বিবেচিত। এই আসনের জন্য শুধু নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যেকেই বয়সপ্রাপ্ত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে। পৌর মেয়র পৌরসভার প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়াও অফিসের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য স্থায়ী অফিসার ও অফিস সহকারী থাকে যারা অফিসের দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করে। ২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন অনুসারে একটি পৌরসভা ১০টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে থাকে। তবে প্রয়োজনে আরো অতিরিক্ত স্টান্ডিং কমিটি গঠন করতে পারে। একটি স্টান্ডিং কমিটিতে পাঁচজন সদস্য থাকে যার কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নারী সদস্য। প্রয়োজন মনে করলে পৌরসভা স্থানীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞ ও কার্যকরী পরামর্শ পাওয়ার জন্য একজনকে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করতে পারবে। পদাধিকার বলে পৌর মেয়র হবেন সকল স্টান্ডিং কমিটির সদস্য, তবে তিনি শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ছাড়া অন্য কোন স্টান্ডিং কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না।

পৌরসভার কার্যাবলি:

শহরে স্থানীয় সরকার কাঠামোর নিম্নস্তরের স্থানীয় সরকার হিসেবে পৌরসভার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা ও উন্নয়নের জন্য কাজ করা। এছাড়াও আইন অনুযায়ী পৌরসভার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- উন্নয়নমূলক কাজ: পৌরসভা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে জনকল্যাণ সাধন করে থাকে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে টিকা দান কর্মসূচি, খাদ্যে ভেজাল রোধ, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করাও পৌরসভার অন্যতম কাজ। এছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও বিনোদনের জন্য পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ ও সেগুলোর যত্ন, পরিচর্যা ও সংস্কার করে পৌরসভা জনকল্যাণ নিশ্চিত করে থাকে। দুর্যোগকালীন সময়ে দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। পৌর এলাকার মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনকরণ, কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।
- রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ: পৌরসভা পৌর এলাকার জনগণের ওপর কর ধার্য ও তাদের থেকে তা আদায় করে থাকে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সহযোগিতা করে থাকে। জেলা প্রশাসকের নির্দেশমত কোন রেকর্ড প্রস্তুত, কর ধার্য, জরিপ, এছাড়াও যেকোন কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা পৌরসভার কাজ।
- বিচার ও শান্তিরক্ষামূলক কাজ: পৌরসভা পৌর এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে থাকে। এছাড়া পৌরসভা পৌর এলাকার অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত কাজগুলো পৌরসভা করে থাকে।

- পৌর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে পৌরসভার নিকট অর্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- পৌর এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ছাড়াও পৌরসভা সেবামূলক কাজ, সরকারের সংগে সংযোগ স্থাপন, খবরাখবর প্রদান ও প্রচার ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদন করে নগর উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় শহুরে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে দুই স্তর বিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থার মধ্যে পৌরসভা হল নীচের স্তরের। পৌরসভার সরকার কাঠামো বয়োপ্রাপ্ত প্রত্যেক নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে গঠিত হবে। একটি পৌরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন হিসেবে বিবেচিত হবে। পৌরসভা বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক, রাজস্ব সংক্রান্ত, বিচার ও শান্তিরক্ষামূলক কাজসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে থাকে। এছাড়াও সরকারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, খবরাখবর প্রদান ও প্রচারের মত কাজগুলো সম্পাদন করে নগর উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৌরসভার জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নিচের কোনটি?

(ক) বৃক্ষরোপণ (খ) জাদুঘর

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ (ঘ) মশক নিধন

২। পৌরসভা কোন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় (খ) পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়

(গ) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (ঘ) তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পাঠ-৬.৮ সিটি কর্পোরেশন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি জানতে পারবেন।
- সিটি কর্পোরেশনের গঠন বলতে পারবেন।
- সিটি কর্পোরেশনের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শহরে সমন্বয়, দায়-দায়িত্ব, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন, নিরাপত্তা, সরকারি নির্দেশনা,

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর জনগণের অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৭৭ সালের পৌরসভা আইন সংশোধন করে। ১৯৭৮ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে প্রথমবারের মত সিটি কর্পোরেশন নামক স্থানীয় নগর সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১১টি সিটি কর্পোরেশন কার্যকর আছে। ২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইনানুসারে সিটি কর্পোরেশনগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এই সিটি কর্পোরেশনগুলোর কাঠামো, নির্বাচন পদ্ধতি, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি উক্ত আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হচ্ছেন সিটি মেয়র। তিনি সিটি কর্পোরেশনের অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। মেয়রের সাথে সাথে সিটি কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট সংখ্যক কমিশনার জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। একটি সিটি কর্পোরেশন আইন দ্বারা আয়তন ও জনসংখ্যার সংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকে। একটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর বয়সপ্রাপ্ত নাগরিক অর্থাৎ ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। সিটি কর্পোরেশনের অধিবাসীদের মধ্য থেকে যে কোন নাগরিক নির্দিষ্ট আইনানুসারে যোগ্য হলে মেয়র ও নির্ধারিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। নির্ধারিত ওয়ার্ডের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক ওয়ার্ডের সমান আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে নারী কাউন্সিলর নির্বাচিত হবেন।

- উন্নয়নমূলক কাজঃ সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণের মত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে জনকল্যাণ সাধন করে থাকে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে টিকা দান কর্মসূচি, খাদ্যে ভেজাল রোধ, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করাও সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম কাজ। এছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও বিনোদনের জন্য পাঠাগার স্থাপন, পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ ও সেগুলোর যত্ন, পরিচর্যা ও সংস্কার করে সিটি কর্পোরেশন জনকল্যাণ নিশ্চিত করে থাকে। দূর্যোগকালীন দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন এলাকার মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনকরণ, কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।
- আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও পরিস্কার-পরিচ্ছনতা সংক্রান্ত কাজঃ বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনগুলোর কাজের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আবর্জনা ব্যবস্থাপনা করা। কর্পোরেশন এলাকার জনপথ, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করতে হয় সিটি কর্পোরেশনকে। কর্পোরেশন সকল ধরনের পাবলিক ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকে।
- রাজস্ব সংক্রান্ত কাজঃ সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনগণের ওপর কর ধার্য ও তাদের থেকে তা আদায় করে থাকে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সহযোগিতা করে থাকে।
- বিচার ও শান্তিরক্ষামূলক কাজঃ সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সালিশি আদালত হিসেবে কাজ করে থাকে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন এলাকার অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত কাজগুলো সিটি কর্পোরেশন করে থাকে

- মহানগর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা।
- কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে সিটি কর্পোরেশনের নিকট অর্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- সিটি কর্পোরেশন এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- এসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ছাড়াও সিটি কর্পোরেশন সেবামূলক কাজ, সরকারের সংগে সংযোগ স্থাপন, খবরাখবর প্রদান ও প্রচার ইত্যাদি কাজসমূহ সম্পাদন করে নগর উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনা ব্যবস্থা কার্যক্রম আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় শহুরে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে দুই স্তর বিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন হল উপরের স্তরের। সিটি কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হচ্ছেন সিটি মেয়র। তিনি সিটি কর্পোরেশনের অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেন। এর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ, প্রশাসনিক, বিচার ও শান্তিরক্ষামূলক কাজ, আত্ম-কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনমূলক কাজ, সেবামূলক কাজ। এছাড়াও সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা সম্পাদন করে সিটি কর্পোরেশন নগর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ কয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন?

(ক) ৫ বছর (খ) ৬ বছর

(গ) ৭ বছর (ঘ) ৮ বছর

২। সিটি কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–

i. স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কাজে

ii. জনস্বাস্থ্য রক্ষায়

iii. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৯ | পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের গঠন জানতে পারবেন।
- এ পরিষদের কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আয়ের উৎস বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, মুখ্য নির্বাহী কর্মকান্ড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, রীতি-নীতি, আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, কেন্দ্রীয় প্রশাসন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের গঠন :

বাংলাদেশে মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের দেখভাল ও সমন্বয় সাধন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনানুসারে, ১৯৯৯ সালের ২৭শে মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার পুরো এলাকার স্থানীয় শাসনের কাজকর্ম তদারকি করার জন্য এই বিশেষ ধরনের আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। ১ জন চেয়ারম্যান, ১২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্য, ৬ জন অ- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্য, ২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী সদস্য, ১ জন অ- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী সদস্য এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩ চেয়ারম্যানসহ সর্বমোট ২৫ জন সদস্য সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। চেয়ারম্যান হবেন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী থেকে। ১২ জন ৰুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্য হবেন আইনানুসারে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গোষ্ঠী থেকে। অ-ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী সদস্য হবেন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অ- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীগণের মধ্য থেকে। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে এর সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদে সরকারের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন। আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলি:

- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড আঞ্চলিক পরিষদের আওতাধীন এবং আইন দ্বারা এদের উপর অর্পিত সকল বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করে থাকে আঞ্চলিক পরিষদ ।
- পরিষদ পৌরসভাসহ সকল স্থানীয় সরকারসমূহের তত্ত্বাবধান ও তাদের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন করে থাকে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলির সার্বিক তত্ত্বাবধান করে থাকে।
- পার্বত্য জেলাসমূহের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে থাকে।
- জাতীয় শিল্পনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য অঞ্চলে ভারী শিল্প স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান করে থাকে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিওদের কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করে থাকে।

এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এ অঞ্চলের সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর রীতি-নীতি, প্রথা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ন্যায় বিচার ইত্যাদি সমুন্নত রাখার জন্য সকল ধরনের তত্ত্বাবধান করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও আয়ের উৎস:

প্রতি অর্থবছর শুরু হওয়ার আগে আঞ্চলিক পরিষদ ঐ বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় সম্বলিত বিবরণী বা বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করে থাকে। নিম্নোক্ত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ তার তহবিল গঠন করে।

- আঞ্চলিক পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা।

- পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং এ অর্থের পরিমাণ সময়-সময় সরকার নির্ধারণ করবে।
- সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ।
- পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা।
- সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান ও ঋণ।
- কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।
- পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোনো অর্থ।

এখানে উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি কখনো আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত কোনো আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে তা নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আলোচনা করবে এবং পরিষদের পরামর্শ বিবেচনাক্রমে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের গঠন আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের বৈচিত্র্য রীতি-নীতি, প্রথা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার অক্ষুন্ন রাখার প্রত্যাশায় এই আঞ্চলিক পরিষদ। পার্বত্য অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক কাঠামো আছে তাদের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একটি অন্যতম কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

(ক) ১৯৯০ (খ) ১৯৯২

(গ) ১৯৯৭ (ঘ) ১৯৯৮

২। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদর দপ্তর কোথায় ছিল?

(ক) খাগড়াছড়ি (খ) রাঙামাটি

(গ) বান্দরবান (ঘ) চন্দ্রঘোনা

পাঠ-৬.১০ স্থানীয় উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে এনজিও'র অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- স্থানীয় উন্নয়নে এনজিও'র অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বনির্ভরতা, দারিদ্র বিমোচন, অলাভজনক, আর্থ-সামাজিক, সেবা, ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, ত্রাণ সামগ্রী।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি জড়িত রয়েছে। বস্তুত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঘনবসতির এই দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেক দিন ধরেই অনেক ধরনের বেসরকারি সংস্থা কাজ করে আসছে। এনজিও ব্যুরো'র তথ্য মতে বর্তমানে আড়াই হাজারের মত দেশী-বিদেশী বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে। এই বেসরকারি সংস্থাগুলো দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লি উন্নয়ন, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, লৈঙ্গিক সমতা এবং মানবাধিকারসহ নানাবিধ বিষয়ে কাজ করে। এদেশে সাধারণত তিন ধরনের বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কাজ করে। এগুলো হল:

ক. আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা
খ. জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা
গ. স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা

এনজিওকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় জনগণের স্বার্থে উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত সেবাদানকারী অলাভজনক সামাজিক সংস্থাই হল এনজিও। এনজিও-র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এ ধরনের সংস্থা সরকারের কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে সরকারের আইন মেনে জনগণের উন্নয়নের জন্য নানান ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই সংস্থাগুলো অলাভজনক সংস্থা হিসাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে জনকল্যাণে ব্যয় করে। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়শীল দেশের ক্ষেত্রে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর কথা বললে চলবে না বরং এখানে আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে এনজিওগুলো নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

- দারিদ্র দূরীকরণ: বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওগুলো নানান কর্মসূচি সম্পাদন করে আসছে। এর মধ্যে অন্যতম হল ঋণদান কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থান।
- ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প: বাংলাদেশে অনেক মানুষ অতি গরীব বিধায় তারা প্রচলিত ব্যবস্থায় ঋণ নিতে পারে না। এনজিওগুলো ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে এই পরিস্থিতিতে এক ধরনের পবিবর্তন নিয়ে এসেছে।
- ক্ষমতায়ন: গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামষ্টিক ভূমিকা বৃদ্ধি ও নিজেদের অধিকার তুলে ধরার সক্ষমতা সৃষ্টিতে এনজিও কাজ করে। তথ্য জানার অধিকার, সহিংসতা বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতনতা বাড়াতে এনজিওসমূহের যে কার্যক্রম তা সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য দান: বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো ভূমিকা পালন করে থাকে। ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ, উদ্ধারকার্য সম্পাদন ও পুনর্বাসন ইত্যাদি কাজে এরা ভূমিকা রেখে চলেছে।

- শিক্ষা সম্প্রসারণ: শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষা, গণশিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমে এনজিওগুলো ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে বেসরকারি সংস্থাসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্য, নারীর উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, কর্মসংস্থান, কৃষি উন্নয়ন, মূলধন সৃষ্টি, পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা নিয়ে নানামুখী আলাপ-আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে, ক্ষুদ্র ঋণের উচ্চহার ও ঋণ আদায়ে কখনো-কখনো জবরদস্তির বিষয়টিকে নানা মহল সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	এনজিওদের কাজের ধরণ আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্রে সরকারের একার পক্ষে সকল ধরণের কার্যক্রম পালন সম্ভব হয় না। এছাড়াও স্বাধীনতার পর থেকে দাতাগোষ্ঠী ও সরকারের সমান্তরালে এনজিওগুলো নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহী হয়। এই ধারাবাহিকতাতেই বর্তমানে এনজিও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে নানাভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি বাংলাদেশি এনজিও?

(ক) আশা (খ) হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

(গ) অক্সফাম (ঘ) কেয়ার

২। বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হল-

i. কেয়ার ii. ডানিডা

iii. সুইস এইড

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

(ক) বহু নির্বাচনী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১ ও ২ নং প্রশ্নের দিন।

তামান্না পারিবারিক কলহের কারণে বাবার বাড়ি চলে যায়। তামান্নার স্বামী বিষয়টি মীমাংসা করতে না পেরে স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেবের দ্বারস্থ হয়। চেয়ারম্যান সাহেব উভয় পরিবারের সাথে কথা বলে বিষয়টি মীমাংসা করেন।

১। উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির মীমাংসা করা চেয়ারম্যান সাহেবের কোন ধরনের কাজ?

(ক) উন্নয়নমূলক (খ) সেবামূলক

(গ) বিচার সালিশমূলক (ঘ) শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষামূলক

২। চেয়ারম্যান সাহেবের এরূপ উদ্যোগ

(ক) সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করবে (খ) নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে

(গ) নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে (ঘ) নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

আসমা একটি সংস্থায় চাকরি করে, যা দারিদ্র্য বিমোচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংস্থাটি সরকারি নয়।

৩। উদ্দীপকের আসমা কোন ধরনের সংস্থায় চাকরি করে?

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ (খ) পৌরসভা

(গ) উপজেলা পরিষদ (ঘ) এনজিও

৪। উক্ত সংস্থাটি ভূমিকা রাখে–

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় (খ) দারিদ্র্র বিমোচন

(গ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় (ঘ) শিক্ষা বিস্তারে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

করিম সাহেব সাহাপুর ইউনিয়নের জনগণের ভোটে নির্বাচিত। তিনি সকল শ্রেণি পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করে এলাকার আয়ের মাধ্যমে রাস্তাঘাট নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, বিচার সালিশ সম্পাদনসহ নানান উন্নয়নমূলক কাজ করেন। তার প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনায় জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে।

৫। উদ্দীপকে করিম সাহেব যে পদের অধিকারী-

(ক) মেয়র (খ) কাউন্সিলর

(গ) চেয়ারম্যান (ঘ) হেডম্যান

৬। করিম সাহেবের এ রকম ভূমিকার ফলে জনগণ কী পাবে?

i. বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারবে

ii. রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করতে পারে

iii. স্থানীয় শাসনকার্যে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

(খ) সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মনসুর সাহেব বাংলাদেশের একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানে আরও ৯ জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন নির্বাচিত সংরক্ষিত নারী সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। এ প্রতিষ্ঠানেরর কার্যকাল ৫ বছর।

(ক) এনজিও কি?

(খ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে কি বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকে কোন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) স্থানীয় উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির মূল্যায়ন করুন।

২। স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ‘ক’ নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়। এ সংস্থার সদস্যগণ স্থানীয় বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে, ওই এলাকায় সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে ‘খ’ নামক আরেকটি সংস্থা। এ সংস্থার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে।

(ক) কতজন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়?

(খ) পৌরসভার গঠন সম্পর্কে কী জানেন?

(গ) ‘ক’ নামক সংস্থাটি স্থানীয় পর্যায়ে কী ধরনের শাসন? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) ‘ক’ ও ‘খ’ সংস্থার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ ঃ ১। গ, ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ ঃ ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ ঃ ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬ ঃ ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭ ঃ ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮ ঃ ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯ ঃ ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০ ঃ ১। ক ২। ঘ

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা

ইউনিট ৭

আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে কিছু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানেও এমন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সাংবিধানিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়োগ পদ্ধতি, পদের মেয়াদ, পদত্যাগ ও অপসারণ পদ্ধতি, পদমর্যাদা ও গুরুত্ব এবং কার্যাবলি সংবিধানে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ অধ্যায়ে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এটর্নি জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও সরকারি কর্ম কমিশন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান
পাঠ-২: সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি
পাঠ-৩: নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি
পাঠ-৪: এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি
পাঠ-৫: মহাহিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

পাঠ-৭.১ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, অনুচ্ছেদ, অ্যাটর্নি জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক, সরকারি কর্ম কমিশন।

সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

যেসব প্রতিষ্ঠান সংবিধানের সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলে। বাংলাদেশে এ ধরণের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সাংবিধানিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ চারটি প্রতিষ্ঠান হল-

i. এটর্নি জেনারেল
ii. নির্বাচন কমিশন
iii. মহাহিসাব নিরীক্ষক
iv. সরকারি কর্ম কমিশন

নিম্নে এ চারটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল-

i. **এটর্নি জেনারেল :** বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগে পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৬৪নং অনুচ্ছেদে এটর্নি জেনারেল সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগদান করবেন। এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত এটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

ii. **নির্বাচন কমিশন ঃ** বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম ভাগের ১১৮ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠিত। সংবিধানের ১১৯ থেকে ১২৬ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় বিষয়াদির উল্লেখ আছে।

iii. **মহাহিসাব নিরীক্ষক ঃ** বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম ভাগের ১২৭ থেকে ১৩২ নং অনুচ্ছেদে মহাহিসাব নিরীক্ষক পদের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের একজন মহাহিসাব নিরীক্ষক থাকবেন এবং তাঁকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন। বাংলাদেশ সংবিধান ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ হবে। মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহাহিসাব নিরীক্ষক অপসারিত হবেন না।

iv. **সরকারি কর্ম কমিশন ঃ** বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগে ২য় পরিচ্ছেদের ১৩৭ থেকে ১৪১ নং অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলির উল্লেখ রয়েছে। সংবিধান অনুসারে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা করা যাবে। একজন সভাপতি আইনের দ্বারা যেরূপে নির্ধারিত হবেন, সেরূপে অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে কমিশন গঠিত হবে। সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সরকারি কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে-নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা।

পরিশেষে বলা যায়, সাংবিধানিক উপায়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলে। সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, পদের মেয়াদ, পদমর্যাদা, পদত্যাগ ও অপসারণ পদ্ধতি এবং দায়িত্ব সংবিধানে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

সংবিধানের বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেগুলোকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলে। বাংলাদেশে এরূপ চারটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যথা- এটর্নি জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও সরকারি কর্ম কমিশন। সংবিধানে প্রত্যেকটি পদের গঠন ও কার্যাবলি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলি কী দ্বারা নির্ধারিত?

(ক) প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে (খ) উচ্চ আদালতের মাধ্যমে

(গ) আইনের দ্বারা (ঘ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের দ্বারা

২। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়-

i. নির্বাচন কমিশন

ii. সরকারি কর্মকমিশন

iii. দুর্নীতি দমন কমিশন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-৭.২ সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরকারি কর্ম কমিশনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সরকারি কর্ম কমিশন, পদের মেয়াদ, অধ্যাদেশ, সুপ্রিম কোর্ট, সংসদ, বার্ষিক রিপোর্ট।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যা সরকারি কর্মী নিয়োগ ব্যবস্থার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৮ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি 'বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন' আদেশ জারি করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগে ২য় পরিচ্ছেদের ১৩৭ থেকে ১৪১ নং অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিশন গঠন

আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্ম-কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত, সেরূপ অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে প্রত্যেক কমিশন গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতির ৫৭ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য সংখ্যা সভাপতিসহ অন্যূন ৬ জন এবং অনূর্ধ্ব ১৫ জন নির্ধারণ করা হয়। [অনুচ্ছেদ- ৩৭]

সদস্য নিয়োগ

প্রত্যেক সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হবেন যাঁরা বিশ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে কোন সরকারি কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ হবে [অনুচ্ছেদ- ১৩৮ (১), ১৩৮ (২)]

পদের মেয়াদ

কোন সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য তাঁর দায়িত্বগ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর বা তাঁর ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া - এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সে কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

সুপ্রিম কোর্টের কোন বিচারক যে পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ছাড়া কোন সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য অপসারিত হবে না। তবে কোন সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। [অনুচ্ছেদ- ১৩৯ (১), ১৩৯ (২), ১৩৯ (৩)]

সরকারি কর্ম কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪০ নং অনুচ্ছেদে কমিশনের দায়িত্ব বা কার্যাবলি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে কমিশনের কার্যাবলি তুলে ধরা হল-

i. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা করা। [অনু- ১৪০ (১ক)]

ii. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত পালন। [অনু-১৪০(১খ), ১৪০ (১গ)]

iii. জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন-

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে, এরূপ বিষয়াদি এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি। [অনু-১৪০ (২)]

পরিশেষে বলা যায়, সরকারি কর্ম কমিশন অন্যতম একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারের অগ্রযাত্রা ও সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে কেননা এ প্রতিষ্ঠানই প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য নাগরিকদের যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন করে থাকে সরকারি কর্ম কমিশন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সরকারি কর্ম কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা, সদস্য-নিয়োগ, পদের মেয়াদ, কমিশনের দায়িত্ব এবং বার্ষিক রিপোর্ট সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বার্ষিক রিপোর্ট সম্পর্কে ১৪১ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, প্রত্যেক কমিশন প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বছরে স্বীয় কার্যাবলি সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আইনের দ্বারা এক বা একাধিক কর্মকমিশন গঠন করার কথা বলা হয়-

i. নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণের জন্যে

ii. পদোন্নতি নির্ধারণের জন্যে

iii. বদলি সংক্রান্ত বিষয় নির্ধারণের জন্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। সাংবিধানিক পদের অধিকারী-

i. কর্ম কমিশনের সভাপতি ii. সরকারি কর্মচারী iii. কর্ম কমিশনের সদস্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৩ নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নির্বাচন কমিশনের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাচন কমিশন, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ, ভোটার তালিকা, নির্বাচনী সীমানা।

নির্বাচন কমিশন

আধুনিক গণতন্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশন একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম ভাগে ১১৮ থেকে ১২৬ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা বা গঠন উপস্থাপন করা হলো-

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে। উক্ত বিষয়ে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সভাপতিরূপে কার্য পরিচালনা করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর হবে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না। অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না।

নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ হবে। তবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হবেন না। কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। [অনুচ্ছেদ ১১৮]

নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বা কার্যাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিম্নে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো-

i. রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে।
ii. রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন।
iii. সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন।
iv. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবেন।
v. রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন।
vi. স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন।

vii. নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে, সেরূপ দায়িত্ব পালন করবেন।

পরিশেষে বলা যায়, নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা এবং অপরিহার্যতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি একটি রাষ্ট্রে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগে নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বসহ অন্যান্য বিষয়াবলি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সীমানা নির্ধারণ, নির্বাচনি আচরণ নির্ধারণ এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা নির্বাচন কমিশনের মুখ্য কর্তব্য। একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অনন্য। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নির্বাচন কমিশনের পদের মেয়াদ কত বছর?

ক) ৩ বছর খ) ৮ বছর

গ) ৪ বছর ঘ) ৫ বছর

২। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা খুবই প্রয়োজন। কারণ এতে-

i. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়

ii. যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়

iii. যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৪ এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	এটর্নি জেনারেল, আদালত, বিচারক, রাষ্ট্রপতি, বার কাউন্সিল, স্পিকার।

এটর্নি জেনারেল

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগের ৫ম পরিচ্ছেদে ৬৪ নং অনুচ্ছেদে এটর্নি জেনারেল পদের কথা উল্লেখ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন এটর্নি জেনারেল থাকবেন। এটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা। তিনি আইনগত দিক নিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষে আদালতে বক্তব্য পেশ করেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগদান করবেন। রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত এটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন। বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের ন্যায় মর্যাদা ভোগের অধিকারী হবেন।

এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের প্রধান সরকারি আইন কর্মকর্তা। বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটর্নি-জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নে তুলে ধরা হলো-

i. এটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

ii. এটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।

iii. বাংলাদেশ সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে এটর্নি জেনারেল তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

পরিশেষে বলা যায়, এটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন পরামর্শক। ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এটর্নি জেনারেলের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	এটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলির ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা এটর্নি জেনারেল পদের উল্লেখ রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ লাভ করেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব এটর্নি জেনারেল পালন করে থাকেন। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের পক্ষে এটর্নি জেনারেলের ভূমিকা অনন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এটর্নি জেনারেলের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত হল-

i. সরকারকে আইনী পরামর্শ দেন

ii. সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন

iii. রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। এটর্নি জেনারেল ও সহকারী এটর্নি জেনারেলগণের নিয়োগ নীতি কোন কারণে বিঘ্নিত হয়?

(ক) দলীয় কারণে (খ) যোগ্যতার অভাবে

(গ) রাষ্ট্রপতির প্রভাবে (ঘ) আইনজীবীদের ক্ষমতা বলে

পাঠ-৭.৫ মহাহিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মহা হিসাব-নিরীক্ষক সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মহা হিসাব-নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি পর্যালোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মহাহিসাব নিরীক্ষক, নথি, রসিদ, দলিল, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার, বহি, প্রজাতন্ত্রের হিসাব।

মহা হিসাব-নিরীক্ষক

বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম ভাগে ১২৭ থেকে ১৩২ নং অনুচ্ছেদে মহাহিসাব নিরীক্ষক পদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ১২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অত:পর ''মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত) থাকবেন। তাঁকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন। বাংলাদেশ সংবিধান ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতির আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ হবে।

মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ

সংবিধানের ১২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সেই সময় পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহাহিসাব নিরীক্ষক অপসারিত হবেন না। মহাহিসাব নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষর কর্মাবসানের পর মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অন্য কোন পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য হবেন না।

মহাহিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

মহাহিসাব নিরীক্ষক পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি জাতীয় অর্থের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নিম্নে মহাহিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব বা ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো-

(i) মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্টদান করবেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার বা অন্য প্রকার সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হবেন। [অনুচ্ছেদ- ১২৮(১)]

(ii) আইনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা যেরূপ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সংস্থার হিসাব নিরীক্ষার ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ হিসাব নিরীক্ষা ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করা যাবে। [অনুচ্ছেদ- ১২৮(২)]

(iii) সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, মহাহিসাব নিরীক্ষককে সেরূপ দায়িত্বভার অর্পণ করতে পারবেন। [অনুচ্ছেদ-১২৮(৩)]

(iv) দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মহাহিসাব নিরীক্ষককে অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হবে না। [অনুচ্ছেদ-১২৮(৪)]

(v) রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহাহিসাব নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হবে। [অনুচ্ছেদ-১৩১]

পরিশেষে বলা যায়, মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব নিরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মহা হিসাব নিরীক্ষক সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অনন্য নজির স্থাপন করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মহাহিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধানের অষ্টম ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা, মহা হিসাবর-নিরীক্ষকের দায়িত্ব, মহাহিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদসহ অন্যান্য বিষয়াবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংবিধানের ১৩০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষকের পদ যে কোন কারণে শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি অন্য কোন ব্যক্তিকে মহা হিসাব নিরীক্ষকরূপে দায়িত্বপালনের জন্য নিয়োগদান করতে পারেন। সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হয় কীভাবে?
(ক) রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে (খ) জনগণের দাবি অনুসারে
(গ) প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে (ঘ) রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছানুসারে

২। মহাহিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের-
i. নথি ও হিসাব পরীক্ষা করবেন
ii. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান করবেন
iii. দলিল ও নগদ অর্থ পরীক্ষা করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১, ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন
জনাব আতিকুর রহমান সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রধান আইনজীবী। সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করেন।

১। উদ্দীপকে জনাব আতিকুর কোন পদে নিয়োগ লাভ করেন?
(ক) নির্বাচন কমিশনার (খ) সরকারি কর্মকমিশন (গ) এটর্নি জেনারেল (ঘ) মহাহিসাব নিরীক্ষক

২। উক্ত পদে জনাব আতিকুর রহমান অধিকারী হবেন-
i. মন্ত্রীর ন্যায় মর্যাদার
ii. উপমন্ত্রীর ন্যায় মর্যাদার
iii. সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের ন্যায় মর্যাদা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii, ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্ত দিন-

শাকিলা ও আকাশ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আগামী নির্বাচনে তাঁরা ভোট দিতে চায়। তাই তাঁরা একটি সংস্থার অফিসে যায়। অফিস তাদের একটি করে পরিচয়পত্র প্রদান করে। উক্ত সংস্থা দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩। উদ্দীপকে শাকিলা ও আকাশ যে সংস্থার অফিসে গিয়েছিল-

(ক) সরকারি কর্মকমিশন (খ) সিটি কর্পোরেশন (গ) এটর্নি জেনারেল (ঘ) নির্বাচন কমিশন

৪। উক্ত সংস্থা যেভাবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে-

(ক) সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে (খ) যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগ

(গ) দুর্নীতির তদন্ত করে (ঘ) সরকারের আইনী জটিলতা নিরসনে

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সৈকত পড়াশুনা শেষ করে বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একটি দেশের সরকারি কর্ম কমিশন সম্পর্কে পড়াশুনা করে সে জানতে পারে সরকারি কর্মকমিশন একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, গোপনীয় ও দক্ষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। দেশের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কর্মকমিশনের এসব বৈশিষ্ট্য তাঁর মনে আশার আলো জাগায়।

(ক) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা কে?

(খ) সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝেন?

(গ) সৈকত এর পঠিত সরকারি কর্মকমিশনের সাথে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সাদৃশ্য আছে কী? বাস্তবতার আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) একটি নিরপেক্ষ, সৎ ও দক্ষ প্রশাসন গড়তে উক্ত প্রতিষ্ঠান যে ভূমিকা রাখতে পারে তা বিশ্লেষন করুন।

২। জনাব মারুফ হোসেন সরকারের প্রধান আইনজীবী হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। তিনি রাষ্ট্রের যে কোন আদালতে সরকারের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন। একটি সেমিনারে সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান হিসেবে তিনি যোগদান করেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন, ''সংস্থাটির কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।''

(ক) সরকারি কর্মকমিশনের প্রধানের পদবি কী?

(খ) নির্বাচন কমিশন কিভাবে গঠিত হয়?

(গ) উদ্দীপকের জনাব মারুফ হোসেন এর পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) ''সংস্থাটির কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।'' - বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১। ঘ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ ঃ ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ ঃ ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ ঃ ১। ক ২। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। গ ২। গ ৩। ঘ ৪। ক

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

ইউনিট ৮

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অপরিহার্য। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দশ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ অনেকগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়েছে। তবে সব সময় নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নি। ক্ষমতার পালা বদল নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে সমস্যাটি নির্বাচন ব্যবস্থার মনে হলেও বিশেষজ্ঞগণ মূলত সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার অভাবকেই এ জন্য দায়ী করেন। জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব বলেও তারা মনে করেন। এ ইউনিটে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর নানা দিক এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন, সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি−

- বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রকৃতি জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ইতিহাস বলতে পারবেন।
- এ পর্যন্ত কি কি ধরনের নির্বাচন হয়েছে তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জনমত, সংসদীয় পদ্ধতি, সাংবিধানিক, নিরপেক্ষ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি,

একটি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের মাপকাঠি স্বরূপ। সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনমতের প্রতিফলন ঘটে এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্থা হল নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বিদ্যমান। তাই সরকার গঠনে নির্দিষ্ট সময় পর পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও স্থানীয় উভয় ধরনের নির্বাচনই পরিচালনা করে থাকে।

সাংবিধানিক : বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সাংবিধানিকভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সংবিধানের সপ্তম ভাগে ১১৮ থেকে ১২৬ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের গঠন, কার্যাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ করার জন্য শাসন বিভাগের সার্বক্ষণিক সহযোগিতার বিষয়টিও সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ: বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশন গঠন ও নিয়োগ দিয়ে থাকেন। নির্বাচন কমিশনের মূল দায়িত্ব হল নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিতর্কের আজও অবসান হয় নি। দু'একটি ব্যতীত প্রত্যেকটি কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক গুলোর মতানৈক্য দেখা গেছে।

এককেন্দ্রিক: বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন এককেন্দ্রিক। তবে দেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় এর প্রশাসনিক কার্যালয় রয়েছে। স্থানীয় কার্যালয়গুলো কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সকল পর্যায়ের নির্বাচনেই কেন্দ্রিয় কার্যালয়ের ভূমিকা থাকে।

বাংলাদেশে নির্বাচন :

স্বাধীনতার পর থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশেষ কয়েকটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দশ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া জনগণের ভোটে ৩ বার (১৯৭৮,১৯৮১ ও ১৯৮৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ৩ বার (১৯৭৭, ১৯৮৫ ও ১৯৯১) গণভোটসহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বাংলাদেশে নির্বাচনের প্রকৃতিকে দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। প্রথমত, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন পূর্ব পর্যায় এবং দ্বিতীয়ত, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন পরবর্তী পর্যায়।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন পূর্ব পর্যায় (১৯৭২-১৯৯০)

১৯৭২ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি বেশির ভাগ সময়ই অস্থিতিশীল ছিল। ১৯৭১ থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বেসামরিক সরকার বিদ্যমান ছিল। এ সময়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার টুটি চেপে ধরা হয়। জারি করা হয় সামরিক শাসন। ১৯৭৫ থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসকেরা নিজেদের ইচ্ছামাফিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে। এর ফলে নির্বাচন ব্যবস্থাও সে ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন পরবর্তী পর্যায় (১৯৯১-২০১৬)

১৯৯১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম চারটি নির্বাচন অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪ সালের নির্বাচনটি বিশ্বের অন্যান্য সংসদীয় পদ্ধতির দেশের মতই নির্বাচিত ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে স্থানীয় ও জাতীয় মিলে অনেকগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচনের নজির অনেক। কিন্তু নির্বাচনপূর্ব ও নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের ধারাকে ম্লান করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাই বেশি বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত কোন কোন পর্যায়ের নির্বাচন হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১০ বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে। এছাড়া তিনটি গণভোট, তিনটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়েছে। সামরিক-বেসামরিক আমলের একাধিক নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আবার এদেশে বিশ্বনন্দিত নির্বাচনও হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই প্রতিফলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে কত বছর বয়স্ক নাগরিকদের ভোটদানের অধিকার রয়েছে?

(ক) ১৬ বছর (খ) ১৮ বছর
(গ) ২০ বছর (ঘ) ২২ বছর

২। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যে ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে-

i. ভোটার তালিকা সংশোধন
ii. ব্যালট বাক্স ব্যবহার
iii. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ শাসন ক্ষমতায় কীভাবে অংশগ্রহণ করে?

(ক) প্রত্যক্ষভাবে (খ) পরোক্ষভাবে
(গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে (ঘ) প্রশাসনের সহায়তায়

৪। নির্বাচন একটি-

i. প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া
ii. প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া
iii. জনমত যাচাই প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। বাংলাদেশের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো-

i. সর্বজনীন ভোটাধিকার
ii. গোপন ভোটপদ্ধতি
iii. একক নির্বাচনী এলাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.২ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৩

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- এর গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মুজিবনগর সরকার, সংবিধান, সম্মোহনী নেতৃত্ব, আওয়ামী লীগ, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন। ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পূর্বে মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত মুজিবনগর সরকার কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ জন্য প্রথমেই একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মাত্র নয় মাসের প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। বিচারপতি এম ইদ্রিস কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। তারপর নতুন সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠান:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখেই বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০টি আসনে মোট ১৪টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ নির্বাচনে ১০৮৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

নির্বাচনের ফলাফল:

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	মনোনীত প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	২৯৩	৭৩.২
২.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৭	০১	৬.৫২
৩.	ন্যাপ (মোজাফফর)	২২৪	--	৮.৩৩
৪.	ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	--	৫.৩২
৫.	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	০৮	০১	০.৩৩
৬.	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	০৪	--	০.২৫
৭.	বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	০৩	--	০.০৬
৮.	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)	০২	--	০.১০
৯.	অন্যান্য	১২০	০৫	৫.৫২
	মোট	১০৭৮	৩০০	১০০

সূত্র: বাংলাপিডিয়া, জুলাই-২০১৭।

নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ছিল অজেয়। ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩ টিতেই আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। বিরোধী দলীয় প্রায় সকল প্রার্থীই পরাজিত হয়।

কেবল প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খান বাংলাদেশ জাতীয় লীগের প্রার্থী হিসেবে জয় লাভ করেন। সংরক্ষিত ১৫টি নারী আসনেরও সবকটিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।

নির্বাচনের গুরুত্ব:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে এটাই ধারণা ছিল। হয়েছেও তাই। বঙ্গবন্ধুর অবদান, ব্যক্তি ইমেজ, সম্মোহনী নেতৃত্ব, স্বাধীনতায় নেতৃত্বদান এবং আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ভিত্তি অনেক প্রভাব ফেলেছে। নির্বাচনে কারচুপি ও ব্যালট ছিনতাইয়ের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও এ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তেমন প্রশ্ন ওঠে নি। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে এ নির্বাচন জরুরি ছিল। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘ দিনের প্রাণের দাবি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭৩ সালের নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধার বহি:প্রকাশ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গঠনে এ নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭৩ সালের নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। জনগণ স্বতস্ফুর্তভাবে নির্বাচনে ভোট প্রয়োগ করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে জনগণ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে। বিচ্ছিন্ন কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনার কথা বাদ দিলে, এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তেমন প্রশ্ন ওঠে নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?

(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (খ) ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি (মোজাফফর)

(গ) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় লীগ

২। বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করার কারণ-

i. বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক জনপ্রিয়তা

ii. মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বদান

iii. অন্য কোন রাজনৈতিক দল না থাকায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কোন নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক দাবি বাস্তবরূপ লাভ করে?

(ক) ১৯৭৩ সালের নির্বাচন (খ) ১৯৭৯ সালের নির্বাচন

(গ) ১৯৮৬ সালের নির্বাচন (ঘ) ১৯৮৮ সালের নির্বাচন

পাঠ-৮.৩ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭৯ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈধতার সঙ্কট, দল গঠন, নির্বাচন, সামরিক বাহিনী

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দৃশ্যত কতিপয় বিপদগামী সামরিক কর্মকর্তাদের ঘৃন্য ষড়যন্ত্র ও অংশগ্রহণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। এ নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশের রাজনীতিকেও এক অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সামরিক বাহিনী। অভ্যুত্থানকারীরা খন্দকার মোশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে এবং ১৫ আগস্টই ২২ সদস্যের মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেন। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ তারিখে ১৫ই আগস্টের অভ্যূত্থানকারীদের বিরুদ্ধে একটি সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই সেনা অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ। কিন্তু খালেদ মোশাররফও বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেন নি। মাত্র ৩ দিন পর অর্থাৎ ৭ নভেম্বর সংঘটিত পাল্টা অভ্যুত্থানে প্রাণ হারান খালেদ মোশাররফ। এই ধারাবাহিকতায় ক্ষমতার দখল নিয়ে নেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি বিচারপতি আবু সাদাত সায়েমকে সামনে রেখে ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ নেন। জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক শাসন পরিচালনা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমের জন্য নির্বাচন, দল গঠনসহ নানা কর্মকান্ড শুরু করেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে সংঘটিত সেনা অভ্যুত্থানে প্রাণ হারান জিয়াউর রহমান।

বৈধতার সঙ্কট অতিক্রম চেষ্টার অংশ হিসেবে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যভিত্তিক একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন জিয়াউর রহমান। ক্ষমতার মসনদ থেকে গঠন করা দলটির নামকরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দল গঠনের পরেই ১৭ নভেম্বর রাজনৈতিক কর্মসূচির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন। তিনি এই ধারাবাহিকতাতে ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধী দলগুলোর চাপের মুখে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ পুন:নির্ধারিত হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান:

নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক দল শাসকের ছত্র-ছায়াতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৫০.৯৫ ভাগ ভোট পড়ে। নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক ও উপদল অংশ গ্রহণ করে। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে ২১১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৩০০টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২০৭টি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) ৩৯টি, মুসলিম ডেমোক্রেটিক লীগ ২০টি, জাসদ ৮টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৬ টি আসন লাভ করে (সূত্র: বাংলাপিডিয়া, জুলাই-২০১৭)। সংরক্ষিত আসনের ৩০টি আসনই বিএনপি পায়। বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পরবর্তীতে বিএনপিতে যোগদান করে। ৪টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যার মধ্যে ৩টি আসনে বিএনপি প্রার্থী এবং ১টি আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থী জয় লাভ করে। এই নির্বাচনের মাত্র ছয় মাস পূর্বে গঠিত হওয়া নিজ দল বিএনপি'র প্রার্থীদের জেতানোর জন্য সকল ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন জিয়াউর রহমান।

নির্বাচনের গুরুত্ব:

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘন ঘন পরিবর্তন হতে থাকে। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও বেসামরিকীকরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা কোন সুসংহত রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। বরং জিয়াউর রহমানের এ ধরণের কার্যকলাপ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করে। উল্লেখ্য, জিয়াউর রহমান তাঁর মন্ত্রিসভায় ও প্রশাসনে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাহীন অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচন রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জিয়াউর রহমান কর্তৃক রাজনৈতিক দল গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

জাতির জনকের হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা বৈধ গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে অবৈধ ক্ষমতা দখলদার সেনা শাসকদের হাতে চলে যায়। প্রথম সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ নিতে থাকেন। ক্ষমতায় থেকে দল গঠন এবং একের পর এক নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দখলকৃত ক্ষমতাকে বৈধরূপ দেয়ার চেষ্টা চালান জিয়াউর রহমান। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই প্রচেষ্টারই একটি ধাপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত তারিখে?
(ক) ১৯৭৮ সালের ৫ জানুয়ারি (খ) ১৯৮৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি
(গ) ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ১৯৮১ সালের ৭ মার্চ

২। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ এর অভ্যূত্থানে কে নেতৃত্ব দেন?
(ক) মেজর ডালিম (খ) খালেদ মোশাররফ
(গ) জিয়াউর রহমান (ঘ) কর্ণেল তাহের

৩। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে কতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে?
(ক) ১৫১৪ জন (খ) ২,০০০ জন
(গ) ২১১৫ জন (ঘ) ২৩৫২ জন

পাঠ-৮.৪ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৬

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৮৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- ১৯৮৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বেসমারিকীকরণ, বৈধতার সঙ্কট, দল গঠন, নির্বাচন, জালিয়াতি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর দেশে নেতৃত্বের চরম সংকট তৈরি হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রথম সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান এক সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন। এই ঘটনার এক বছরের কম সময়ের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। অন্যান্য সামরিক শাসনের মত এরশাদও বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমের জন্য বেসমারিককরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। কিন্তু তিনি নানাবিধ আন্দোলন সংগ্রামের সম্মুখীন হন। প্রথমে তিনি বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন করেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পৌরসভা ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দল গঠন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনার অনুমতি দেন এরশাদ। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাধারণ জনগণ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজ অবস্থানের ম্যান্ডেড নেবার জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। এই গণভোটে সব ধরনের কারচুপি করে ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা ভোট লাভ করেন এরশাদ।

তাঁর পূর্বসূরী জিয়ার মতই দল গঠন ও নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। সিংহ ভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে পূর্বঘোষিত সময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেননি। কিন্তু স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে একটা আবহ তৈরি করায় উদ্যোগী হন। ১৯৮৫ সালের মে মাসে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান:

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে তিন দফা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হয়। নির্বাচনের তারিখ প্রথমে ঘোষিত হয় ১৯৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ ছোট-বড় ২৮টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে ৩০০ আসনের জন্য ২১৫৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৫৩ জন। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন। এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটের নির্বাচন বর্জন।

নির্বাচনের ফলাফল:

নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩ আসন পেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কারচুপি, মিডিয়া ক্যুসহ বিভিন্ন রকমের অভিযোগ তোলে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৬.১৫ ভাগ ভোট পেয়ে ৭৬ টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮৬ এর নির্বাচনকে প্রহসন ও ভোট ডাকাতির নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেন।

নির্বাচন মূল্যায়ন :

অবৈধভাবে ক্ষমতার দখলদার এরশাদের পক্ষে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। বৈধতার সঙ্কট অতিক্রম এবং দেশজুড়ে অনুগ্রহভোগী তৈরি করার লক্ষ্যে **১৯৮৬** সালের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন এরশাদ।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৮৬ সালের নির্বাচনের পটভূমি তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৮২ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর থেকেই ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এরশাদ। তবে প্রথম থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো এর বিরোধীতায় আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু সামরিক জান্তা এ আন্দোলনের মধ্যেই **১৯৮৬** সালের সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করে। কারচুপি ও সহিংসতার মাধ্যমে এরশাদের জাতীয় প্যার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জাতীয় পার্টি সরকার গঠন করে কিন্তু দেশের পরিস্থিতি তাতে মোটেও শান্ত হয় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **১৯৮৬** সালের সাধারণ নির্বাচন কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) ৮ এপ্রিল (খ) ৭ মে

(গ) ২২ সেপ্টেম্বর (ঘ) **১৮** নভেম্বর

২। **১৯৮৬** সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে-

i. আওয়ামী লীগ

ii. বিএনপি

iii. জামায়াতে ইসলামী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য এরশাদ কাকে অনুসরণ করেন?

ক) শেরে বাংলা খ) মাওলানা ভাসানী

গ) বঙ্গবন্ধু ঘ) জিয়াউর রহমান

পাঠ-৮.৫ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৮৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- ১৯৮৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বেসামরিকীকরণ, আন্দোলন, বয়কট, ভোটারবিহীন।

১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও এরশাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন অব্যাহত থাকে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে এরশাদের পদত্যাগের দাবি জোরালো হতে থাকে।

১৯৮৭ সালের নভেম্বরে বিরোধী দলগুলো জাতীয় সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করলে, এরশাদ ২৭ নভেম্বর দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পরে তা পিছিয়ে ৩ মার্চ করা হয়। বিদ্যমান অবস্থায় এই নির্বাচনের প্রতি সিংহভাগ রাজনৈতিক দলের কোন সমর্থন ছিল না। তাই তারা নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আন্দোলন দুর্বল করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ও বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়াকে অন্তরীণ করা হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান:

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বয়কট করায় এ নির্বাচনে জনগণের আগ্রহ ছিল না। মাত্র ৯টি নাম সর্বস্ব দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এতে জাতীয় পার্টি ২৫১টি, আ. স. ম. আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন সরকার অনুগত সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯টি আসন লাভ করে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৩টি এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করে। এ নির্বাচনে মাত্র ৯৮৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ভোটার উপস্থিতির হার ছিল ৫৪.৯৩%।

নির্বাচন মূল্যায়ন:

স্বৈরশাসক এরশাদ যেকোন উপায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিল। তাই দু বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আবার জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করে। কিন্তু এ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অংশ গ্রহণ ১৯৮৬ সালের নির্বাচন থেকে কম ছিল। তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় সাজানো একটা সমন্বিত প্রতিন্দ্বন্দ্বী জোট তৈরি করা হয়। বিরোধী দলবিহীন এক তরফাভাবে জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৮৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল উপস্থাপন করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৮৬ সালের নির্বাচনের পরেও রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা চলতে থাকে। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে বিরোধী দলগুলো সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। এরশাদ মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক শাসনের অধীন অন্যান্য নির্বাচনের মতো এ নির্বাচনেও ভোটারদের অংশগ্রহণ খুব কম ছিল। বিরোধী দলবিহীন নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং সরকার গঠন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টি কতটি আসন লাভ করে?

(ক) ১৩৪ টি (খ) ১৬৮ টি

(গ) ২৫১ টি (ঘ) ২৬৮ টি

২। ১৯৮৮ সালের নির্বাচন প্রমাণ করে-

i. এ দেশের মানুষ গণতন্ত্রকে ভালবাসে

ii. এ দেশের মানুষ স্বৈরাচারকে পছন্দ করে না

iii. এ দেশের মানুষ সামরিক শাসনকে উৎসাহিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কোন দু'টি সংসদ নির্বাচন মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

(ক) ১ম ও ২য় (খ) ২য় ও ৩য়

(গ) ৩য় ও ৪র্থ (ঘ) ১ম ও ৮ম

পাঠ-৮.৬ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনে এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণআন্দোলন, স্বৈরাচার পতন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রধান উপদেষ্টা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তীব্র গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন হয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর নিকট উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমেদ পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ করা হয়। উপ-রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ এর নিকট রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করেন। এরশাদ এর পদত্যাগের পর উপ-রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিন জোট কর্তৃক প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা অনুযায়ী বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন।

রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেন, তাঁর মূল কাজ হবে অতি শীঘ্র জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। রাষ্ট্র পরিচালনা ও নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য তিন জোট কর্তৃক মনোনীত ৩১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে ১৭ জনকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন তিনি। ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ হিসেবে ঠিক করা হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান :

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সর্বমোট ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে ৩০০টি আসনে ২৭৮৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৫২.৩৭ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছেন।

নির্বাচনের ফলাফল:

১৯৯১ সালের নির্বাচনের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল-

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৪০	৩০.৮১
২.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৮৮	৩০.০৮
৩.	জাতীয় পার্টি	৩৫	১১.৯২
৪.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৮	১২.১৩
৫.	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৫	১.৮১
৬.	কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি)	৫	১.৯১

৭.	গণতন্ত্রী পার্টি	১	০.৪৫
৮.	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	০.৩৬
৯.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	১	০.২৫
১০.	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	১	০.১৯
১১..	অন্যান্য	৩	৪.৩৯
১২.	স্বতন্ত্র	০	০.০০
	মোট	৩০০	

সূত্রঃ বাংলাপিডিয়া, জুলাই-২০১৭।

নির্বাচন মূল্যায়নঃ

এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতি অন্ধকার থেকে আলোতে পদার্পণ করে। বাংলাদেশে সামরিক শাসনামলের নির্বাচনগুলোতে ভোট জালিয়াতি, সন্ত্রাস, কেন্দ্র দখল মুখ্য হয়ে উঠেছিল । সেদিক থেকে ১৯৯১ সালের নির্বাচন একবারেই ব্যতিক্রম ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ইতিহাসের প্রথম নির্বাচন দেশে-বিদেশের সংবাদ মাধ্যমেও প্রশংসিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন কি কারণে অনন্য ছিল?

সারসংক্ষেপ

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির ব্যাপক আন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকার ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসের শুরুতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সে সাথে আন্দোলনের শর্ত অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। ১৯৯১ সালের ২ মার্চ তারিখে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিরোধী দল হিসেবে সংসদে যায়। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বস্তি ফিরে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৯১ সালের নির্বাচন কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) ১২ জানুয়ারি (খ) ২৭ ফেব্রুয়ারি

(গ) ১৮ মার্চ (ঘ) ২০ এপ্রিল

২। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

i. নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়

ii. সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি প্রশ্নবিদ্ধ হয়

iii. ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ কতটি আসন লাভ করে?

(ক) ৫০টি (খ) ৬৪টি

(গ) ৭৯টি (ঘ) ৮৮টি

পাঠ-৮.৭ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬ (জুন)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল ও পরিসংখ্যান জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা, স্থায়ীকরণ, ত্রয়োদশ সংশোধনী, আওয়ামী লীগ

পঞ্চম সংসদের মেয়াদ শেষ হবার কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের তারিখ হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু সিংহভাগ রাজনৈতিক দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে এই নির্বাচন বয়কট করে। তবু বেগম খালেদা জিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভোটার ও প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বনিম্ন ভোটার উপস্থিতির এ নির্বাচন জনগণ মেনে নেয় নি। তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের মুখে বিএনপি সরকার সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাস করে। বিচারপতি হাবিবুর রহমান এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনয়ন পান। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্বই ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। সেজন্য তাঁরা নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের প্রতি দৃষ্টি দেন। ১৯৯৬ সালের ৮ এপ্রিল সাবেক আমলা মোহাম্মদ আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। নির্বাচন কমিশন ১২ জুন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন।

নির্বাচন:

১৯৯৬ সালের ১২ জুন একটি সর্বজন গ্রাহ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ৮১টি রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে প্রার্থী ছিল ২৫৭৪ জন। যার মধ্যে ২৭৯ জন ছিল স্বতন্ত্র প্রার্থী, নারী প্রার্থী ছিল ৩৬ জন। এই নির্বাচনে রেকর্ড সংখ্যক ৭৩.৬১ ভাগ ভোটার ভোটাধিকার প্রদান করেন। মোট নির্বাচক ছিল ৫,৬৭,১৬,৯৩৫ জন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রায় ৪ লক্ষ পুলিশ, বিডিআর ও আনসার নিয়োজিত ছিল। ১৯৯৬ এর জুনের নির্বাচনে ভোটার যেমন বেশি ছিল তেমনি দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকও অতীতের যেকোন নির্বাচনের চেয়ে বেশি ছিল।

নির্বাচনের ফলাফল:

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪৬	৩৭.৪৪%
২.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১১৬	৩৩.৬০%
৩.	জাতীয় পার্টি	৩২	১৬.৪০%
৪.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৩	৮.৬১%
৫.	ইসলামী ঐক্য জোট	১	১.০৯%
৬.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	১	০.২৩%
৭.	স্বতন্ত্র	১	১.০৬%
৮.	অন্যান্য	০	০.০০%
	মোট	৩০০	

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০১৭।

মূল্যায়ন :

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নানা কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বহহ করে। **১৯৯১** সালের পঞ্চম নির্বাচনের মত এ নির্বাচটিও সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হিসেবে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ দীর্ঘ **২১** বছর পর পুনরায় সরকার গঠন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৯৬ সালের নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল কতটি আসন পেয়েছিল?

সারসংক্ষেপ

বিরোধী দলগুলোর প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে একদলীয় ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে স্থায়ীকরণে বাধ্য হয় বিএনপি। এই ধারাবাহিকতাতে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে **১৯৭৫** সালে সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাত হওয়া বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ **২১** বছর পরে পুনরায় সরকার গঠন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ কত বছর পর ক্ষমতাসীন হয়?

(ক) ১০ বছর (খ) ১৫ বছর

(গ) ২১ বছর (ঘ) ২৫ বছর

২। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসন পায়?

(ক) ১৪৬টি (খ) ১৫০টি

(গ) ২০০টি (ঘ) ১৫৮টি

৩। ১৯৯৬ (জুন) সালের নির্বাচনের তাৎপর্য-

i. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রধান দল আওয়ামী লীগের সরকার গঠন

ii. অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন

iii. আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত নির্বাচন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৮ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	চার দলীয় জোট, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সংখ্যালঘু আক্রান্ত

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০১ সালের ১৫ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক বিচারপতি লতিফুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হয়। লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ হিসেবে ঘোষণা করে। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসনিক বিভিন্ন রদবদল ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলতে থাকে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান :

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ ২০০১ সালের ১৯ আগস্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষণা মোতাবেক, ২৯ আগস্ট মনোনয়নপত্র দাখিল, ৩০-৩১ আগস্ট মনোনয়নপত্র বাছাই, ৬ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ভোট গ্রহণের তারিখ ১ অক্টোবর। নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৫৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। অন্যদিকে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) এবং ইসলামী ঐক্যজোট এই ৪ দল জোট হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ৩০০ আসনে সর্বমোট প্রার্থী ছিল ১৯০৩ জন যার মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৯৪ জন।

নির্বাচনে ৭৫.৫৯ শতাংশ ভোট পড়ে। মোট ২৯,৯৭৮টি ভোট কেন্দ্রে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ, আনসার, বিডিআর এবং সামরিক বাহিনীর ৫৫,০০০ সদস্য মোতায়েন ছিল।

নির্বাচনের ফলাফল :

নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত তথ্য মতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট সর্বাধিক ২১৬টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে বিএনপি পায় ১৯৩টি, জামায়াতে ইসলামী ১৭টি, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) ৪টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট ২টি আসন। নির্বাচনের প্রধান অপর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ মাত্র ৬২টি আসন লাভ করে।

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৯৩	৪০.৯৭
২.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬২	৪০.১৩
৩.	ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৪	৭.২৫
৪.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	১৭	৪.২৮
৫.	বাংলাদেম জাতীয় পার্টি (এন-এফ)	০৪	১.১২
৬.	ইসলামী ঐক্য জোট	০২	০.৬৮
৭.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	০১	০.৪৭

৮.	জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	০১	০.৪৪
৯.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	০	০.২১
১০.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	০	০.১০
১১.	স্বতন্ত্র	০৬	৪.০৬
	মোট	৩০০	

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০১৭ ।

নির্বাচন মূল্যায়ন:

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনে কারচুপি ও দলীয় কর্মীদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়ার অভিযোগ ওঠে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদেরকে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়ার অভিযোগও আসে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০১ সালের নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিয়ে বেশ বির্তক দেখা দেয়। এছাড়াও নির্বাচন পরবর্তী কয়েক দিন দেশের নানা স্থানে নির্বাচনে বিজয়ী চারদলীয় জোটের লোকজন পরজিত দলের নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের উপর নজির বিহীন হামলা চালায়। এসব সহিংসতার বিরুদ্ধে লক্ষণীয় ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় সরকার।

শিক্ষার্থীর কাজ	২০০১ সালের নির্বাচনী কর্মকান্ড বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি কম গ্রহণযোগ্যতা পায়। বিশেষ করে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আনীত অভিযোগ ও নির্বাচন পরবর্তীতে সংখ্যালঘুদের উপরে ভয়াবহ হামলার ঘটনায় এই সরকার সমালোচনায় পড়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ২০০১ সালের নির্বাচনে কতটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে?

(ক) ৫০টি (খ) ৫২টি
(গ) ৫৪টি (ঘ) ৬৪টি

২। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক জোট/দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?

(ক) আওয়ামী লীগ (খ) জাতীয় পার্টি
(গ) ৪ দলীয় ঐক্যজোট (ঘ) জাকের পার্টি

৩। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর যা ঘটে-

(ক) সংখ্যালঘুদের উপর ভয়াবহ হামলা (খ) সংখ্যালঘুদেও নিরাপত্তা বৃদ্ধি
(গ) আওয়ামী লীগের সরকার গঠন (ঘ) নির্বাচনের গুণগান

পাঠ-৮.৯ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জরুরি অবস্থা, সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক, মাইনাস টু ফর্মূলা, নির্বাচন

বেগম খালেদা জিয়া ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রধামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মানুযায়ী পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন তা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। তৎকালীন বিরোধীদলগুলো অভিযোগ করে যে বিএনপির পছন্দসই বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের অবসরের বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ করা হয়। এর ফলে বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। তাছাড়া হাইকোর্টের বিতর্কিত বিচারপতি এম এ আজিজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। এ দুটি বিষয়ে আওয়ামী লীগসহ সিংহভাগ রাজনৈতিক দলের আপত্তি ছিল। বিচারপতি কে এম হাসানকে নিয়ে আপত্তির মুখে রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নিজেকে প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা করেন। ৩১ অক্টোবর তিনি ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ বিএনপির নির্দেশে একতরফাভাবে কাজ করছিলেন এমন অভিযোগে ৪ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। ভোটার তালিকা প্রণয়নে এম এ আজিজের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উঠে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটসহ বিরোধী দলের হরতাল অবরোধের মুখে এম এ আজিজ পদত্যাগ করেন। নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহফুজুর রহমান ২২ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন ধার্য করেন। কিন্তু মহাজোটসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এই দাবির সাথে বিদেশি কূটনীতিকগণও সব দলের অংশ গ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাগিদ দিতে থাকে। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিএনপিও ২২ জানুয়ারি তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনড় অবস্থান নেয়। ৪ দলীয় জোট ও মহাজোটের এই মুখোমুখি অবস্থায় দেশ সঙ্কটময় পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হয়। সমগ্র দেশে একটা থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে। ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১২ জানুয়ারি এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমেদকে নতুন প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠান:

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৩৮ টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে এবং ভোট প্রদানের হার ছিল ৮৭.১৬ ভাগ। এ নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী ছিল ১৫৬৭ জন। যার মধ্যে ৫৯ জন মহিলা প্রার্থী ছিলেন।

নির্বাচনের ফলাফল:

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩০	৪৮.০৪%
২.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০	৩২.৫০%
৩.	জাতীয় পার্টি	২৭	৭.০৪%
৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৩	০.৭২%
৫.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২	৪.৭০%

৬.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	২	০.৩৭%
৭.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	০.২৭%
৮.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১	০.২৫%
৯.	স্বতন্ত্র	৪	২.৯৪%
১০.	অন্যান্য	০	২.২৫%
১১.	না ভোট	--	০.৫৫%
	মোট	৩০০	১০০%

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০১৭।

নির্বাচন মূল্যায়নঃ

২০০৮ সালের নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুন:প্রতিষ্ঠায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিকল্প উদ্ভাবনের বিষয়টিও রাজনৈতিক দলের চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কেননা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত ৯০ দিনের জায়গায় নানা কৌশল অবলম্বন করে প্রায় দুই বছর ক্ষমতায় থাকে। এই আমলেই দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করার লক্ষ্যে কথিত 'মাইনাস টু ফর্মূলা' বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	'মাইনাস টু ফর্মূলা' কী?

সারসংক্ষেপ

২০০৮ সালের নির্বাচনটি বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রর্বতনের সংগ্রামে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বস্তুত, নানা কৌশল অবলম্বন করে প্রায় দুই বছর যাবৎ ক্ষমতা দখলে রাখা এবং মাইনাস টু ফর্মূলা'র মাধ্যমে দেশকে রাজনীতিশূন্য করার চেষ্টা করেন। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাটি বিতর্কিত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে এসে রাজনৈতিক দলগুলোর চাপের মুখে নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-

(ক) ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ (খ) ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮
(গ) ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৮ (ঘ) ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৮

২। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল/জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?

(ক) চার দলীয় ঐক্যজোট (খ) মহাজোট
(গ) এল.ডি.পি (ঘ) স্বতন্ত্র

৩। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল-

i. 'না' ভোটের প্রবর্তন
ii. গণতন্ত্রের উত্তরণের পথিকৃৎ
iii. তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিহীন নির্বাচন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.১০ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারবেন।
- এ নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিরোধী দলীয় আন্দোলন, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, সহিংস

২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১৮ দলীয় জোট এর প্রতিবাদ জানায় এবং আন্দোলন গড়ে তোলে। পশ্চিমা বিশ্বের কূটনীতিকগণ সর্বাধিক রাজনৈতিক দলের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশেষ করে জাতিসংঘের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত তারানকো দুইবার বাংলাদেশে আসেন। তিনি প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপের ব্যবস্থা করেন। রাজনৈতিক দল দুটি সমঝোতায় পৌছানোর কথা বললেও শেষ পর্যন্ত কোন সমঝোতা হয় নি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার স্বাভাবিক সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে। ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি। ১৮ দলীয় জোট যেকোন মূল্যে নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। সারা দেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। জান-মাল, ঘরবাড়ি ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান:

বিরোধীদের নির্বাচন বাতিলের সব ধরনের চেষ্টার মধ্যেই ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলি অংশ নেয় নি। বিরোধী দলীয় সহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার আবহ না থাকায় অন্যান্য বারের তুলনায় এ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি অত্যন্ত কম ছিল। ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১৫৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিন্দ্বন্দীতায় নির্বাচনে নির্বাচিত হয়।

নির্বাচনের ফলাফল:

নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ-

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	আসন সংখ্যা	ভোটের শতকরা হার
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩৪	৭২.১৪%
২.	জাতীয় পার্টি	৩৪	৭.০০%
৩.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	৬	২.১০%
৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৫	১-১৯%
৫.	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	২	১.০৪%
৬.	জাতীয় পার্টি-জেপি	২	০.৭৩%
৭.	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	১	০.৬৩%
৮.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০	০.০৪%
৯.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	০	০.০৩%
১০.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	০	০.০২%

১১.	গণফ্রন্ট	০	০.০২%
১২.	গণতন্ত্রী পার্টি	০	০.০১%
১৩.	স্বতন্ত্র	১৬	১৫.০৬%
	মোট	৩০০	১০০%

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ২০১৭।

নির্বাচন মূল্যায়নঃ

২০১৪ সালের নির্বাচন অনেক বির্তকের জন্ম দিয়েছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি সাহসী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মতানৈক্যের কারণে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন ও পদ্ধতি উভয়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বাংলাদেশ সফরত ব্রিটিশ উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এ্যালান ডানকান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচন সাংবিধানিক হলেও অস্বাভাবিক।

অতএব বলা যায়, বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে এখনও সংশয় কাটেনি। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও বাংলাদেশের জনগণ এখনও একটি আস্থাশীল নির্বাচনী ব্যবস্থা পায় নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন দলগুলোর ব্যাপক সহিংসতার মধ্যে ৫ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। একদিকে ব্যাপক সহিংসতা ও অন্যদিকে বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে এ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত কম। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে সরকার গঠন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত তারিখে?

(ক) ১ জানুয়ারি, ২০১৪ (খ) ১০ জানুয়ারি, ২০১৪

(গ) ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ (ঘ) ৭ জানুয়ারি, ২০১৪

২। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কতটি আসন লাভ করে?

(ক) ২৩০টি (খ) ২৩৪টি

(গ) ২৩৬টি (ঘ) ২৩৮টি

৩। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-

i. ১৫৪ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়

ii. বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে

iii. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৩২টি আসন লাভ করে-

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.১১ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, ভোটার তালিকা, মত বিনিময়, সমন্বয়

সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হল নির্বাচন কমিশন। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচনী সংস্থা সর্বেসবা। বাংলাদেশের সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ এর বিকল্প নেই। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন স্থানীয় ও জাতীয় উভয় ধরনের নির্বাচনই করে থাকে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সীমানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ, জনসচেতনতা তৈরিসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করে থাকে। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার এ জন্য নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে-

সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়নঃ

ভোটার হল নির্বাচনের প্রাণ। ভোটার তালিকাতে সঠিকভাবে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের অন্তর্ভূক্তি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনও এ বিষয়ে ইতোপূর্বে সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। ২০০৭ সালে ড. এ টি এম শামসূল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে সঠিক একটি তালিকা প্রণয়ন করেছিল। ফলে ২০০৮ সালে একটি শান্তিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতির একটি নির্বাচন হয়।

রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময়ঃ

রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময় করে সুষ্ঠু নির্বাচনের আবহ তৈরি করা নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সকল মত ও পথের দলগুলির আস্থাভাজন হতে পারার মধ্যেই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা অনেকাংশে নিহিত থাকে।

দক্ষ কর্মী তৈরিঃ

নির্বাচন কমিশনের পরিসর অনেক বৃহৎ। কিন্তু প্রায়শই দক্ষ জনবলের অভাবে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ সঠিক সময়ে যথাযথভাবে হয় না। ভোটাররা নানাভাবে হয়রানির স্বীকার হয়। তাছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি, আইন-কানুন সম্পর্কেও হালনাগাদ তথ্য অনেকের জানা থাকে না।

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যথাযথ সমন্বয়ঃ

সাংবিধানিকভাবেই শাসন বিভাগ নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করবে বলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই নানা কারণে স্থানীয় প্রশাসন অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কোনঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে নির্বাচনের সময় একটি সমন্বয়হীনতার অভাব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচন কার্যালয়কে ক্ষমতা অর্পণ করা হলে সমন্বয় সুষ্ঠু হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

ভোটাদের সাথে মত বিনিময়ঃ

সচেতন ভোটার নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। নির্বাচন কমিশন নিয়মিতভাবে সভা, সেমিনার, শোভাযাত্রা করে ভোটারদেরকে সচেতন করতে পারে। এর ফলে সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে ভোটাররা উৎসাহিত হয়।

নির্বাচনে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগঃ

নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। বাংলাদেশে ২০০৭ সালে ভোটার তালিকা প্রণয়নে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সঠিকভাবে একটি ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। নির্বাচনের সময়ও নির্বাচন কমিশন আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই অন লাইনে ভোটিং ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন এর ব্যবহার হচ্ছে।

তাই বলা যায়, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকার অনেক সময়ই নির্বাচন প্রভাবিত করে। তবে নির্বাচন কমিশন তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচন অনেকটাই সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

নির্বাচন কমিশন হচ্ছে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সাংবিধানিকবাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যেকোন ধরণের হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করা উচিত। বাংলাদেশের মত একটি উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো-

i. নির্বাচন অনুষ্ঠান করা
ii. নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারন
iii. ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) ii ও iii (খ) i ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) i ও iii

২। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে যে ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে-

i. ভোটার তালিকা বিধিমালা সংশোধন
ii. চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
iii. রাজনৈতিক দলের সাতে মত বিনিময়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii (ঘ) iii

পাঠ-৮.১২ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের ভূমিকা জানতে পারবে।
- সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নাগরিকের ভূমিকা বলতে পারবে।

মুখ্য শব্দ	হস্তক্ষেপ, জনবল, জনসচেতনতা, বাজেট, নাগরিক দায়িত্ব, প্রশিক্ষণ

সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন, সাংবিধানিক ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ নির্বাচন কমিশনকে কাঙ্খিত সহযোগিতা করতে বাধ্য। তাছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো বৃহৎ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে কঠিন। নির্বাচনের প্রাণ হল ভোটার অর্থাৎ জনগণ। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জনগণের সহযোগিতাও অপরিহার্য। নিম্নে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা আলোচনা করা হল।

হস্তক্ষেপ না করা: বাংলাদেশে বিতর্কিত নির্বাচনের মূল কারণ হল সরকারের হস্তক্ষেপ। সরকার অনেক সময় বিভিন্নভাবে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচন কমিশন গঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মত বিষয়গুলোতে সরকারের হস্তক্ষেপ এর নজির দেখা যায়। এসবের ফলে নির্বাচন কমিশনের প্রতি জন আস্থার অভাব সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে দেখা যায়, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারে। তাই প্রত্যেক ক্ষমতাসীন দলের উচিত নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।

পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ: নির্বাচন কমিশনে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। জনবল ঘাটতির কারণে নির্বাচন কমিশনকে বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলো পরিচালনা করতে বেগ পেতে হয়।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ: বাংলাদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক আইন ও বিধি রয়েছে। কিন্তু অনেক সময়ই এর যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায় না। এর একটি কারণ তা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ ব্যাপারে সচেতন না হলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এককভাবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো অসম্ভব।

নির্বাচনে সামরিক বাহিনী মোতায়েন না করা: সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের গর্ব। তাঁদেরকে বেসামারিক প্রয়োজনে যত কম নিয়োগ করা যাবে তাদের পেশাদারিত্ব তত মজবুত হবে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে পরিচালনা করতে পারলে নির্বাচনী শৃঙ্খলা বজায় অসাধ্য নয়।

নাগরিকের ভূমিকা

সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নাগরিকদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরাই প্রার্থী তাঁরাই ভোটার। ফলে নাগরিকগণ যদি সচেতন ও সৎভাবে দায়িত্ব পালন করে তবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সহজ হয়। নিচে এ ব্যাপারে নাগরিকদের ভূমিকা আলোচনা করা হল-

ভোটার তালিকা প্রণয়নে কমিশনকে সহযোগিতা: নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে বিজ্ঞপ্তি ও মাইকে ঘোষণা দিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা রাখে। নিকটবর্তী নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ভোটার নিবন্ধনের কাজ হয়ে থাকে। তাই ১৮ বা তার বেশি বয়সের সকল নাগরিকের উচিত সেখানে গিয়ে ভোটার নিবন্ধন করা।

নির্বাচনী আচরণবিধি অনুসরণ করা: প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ সাধারণ জনগণ নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চললে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী মাঠে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব খাটিয়ে আচরণবিধি ভঙ্গ করে। যেমন অর্থ ও

পেশী শক্তির ব্যবহার, যততত্র পোস্টার লাগানো, যখন তখন মাইকে প্রচার, অবৈধ অস্ত্র বহন ছাড়াও নানাভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়ে থাকে। সচেতন নাগরিকদের উচিৎ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

বিবেকবান ভোটার হওয়া: সচেতন ও বিবেকবান ভোটার দেশের সম্পদ। কেননা তাঁদের মাধ্যমে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া সম্ভব। যোগ্য প্রতিনিধি দেশ ও জনগণের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। অসৎ পন্থা বা প্রলোভনে সহায়তাকারী ভোটার কখনো যোগ্য প্রার্থী বাছাই করতে পারে না। এ ধরনের অসচেতন ভোটারের কারণে দেশের ক্ষতি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য সরকার ও নাগরিক উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একদিকে সরকার নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি সহযোগিতা করতে পারে। এক্ষেত্রে সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপকে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যদিকে, জনগণ সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অতন্ত্রী প্রহরী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নাগরিকগণ নির্বাচন কমিশনকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে?

সারসংক্ষেপ

নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। কিন্তু সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দল ও সরকারের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতা করেছিল বলেই ১৯৯১, ১৯৯৬ (জুন), ২০০১ এবং ২০০৮ সালের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিল। অন্যদিকে তাদের অসহযোগিতার কারণে ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯৬ (ফেব্রুয়ারি) ও ২০১৪ সালের নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল, জনগণ, সরকার এবং নির্বাচন কমিশন এ সবগুলো মাধ্যমের বলিষ্ঠ ভূমিকা নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোনটির গুরুত্ব অপরিসীম?
(ক) আমলাদের (খ) সরকারের
(গ) নাগরিকের (ঘ) রাজনৈতিক দলের

২। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আরো গতিশীল হয়-
i. সরকারের কার্যকলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলে
ii. নির্বাচনের সকল দলের অংশগ্রহণের ফলে
iii. নির্বাচন বর্জন করার ফলে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। নির্বাচনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন কেন?
(ক) রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য (খ) সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য
(গ) ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করার জন্য (ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

'ক' নামক রাষ্ট্রের ৫ম নির্বাচনটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকরা গোপনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।

১। অনুচ্ছেদে কী ধরণের ভোটাধিকারের চিত্র ফুটে উঠেছে?

(ক) বিশেষ ভোটাধিকার (খ) যৌথ ভোটাধিকার

(গ) সরল ভোটাধিকার (ঘ) সার্বজনীন ভোটাধিকার

২। উদ্দীপকের সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে-

i. গোপন ভোটদান

ii. সার্বজনীন ভোটাধিকার

iii. স্তরভিত্তিক ভোটদান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii ও iii (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

৩। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হল-

(ক) আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসন পায়

(খ) সিপিবি ৪টি আসন পায়

(গ) বিএনপি ৩০টি আসন পায়

(ঘ) জাতীয় পার্টি ১৫টি আসন পায়

৪। ২০০৬ সালের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়-

i. আওয়ামী লীগ

ii. বিএনপি

iii. সিপিবি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের একটি অঞ্চলের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ভীত হয়ে নির্বাচনে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

৫। উল্লেখিত নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বক্তব্যটি প্রযোজ্য?

(ক) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন (খ) সুষ্ঠু নির্বাচনি পরিবেশের অনুপস্থিতি

(গ) স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন (ঘ) দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন

৬। এ ধরণের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ পেতে হলে-

i. শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে

ii. সকল নাগরিকদের সচেতন হতে হবে

iii. রাজনৈতিক দলগুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। গণতন্ত্র অর্থই হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপর। নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকগণ পছন্দমত প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য ভোট প্রদান করেন।

(ক) নির্বাচন কী?

(খ) বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(গ) নির্বাচনে নাগরিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) নির্বাচনে নাগরিকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

২। 'ক' নামক রাষ্ট্রের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার রয়েছে। কিন্তু এ রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নির্বাচন সম্পর্কে উদাসীন। বেশিরভাগ নাগরিক নির্বাচনের প্রচারণার দিকে খেয়াল রাখে না। এছাড়া তারা প্রার্থী সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হতে আগ্রহী নয়।

(ক) বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?

(খ) বাংলাদেশ ভোটার হতে গেলে একজন নাগরিকের কী কী যোগ্যতা থাকতে হয়?

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার পার্থক্য বর্ণনা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত রাষ্ট্রে নাগরিকদের নির্বাচন সম্পর্কে অনীহার কী কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৩। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে গণতন্ত্র বার বার হোঁচট খেয়েছে। ১৯৭৫ সালের সামরিক শাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর বাংলাদেশের গণতন্ত্র সামরিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে পর পর তিনটি নির্বাচন সুষ্ঠু হলেও ২০০৬ সালে আবার জটিলতা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছর ক্ষমতা দখলে রাখে।

(ক) ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় কে ক্ষমতায় ছিলেন?

(খ) তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাব বার পিছিয়ে যায় কেন?

(গ) ২০০৬ সালে কেন দুইটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন জটিলতার একটি বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১১ ঃ ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১২ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। খ ৬। ঘ

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি ও বিভিন্ন সংস্থা

ইউনিট ৯

আধুনিক বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। নিজের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। প্রতিটি রাষ্ট্র এখন পরস্পর নির্ভরশীল। প্রতিটি রাষ্ট্র নিজস্ব জাতীয় লক্ষ্য, নীতি ও স্বার্থ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকে। বৈদেশিক নীতি হল সেই স্বার্থ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি ''সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'' - নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য ইউনিটে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -১ : বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি
পাঠ -২ : সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্য
পাঠ -৩ : সার্ক ও বাংলাদেশ
পাঠ -৪ : ওআইসি: গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ -৫ : ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ -৬ : ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ
পাঠ -৭ : কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ
পাঠ -৮ : জাতিসংঘ
পাঠ -৯ : জাতিসংঘের গঠন ও উদ্দেশ্য
পাঠ -১০ : জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

পাঠ-৯.১ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈদেশিক নীতি, জাতীয় নীতি, সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরস্ত্রীকরণ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ।

সাধারণভাবে বৈদেশিক নীতি হল কোন দেশের জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সর্বোপরি বিশ্বে সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টির জন্য বৈদেশিক নীতি রাষ্ট্রীয় নীতির অনিবার্য অংশ।

জেমস রোজনাও এ প্রসঙ্গে বলেন, ''বৈদেশিক নীতি হল আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কোন রাষ্ট্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, যার মাধ্যমে সে রাষ্ট্র বিশেষ কোন স্বার্থ অর্জনে বদ্ধপরিকর।''

জোসেফ ফ্রাংকল বলেন, ''বৈদেশিক নীতি হল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল, যা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।''

নর্মান প্যাডেলফোর্ড, আর্থার লিংকন এবং লিওলভে এ প্রসঙ্গে বলেন, ''বৈদেশিক নীতি হল ঐ সব জটিল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার লক্ষ্য অর্জন ও স্বার্থ আদায়ে সক্ষম হয়।''

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি :

আধুনিক বিশ্বে প্রত্যেক রাষ্ট্র একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপর রাষ্ট্রের সাথে অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে। রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করে। এ জন্য অটো ভন বিসমার্ক বলেন, ''অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হল পররাষ্ট্র নীতি।" পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশেরও নিজস্ব বৈদেশিক নীতি রয়েছে। সংবিধানের ২৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

i. জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা- এই সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি।
ii. রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবে।
iii. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে।
iv. সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে রাষ্ট্র সমর্থন করবে।

পরিশেষে বলা যায়, বৈদেশিক নীতি হল রাষ্ট্রের সে সকল কার্যাবলির বিবরণী, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণ হল একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি। জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদে উল্লেখিত নীতিসমূহ যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমনি বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ও সংস্থার সাথেও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিসমূহ উল্লেখ রয়েছে?

(ক) ২৫ (খ) ১৩৭

(গ) ৩৮ (ঘ) ১৩৯

২। "বৈদেশিক নীতি হল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল, যা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।"- উক্তটি কে করেছেন?

(ক) জেমস রোজনাও (খ) প্যাডেলফোর্ড

(গ) হার্টম্যান (ঘ) জোসেফ ফ্রাংকল

৩। ''অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হল পররাষ্ট্রনীতি''- উক্তিটি কে করেছেন?

(ক) কিসিঞ্জার (খ) হার্টম্যান

(গ) বিসমার্ক (ঘ) জোসেফ ফ্রাংকল

৪। ''বৈদেশিক নীতি হল ঐ সব জটিল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার লক্ষ্য অর্জন ও স্বার্থ আদায়ে সক্ষম হয়।''- কে বলেছেন?

(ক) জোসেফ ফ্রাংকল (খ) প্যাডেলফোর্ড, লিংকন এবং ওলভি

(গ) জেমস রোজনাও (ঘ) ফ্রেশার

৫। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য হল-

(i) দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা

(ii) প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বৈরী সম্পর্ক গড়ে তোলা

(iii) প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি বজায় রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৯.২ সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সার্কের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সার্কের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সার্ক, আঞ্চলিক সংস্থা, সার্বভৌমত্ব, সেক্রেটারি জেনারেল, জনকল্যাণ, জীবনমান, যৌথ কর্মসূচি।

'সার্ক' একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। SAARC এর পূর্ণরূপ হল South Asian Association for Regional Co-operation (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা)। কোন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ না করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব বিরোধের নিস্পত্তি করা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে সার্ক গঠিত হয়। সার্কের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৫। সার্কের প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ৭টি হলেও বর্তমান সদস্য ৮। বর্তমানে সার্কভূক্ত দেশগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ, ভারত, ভূটান, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। ৩ এপ্রিল, ২০০৭ সালে আফগানিস্তান সার্কের সদস্য হয়। সার্কের পর্যবেক্ষক দেশ ও সংস্থা হল চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, মরিশাস, মিয়ানমার, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। সার্কের প্রধানকে বলা হয়, সেক্রেটারি জেনারেল। প্রতি বছর সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সার্কের গঠন :

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এশিয়া অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। ১৯৮১ সালের ২১-২৩ এপ্রিল শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ অঞ্চলের ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে এ অঞ্চলের ৭টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ দিল্লিতে তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে মন্ত্রিবর্গ একীভূত বা যৌথ কর্মসূচি নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির আওতায় সার্কভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য মোট নয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। অত:পর ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

সার্কের উদ্দেশ্য :

বর্তমান বিশ্ব সমৃদ্ধি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার বিশ্ব। প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান তৈরিতে দৃঢ়সংকল্প। পাশাপাশি জনকল্যাণের স্বার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়ে উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সার্কের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন।
(খ) এ অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিত করা।
(গ) দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
(ঘ) এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
(ঙ) অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।

সার্ক অনেকগুলো বাস্তবভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলেও বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রে মতানৈক্যের কারণে এখন অবধি দক্ষিণ এশিয়ার পৌনে দুইশত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয় নি। নানামুখী টানাপোড়েন পরিহার করে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও উন্নতির দিকে নজর দিলে উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সার্কের গঠন ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য একটি প্লাটফরম (Platform) হিসেবে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই সার্কের লক্ষ্য। তবে বাস্তবতা এই যে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের নানাবিধ টানাপোড়েনের কারণে সার্ক এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সার্ক কত সালে প্রতিষ্ঠিত?

(ক) ১৯৮৫ (খ) ১৯৮৭

(গ) ১৯৯২ (ঘ) ১৯৯৭

২। সার্কের বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র কয়টি?

(ক) ৭ (খ) ৮

(গ) ১০ (ঘ) ১১

৩। সার্ক গঠনের মূল উদ্যোগে ছিল-

(ক) ভারত (খ) নেপাল

(গ) বাংলাদেশ (ঘ) শ্রীলংকা

৪। SAARC এর পূর্ণরূপ কী?

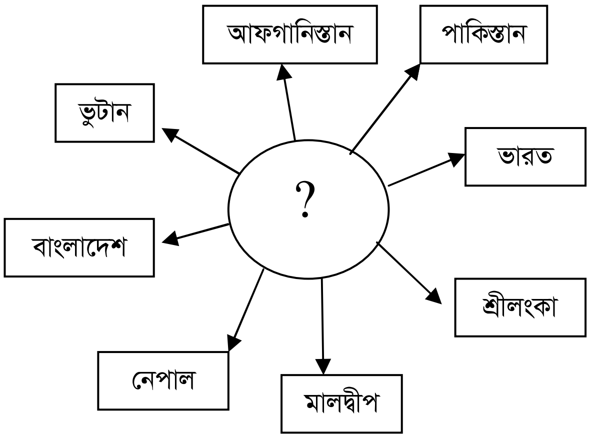
(ক) South Asian Association for Regional Co-operation

(খ) South Asian Assembly for Regional Co-operation

(গ) South Asian Association for Regional Company

(ঘ) South Asian Association for Regional Co-operative

নিচের ছক থেকে ৫নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন।



৫। উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত সংস্থাটির নাম কী?

(ক) জাতিসংঘ (খ) ওআইসি

(গ) আসিয়ান (ঘ) সার্ক

৬। ছকে '?' চিহ্নিত সংস্থাটির কাজ কী?

i. অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে

ii. পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে

iii. অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৯.৩ সার্ক ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সার্ক ও বাংলাদেশের সম্পর্ক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শীর্ষ সম্মেলন, ঢাকা ঘোষণা, সার্ক পর্যবেক্ষক, রাজনৈতিক সম্মতি।

সার্ক ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সাথে সার্কের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। কেননা সার্ক গঠনের উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশ। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। সার্ক সদস্যভূক্ত ৭টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের বক্তব্যে সহযোগিতা ও সমঝোতার গভীর আগ্রহ প্রকাশ পায়। উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, ভূটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইয়ুম, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধনে এবং নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহদেব। ১৯৮৫ সালের প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ১৪ দফা ‘সার্ক ঘোষণা’ (ঢাকা ঘোষণা নামে অভিহিত) একটি ঐতিহাসিক ও দিক নির্দেশক। এ ঘোষণার মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানগণ সার্ক প্রতিষ্ঠায় তাঁদের স্ব-স্ব সরকারের রাজনৈতিক সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ ঘোষণার প্রধান লক্ষ্যগুলো হল- (ক) দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের জনগণের জীবনমানের গুণগত উন্নয়নের নীতিকে কার্যকর এবং সামাজিকভাবে জনগণের জন্য কল্যাণকর কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করা (খ) এ অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা (গ) দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোর জন্য সমষ্টিগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সকল সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯৯৩ সালের ১০-১১ নভেম্বর সার্কের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের ঘোষণায় সার্ক তৎপরতা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমন্বিত কর্মসূচিকে আরও সংহত ও জোরদার করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও অবক্ষয় রোধে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্বরোপ করা হয়। এ শীর্ষ সম্মেলনে কয়েকটি মূল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে SAPTA (SAARC Preferential Trading Arrangement) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১০ ভাগ শুল্ক হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়।

২০০৫ সালের ১২-১৩ নভেম্বর সার্কের ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে আফগানিস্তানকে সার্কের অষ্টম সদস্য এবং চীন ও জাপানকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ২০০৬-২০১৫ সালকে ‘দারিদ্রমুক্ত সার্ক দশক’ ঘোষণাসহ মোট ৫৩ দফা ঢাকা ঘোষণা গৃহীত হয়। এ ঢাকা ঘোষণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দফা হল (ক) আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার (খ) সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার (গ) নারী ও শিশু পাচার রোধে সহযোগিতা (ঘ) সার্ক দারিদ্র বিমোচন তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত ও (ঙ) স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক উদ্যোগ গ্রহণ।

পরিশেষে বলা যায়, সার্ক ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশ সার্কের সাফল্য ও ব্যর্থতার সকল ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত রয়েছে। তবে সার্কের সাফল্য, সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	সার্ক ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

সার্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পর্ক বিদ্যমান। সার্ক প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাছাড়া সার্কের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন ও সার্কের নানাবিধ সম্মেলন সফলভাবে অনুষ্ঠান কওে সার্ককে আরও কার্যকর করার চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। শিশু ও নারী পাচার, মাদকদ্রব্য, চোরাচালান ও সন্ত্রাস দমনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রস্তাবসমূহ সার্ক গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে। সার্কের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সব সময় সার্কের পাশে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল কোথায়?

(ক) দিল্লি (খ) থিম্পু

(গ) ইসলামাবাদ (ঘ) ঢাকা

২। প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে কয়টি দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান উপস্থিত ছিলেন?

(ক) ৭ (খ) ৫

(গ) ৪ (ঘ) ৬

৩। ১৯৯৩ সালে সার্কের কততম শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

(ক) ৯ম (খ) ১০ম

(গ) ৭ম (ঘ) ৮ম

৪। '২০০৬-২০১৫' দশককে সার্ক ঘোষণা করে-

(ক) সন্ত্রাসমুক্ত সার্ক দশক (খ) দারিদ্রমুক্ত সার্ক দশক

(গ) ক্ষুধামুক্ত সার্ক দশক (ঘ) নারী ও শিশু পাচারমুক্ত সার্ক দশক

৫। বাংলাদেশে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে-

i. ১৯৮৫ সালে

ii. ১৯৯৩ সালে

iii. ২০০৫ সালে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৯.৪ ওআইসি: গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ওআইসি'র গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ওআইসি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ওআইসি, উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য, মান মর্যাদা, জাতীয় অধিকার

ওআইসি'র (OIC) এর পূর্ণরূপ Organization of Islamic Conference বা ইসলামী সম্মেলন সংস্থা। সংস্থাটি ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে সন্ত্রাসীরা অগ্নিসংযোগ করে। এ পরিস্থিতিতে ইসলামী বিশ্ব নেতৃবৃন্দরা ইসলামের সম্মান, মর্যাদা ও বিশ্বাস রক্ষা করার জন্য এক আলোচনা সভায় বসেন। ঐ বৈঠকে সৌদি আরব প্রস্তাব করে যে, বিষয়টি যেহেতু গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য স্পর্শকাতর তাই এটি নিয়ে আলোচনার জন্য সকল মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করা আবশ্যক। সৌদি আরব, মরক্কো, ইরান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, মায়লেশিয়া ও নাইজারকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে প্রায় সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র সম্মেলনে উপস্থিত হয়। এ সম্মেলনের মাধ্যমে ওআইসি প্রতিষ্ঠা পায়। ২০১১ সালের ২৮ জুন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার নাম পরিবর্তন করে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (Organization of Islamic Co-operation) রাখা হয়।

ওআইসি'র গঠন

প্রতিষ্ঠাকালীন ওআইসি'র সদস্য রাষ্ট্র ছিল ২৫টি। বর্তমানে এ সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৭। ওআইসি'র অফিসিয়াল ভাষা হচ্ছে আরবি, ইংরেজি ও ফরাসি। এর প্রশাসনিক দপ্তর জেদ্দা, সৌদি আরব। ওআইসি'র পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হচ্ছে পাঁচটি। ওআইসি'র সদস্য ৫৭টি রাষ্ট্রের নাম হল আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, শাদ, মিশর, গায়না, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, সৌদি আরব, সেনেগাল, সোমালিয়া, সুদান, তিউনিশিয়া, তুরস্ক, ইয়েমেন, বাহরাইন, ওমান, কাতার, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিয়েরা লিওন, বাংলাদেশ, গ্যাবন, গাম্বিয়া, গিনি বাসাউ, উগান্ডা, বারকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, কমোরোস, ইরাক, মালদ্বীপ, জিবুতি, বেনিন, ব্রুনাই, নাইজেরিয়া, আজারবাইজান, আলবেনিয়া, কিরগিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, মোজাম্বিক, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, সুরিনাম, টোগো, গায়না ও আইভরি কোস্ট। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি'র সদস্য পদ লাভ করে।

ওআইসি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ওআইসি'র সনদ অনুযায়ী এ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

i. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী ঐক্য উন্নত করা।
ii. অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে সহযোগিতা করা।
iii. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বৈঠকে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থে কাজ করা।
iv. সকল প্রকার বর্ণ-বৈষম্যের মূল উৎপাটন এবং সব রকমের উপনিবেশবাদের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা।
v. সুবিচার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন দান।
vi. ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের সংগ্রামকে সমন্বিত সুসংহত করা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং তাদের অধিকার আদায় ও দেশ মুক্ত করার কাজে সহায়তা প্রদান।

vii. মুসলমানদের মান মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার সংরক্ষণের সকল সংগ্রামে মুসলিম জনগণকে শক্তি যোগানো।

viii. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

তাই বলা যায়, মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ সহযোগিতা সংস্থা হল ওআইসি। এ সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণকামী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মুসলমানদের শান্তি, নিরাপত্তা, মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার রক্ষার্থে ওআইসি'র ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	ওআইসি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসি একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থা। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী এ সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বমোট লোকসংখ্যা ১.৬ বিলিয়ন। মুসলিম স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে এ সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। অর্থনেতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ওআইসি'র অন্যতম লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ওআইসি'র প্রশাসনিক দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
(ক) জেদ্দা (খ) কায়রো
(গ) মক্কা (ঘ) তেহরান

২। ওআইসি'র অফিসিয়াল ভাষা কয়টি?
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৫ (ঘ) ৭

৩। ওআইসি'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য কয়টি?
(ক) ২০ (খ) ২৯
(গ) ২৭ (ঘ) ২৫

৪। ওআইসি'র লক্ষ্য হল-
i. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইসলামী ঐক্য উন্নত করা
ii. ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধান
iii. যুদ্ধপরবর্তী দেশের পুনর্গঠনে সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৯.৫ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইউরোপিয় ইউনিয়ান গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইউরোপিয় ইউনিয়ান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাণিজ্য নীতি, ইউরো, ম্যাসক্টিট চুক্তি, ইউরোটম, শুল্ক, ব্রাসেলস চুক্তি, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল।

বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাধারণ ও স্বতন্ত্র বাণিজ্য নীতি পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে। ইইউ ইউরোপ মহাদেশের ২৮টি দেশের একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সাহায্য, উন্নয়ন সহযোগিতা এবং মানবতাধর্মী কাজে সাহায্যসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভূমিকা প্রশংসনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপিয়ান দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য একটি অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ১৮ এপ্রিল, ১৯৫১ সালে প্যারিসে একচুক্তির মাধ্যমে ইউরোপিয় কয়লা ও ইস্পাত পরিষদ (ECSC- European Coal and Steel Community) গঠিত হয়, যা ইউরোপিয় ফেডারেশনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। ২৫ মার্চ, ১৯৫৭ সালে বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস্, ইতালি ফ্রান্স ও সাবেক পশ্চিম জার্মানী এ ৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ‘রোম চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৮ সালে ইইসি (EEC- European Economic Community) এবং ইউরোটম (Euratom) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ইইসি একটি একক ইউরোপিয় অর্থনীতি গঠন করার প্রয়াস চালায়। ১৯৬৫ সালে সম্পাদিত ‘ব্রাসেলস চুক্তি’ সংগঠনটিকে ইসিতে (EC- European Community) রূপান্তরিত করে। ১৯৯১ সালে স্বাক্ষরিত ‘ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি’র ভিত্তিতে ইসি রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU- European Union) হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে অবস্থিত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অভিন্ন মুদ্রা ‘ইউরো’।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গঠন

১৯৫১ সালে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো যখন অর্থনৈতিকভাবে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল তখন কেবল বেলজিয়াম, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, লুক্সেমবার্গ এবং নেদারল্যাণ্ডস্ অংশ গ্রহণ করেছিল। সময়ের ধারায় অনেক রাষ্ট্র এ সংস্থায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১ জুলাই, ২০১৩ সালে ক্রোয়েশিয়ার সংযোজনের মাধ্যমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৮টিতে উন্নীত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন ৬টি সদস্য রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য ২২টি রাষ্ট্র হল- ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, ব্রিটেন, গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, লাটভিয়া, স্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, স্লোভেনিয়া, মাল্টা, সাইপ্রাস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও ক্রোয়েশিয়া। ২০১৬ সালে এক গণভোটের মাধ্যমে ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ -

i. ইউরোপিয়ান কাউন্সিল
ii. ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট
iii. ইউরোপিয়ান কমিশন
iv. ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিস
v. ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক
vi. দি কোর্ট অব অডিটরস

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সনদ অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

i. পারস্পরিক স্বার্থে উল্লেখযোগ্য হারে শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য সাধারণ ও সুলভ বাজার সৃষ্টি।
ii. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন।
iii. প্রয়োজনে কিছু ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করে বাণিজ্যিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।
iv. একক মুদ্রা ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্ত:মহাদেশীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
v. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও আঞ্চলিক সংযোগ ও ঐক্য সুদৃঢ় করা।
vi. নারী ও পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা।
vii. রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক সংলাপ ও পরামর্শ করা।
viii. ইউরোপের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সুরক্ষা ও সমৃদ্ধ করা।
ix. শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করা।
x. ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।
xi. নাগরিকদের জন্য অভ্যন্তরীণ বিরোধহীন, নিরাপদ ও ন্যায়সঙ্গত অঞ্চল গড়ে তোলা, যেখানে তাঁরা অবাধে চলাচল করতে পারবে।
xii. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন ও আত্মরক্ষার কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।

পরিশেষে বলা যায়, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপ তথা সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য যে সংস্থা গড়ে ওঠে তা আজকের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি বিভিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ নিয়েছে। ইউরোপের নাগরিকদের শান্তি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, রাষ্ট্রের উন্নতি, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভূমিকা রাখছে। ইউরোপে শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ২০১২ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য কয়টি?

(ক) ৫ (খ) ৬
(গ) ৭ (ঘ) ৮

২। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৯৩ (খ) ১৯৮৬
(গ) ১৯৫৮ (ঘ) ২০১২

৩। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কয়টি?

(ক) ২৫ (খ) ৩২

(গ) ৩৫ (ঘ) ২৮

৪। কোন চুক্তির ভিত্তিতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠিত হয়?

(ক) লিসবন চুক্তি (খ) ব্রাসেলস চুক্তি

(গ) ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি (ঘ) প্যারিস চুক্তি

৫। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

(ক) জার্মানী (খ) বেলজিয়াম

(গ) নেদারল্যান্ড (ঘ) ইতালি

৬। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্য-

i. বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন

ii. আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

iii. সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৯.৬ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তৈরি পোশাক, শুল্ক রেয়াত, জিএসপি, রপ্তানি বাণিজ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইউরোপিয়ান কমিশন।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) ও বাংলাদেশ সম্পর্কের সূত্রপাত হয় ১৯৭৩ সালে। এ সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় হয়। ২২ মে, ২০০১ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর ব্রাসেলসে ইইউ ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ হল বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। বাংলাদেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাতদ্রব্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাতদ্রব্য, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, হিমায়িত খাদ্য এবং হস্তশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। আবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ হতে বাংলাদেশ খাদ্য শস্য, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা, পরিবহন ও যানবাহনের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র এবং লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের একটি বিশাল অংশ সম্পন্ন হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে।

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে মোট ৫৭৫ কোটি ২২ লাখ মার্কিন ডলার সমমূল্যের ২৮ হাজার ৮১৮ কোটি ৫২ লাখ টাকার পণ্য রপ্তানি হয়। এর মধ্যে ৪৬ শতাংশ পণ্য রপ্তানি করা হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রে। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত ৪৮টি দেশকে তাদের বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সার্কভুক্ত দেশসমূহের জন্য একটি বিশেষ সুবিধা 'সার্ক কিমিউলেশন' প্রদান করেছে। বাংলাদেশ সার্কের সদস্য হওয়ায় উক্ত সুবিধাটি পাওয়ার অধিকার রাখে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ বাংলাদেশকে জিএসপি (Generalised Preference System) সুবিধা প্রদান করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে পণ্য রপ্তানিতে জিএসপি'র আওতায় শতকরা ১২.৫% শুল্ক রেয়াত সুবিধা পাচ্ছে। বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধার আওতায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশে ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে প্রথম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একক মুদ্রা 'ইউরো' লেনদেন শুরু করে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মূলত অর্থনৈতিক জোট এবং বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কই বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ইইউ'র বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ইউনিয় এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

ইইউ-বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। পরবর্তীতে এ সম্পর্ক ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে। ১৯৮২ সালে ইউরোপিয়ান কমিশন ঢাকায় তাদের অফিস স্থাপন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখিয়েছে যে, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৬ বাংলাদেশ ইইউ বাজার থেকে ৫৫.৫ শতাংশ রপ্তানি আয় করেছে। যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ত্বরান্বিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইইউ ও বাংলাদেশের সম্পর্কের সূত্রপাত হয় কত সালে?

(ক) ২০০১ (খ) ১৯৮৮
(গ) ১৯৭৩ (ঘ) ১৯৯৯

২। ইইউ ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি সাক্ষরিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৭৬ (খ) ১৯৭৮
(গ) ১৯৮৯ (ঘ) ২০০১

৩। ইইউ'র কতটি দেশকে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে?

(ক) ৪৫ (খ) ৪৮
(গ) ৫২ (ঘ) ৬৬

৪। বাংলাদেশ জিএসপি'র আওতায় কত শতাংশ শুল্ক রেয়াত সুবিধা পাচ্ছে?

(ক) ১২.৫% (খ) ৯.২৫%
(গ) ১৩.৫% (ঘ) ১০.৫%

পাঠ-৯.৭ কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কমনওয়েলথ এর গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হবেন।
- কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ব্রিটিশ উপনিবেশ বেলফোর ঘোষণা, লন্ডন ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, কলম্বো পরিকল্পনা, উচ্চতর শিক্ষা, রাজনৈতিক সঙ্কট, হাইকমিশনার।

কমনওয়েলথ

কমনওয়েলথ হল সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন। এক সময় যে সকল অঞ্চল বা জনপদগুলো ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে শাসিত হয়ে পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব রাষ্টের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কমনওয়েলথ। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ব্রিটেনের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে কমনওয়েলথ। ব্রিটেনের রাজা বা রাণী হলেন এ সংস্থার প্রধান। কমনওয়েলথের সদর দফতর লন্ডনে অবস্থিত। এ সংস্থার অফিশিয়াল ভাষা ইংরেজি।

১৯ নভেম্বর, ১৯২৬ সালে 'বেলফোর ঘোষণার' (Balfour Declaration) মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস (British Commonwealth of Nations) ধারণার গোড়াপত্তন হয়। ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 'স্ট্যাটিউট অব ওয়েস্ট মিনিস্টার' (Statute of Westminster) আইন অনুমোদিত হয়। এ আইনের মাধ্যমে উপনিবেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে। ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে 'লন্ডন ঘোষণা'র (London Declaration) মাধ্যমে কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। তবে এ সময় সংস্থাটি থেকে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দিয়ে 'কমনওয়েলথ অব নেশনস' (Commonwealth of Nations) করা হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ না হয়েও মোজাম্বিক ও রুয়ান্ডা যেমন কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্র, তেমনি ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়েও অনেক রাষ্ট্র যেমন- মায়ানমার, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, মিসর, ইরাক, কুয়েত, সুদান, জর্ডান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমনওয়েলথের সদস্য হয় নি। বিভিন্ন ধারা পরিক্রমায় বর্তমান কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ৫২।

কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ কমনওয়েলথ-এর অন্যতম সদস্য। ২৮ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের ৩২তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। এর পর থেকে কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সংস্থার মূল লক্ষ্য হল কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সমৃদ্ধি করা।

কমনওয়েলথ এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। যে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে কমনওয়েলথ এর উৎপত্তি সেই ব্রিটেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের ওপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, প্রতিরোধ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করেছিল। এই ধারাবাহিকতাতে স্বাধীনতার পর ব্রিটেন তথা কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্ট্রেলিয়ার বেতার তথা অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। ব্রিটেনসহ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল।

কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করছে। শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি কমনওয়েলথ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানেও প্রচেষ্টা চালায়। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ার পর কমনওয়েলথের প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রথম সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে অটোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	কমনওয়েলথ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কমনওয়েলথ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। কমনওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে। কমনওয়েলথের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য উৎপাদন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পল্লী ও শিক্ষা উন্নয়ন, আইনগত বিষয়, প্রশিক্ষণ, নারী উন্নয়ন, রপ্তানি বাজার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা। মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কমনওয়েলথের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট মুহূর্তেও কমনওয়েলথের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ঘোষণার মাধ্যমে কমনওয়েলথের গোড়াপত্তন হয়?
(ক) লন্ডন (খ) বেলফোর
(গ) প্যারিস (ঘ) কোনটিই নয়

২। কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
(ক) ১৯৪৯ (খ) ১৯৫৯
(গ) ১৯৫০ (ঘ) ১৯৬৯

৩। কমনওয়েলথের প্রধান কে?
(ক) ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী (খ) ব্রিটেনের কমন্সসভার স্পিকার
(গ) ব্রিটেনের রাজা বা রাণী (ঘ) অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

৪। কমনওয়েলথের অফিশিয়াল ভাষা কোনটি?
(ক) ইংরেজি (খ) স্প্যানিশ
(গ) হিন্দি (ঘ) বাংলা

৫। কমনওয়েলথ যে ধরণের সংস্থা-
i. সহযোগিতামূলক সংস্থা
ii. স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধীন সংস্থা
iii. স্বাধীনতা লাভে সাহায্যকারী সংস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও iii (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর সদস্য হয় কত তারিখে?

(ক) ১ এপ্রিল, ১৯৭২ (খ) ২৮ এপ্রিল, ১৯৭২

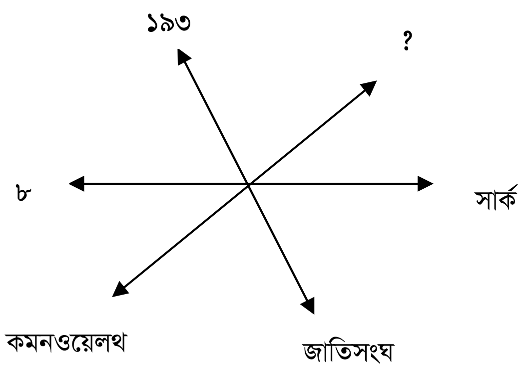
(গ) ১৫ এপ্রিল, ১৯৭২ (ঘ) ২০ এপ্রিল, ১৯৭২

৭। বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর কততম সদস্য?

(ক) ২৫তম (খ) ৩০তম

(গ) ২৮তম (ঘ) ৩২তম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮নং ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দিন।



৮। প্রশ্ন (?) চিহ্নিত স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

(ক) ৫৪ (খ) ৫১

(গ) ৫২ (ঘ) ৫৩

৯। বাংলাদেশ যেসব সংস্থার সদস্য-

i. সার্ক

ii. জাতিসংঘ

iii. কমনওয়েলথ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৮ জাতিসংঘ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিশ্বযুদ্ধ, আটলান্টিক সনদ, ভার্সাই চুক্তি, মস্কো ঘোষণা, শান্তির প্রতীক, ক্রিমিয়া সম্মেলন

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রধান সংগঠন হিসেবে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। যুদ্ধের অভিশাপ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ সালের আটলান্টিক সনদে 'জাতিসংঘ' নামটি সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত হয়। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বিরোধ সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে একটি সাধারণ যুদ্ধ বিরতির আহবান জানায়। এর প্রেক্ষাপটে উড্রো উইলসন তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা পেশ করেন। উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফা শর্তের ১৪ নং দফায় বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ জুন, ১৯১৯ সালে স্বাক্ষরিত 'ভার্সাই চুক্তি'র মাধ্যমে লিগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়। ১০ জানুয়ারি, ১৯২০ সালে সংস্থাটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। জাতিপুঞ্জের ৩টি অঙ্গসংস্থা ছিল- পরিষদ, কাউন্সিল এবং সচিবালয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় ২০ এপ্রিল, ১৯৪৬ সালে সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়। সংস্থাটির উত্তরসূরি হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের জন্ম হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর ১৯১৯ সালে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিল, তার ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৪১ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশ রণতরী প্রিন্সেস অব অয়েলস-এ দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় মিলিত হন। ১২ আগস্ট, ১৯৪১ সালে তাঁরা একটি শান্তি পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেন। এটি বিখ্যাত 'আটলান্টিক সনদ' নামে খ্যাত। আটলান্টিক সনদে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন রুজভেল্ট ও চার্চিল। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মস্কোতে মিলিত হন এবং যুদ্ধ পরবর্তী শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতিসমূহের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান। এই চুক্তি 'মস্কো ঘোষণা' নামে পরিচিত।

১৯৪৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসির ডাম্বারটন ওকস এ অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্য প্রথম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্ট্যালিন ১৯৪৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনের ইয়াল্টায় এক সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলন 'ক্রিমিয়া সম্মেলন' নামেও পরিচিত। এই সম্মেলনের ভিত্তিতে ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন বিশ্বের ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে ১১১ ধারা সম্বলিত জাতিসংঘের মূলসনদে স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়। এ জন্য প্রতি বছর ২৪ অক্টোবর 'জাতিসংঘ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩। এ সংস্থার সদর দপ্তর নিউইয়র্ক। ইউরোপীয় দপ্তর জেনেভা। দাপ্তরিক ভাষা ৬টি। এগুলো হচ্ছে ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ, ফরাসি, রুশ ও আরবি। জাতিসংঘের পতাকায় আছে হালকা

নীলের উপর সাদা রঙের জাতিসংঘের প্রতীক। জাতিসংঘের প্রতীকের মাঝখানে পৃথিবীর মানচিত্র। দুই পাশে দুইটি জলপাই গাছের শাখা। জলপাই গাছ শান্তির প্রতীক।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবক হিসেবে জাতিসংঘকে বিবেচনা করা হয়। নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জাতিসংঘ গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘ হল বিশ্বের স্বাধীন দেশসমূহের সর্ববৃহৎ সংগঠন। লিগ অব নেশনস এর ব্যর্থতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভয়াবহতার প্রেক্ষাপটে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি বিশ্ব ঐক্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে বিশ্ব শান্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতিসংঘ সারা বিশ্বের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়?

(ক) ২৪ জুন (খ) ১৫ অক্টোবর (গ) ২৪ অক্টোবর (ঘ) ১০ জানুয়ারি

২। জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

(ক) লন্ডন (খ) ওয়াশিংটন (গ) নিউইয়র্ক (ঘ) সানফ্রান্সিসকো

৩। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হল-

i. বৈশ্বিক শান্তি

ii. সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা

iii. মানবাধিকার নিশ্চিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। জাতিসংঘ অবদান রাখছে-

i. ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়তে

ii. নিরক্ষরতা দূর করতে

iii. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৯ জাতিসংঘের গঠন ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতিসংঘের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, সচিবালয়, মহাসচিব, মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আদালত।

জাতিসংঘের গঠন

বর্তমানে জাতিসংঘের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় পাঁচটি প্রধান অঙ্গসংস্থার মাধ্যমে। এই অঙ্গসংস্থা হল-

i. সাধারণ পরিষদ
ii. নিরাপত্তা পরিষদ
iii. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
iv. আন্তর্জাতিক আদালত ও
v. সচিবালয়

(i) **সাধারণ পরিষদ :** জাতিসংঘ সনদের নিয়ম কানুন মেনে চলার শর্তে বিশ্বের যে কোনো শান্তিকামী দেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সদস্য। মহাসচিব নিয়োগ, নতুন সদস্য গ্রহণ, কোন সদস্য রাষ্ট্রকে বহিষ্কার, বাজেট পাস, সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমান নির্ধারণ, বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন, নিরাপত্ত পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন, অন্যান্য সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ পরিষদ সম্পাদন করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোটদানের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে পরিষদের একজন সভাপতি এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(ii) **নিরাপত্তা পরিষদ :** নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিসংঘের নির্বাহী পরিষদ বলা হয়। এ পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরাষ্ট্র ১১টি (৫টি স্থায়ী ও ৬টি অস্থায়ী)। ১৯৬৩ সালের জাতিসংঘ সনদের সংশোধন করে অস্থায়ী সদস্য ৬ থেকে ১০ এ উন্নীত করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হল- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। এ পাঁচটি সদস্য দেশের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। কোনো প্রস্তাবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোনো স্থায়ী সদস্যদেশ দ্বিমত পোষণ করলে সে প্রস্তাব আর অনুমোদিত হয় না। এ পরিষদ আলাপ-আলোচনা, আপোষ, মধ্যস্থতা ও সালিশীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তির চেষ্টা চালায়। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এ পরিষদের উপর ন্যস্ত।

(iii) **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ :** এ পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫৪। প্রতি তিন বছরে এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করে। বছরে কমপক্ষে দু'বার নিউইয়র্ক অথবা জেনেভায় এর অধিবেশন বসে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটি করে ভোটের অধিকার আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে যে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়ে থাকে। এ পরিষদের কাজ হল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, শিক্ষা প্রসার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা। বিভিন্ন কল্যাণমূলক বিষয়ে সাধারণ পরিষদে সুপারিশ করাও এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশ ২০১০-২০১২ মেয়াদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল।

(iv) আন্তর্জাতিক আদালত: আন্তর্জাতিক আদালত হল জাতিসংঘের বিচারালয়। যেটি নেদারল্যান্ডস এর দ্যা হেগ শহরে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের যে কোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপ্রার্থী হতে পারে। এ আদালতে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কার্যকরি হয়। ১৫ জন বিচারকের সমন্বয়ে এ আদালত গঠিত। বিচারকদের মেয়াদকাল ৯ বছর। বিচারকদের মধ্যে একজন সভাপতি তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

(vi) সচিবালয় : জাতিসংঘের সচিবালয় মহাসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত। মহাসচিব জাতিসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন নরওয়ের ট্রিগভে লি এবং বর্তমান মহাসচিব হলেন পর্তুগালের এন্টোনিও গুটেরিস।

অছি পরিষদ নামে জাতিসংঘের অপর একটি অঙ্গসংস্থা রয়েছে। কিন্তু এটি ১৯৯৪ সাল থেকে অকার্যকর।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদ্দেশ্য তুলে ধরা হল-

১. বিশ্বব্যাপী শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা।
২. বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
৩. আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করা।
৪. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।
৫. আন্তর্জাতিক মৌলিক মানবাধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করা।
৬. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবিক অধিকার সংরক্ষণ করা।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘের কিছু ব্যর্থতা থাকলেও সামগ্রিক দিক দিয়ে বিচার করলে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল লিগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৪৬ সালের ১৮ এপ্রিল সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়। সংস্থাটির উত্তরসূরি হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের জন্ম হয়। জাতিসংঘ বর্তমানে পাঁচটি মূল অঙ্গসংস্থার মাধ্যমে তার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এগুলোর মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ সর্বাপেক্ষ ক্ষমতার অধিকারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গসংস্থা কয়টি?
(ক) ৪ (খ) ৫ (গ) ৬ (ঘ) ৮

২। আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত?
(ক) নিউইয়র্ক (খ) দ্য হেগ (গ) লন্ডন (ঘ) দিল্লি

৩। কোন দেশটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয়?
(ক) রাশিয়া (খ) জার্মানি (গ) ফ্রান্স (ঘ) ব্রিটেন

পাঠ-৯.১০ জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভেটো, শান্তিরক্ষা মিশন, জাতিসংঘ সনদ, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি, ফারাক্কাবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সদস্য প্রাপ্তির আবেদন করে। কিন্তু চীন তখন ভেটো প্রয়োগ করে। ১৯৭৪ সালে আবার আবেদন করলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সে বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর সর্বসম্মতভাবে ১৩৬তম সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য প্রাপ্তির পূর্বেই জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা যেমন- UNCTAD, IMF, WHO, IBRD ইত্যাদিতে যোগ দেয়। তবে জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু হয়। সদস্য প্রাপ্তির পর থেকে সে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদের প্রতি আস্থাশীল। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫নং ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির কথা উল্লেখ রয়েছে। এতে মূলত জাতিসংঘের প্রতি সমর্থনের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সদা প্রস্তুত। বাংলাদেশ শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিবেশী ও দূরের সকল রাষ্ট্রের সাথে সহ-অবস্থানে বিশ্বাস করে। জাতিসংঘের আর্দশ মোতাবেক বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাষ্ট্রকে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে জাতিসংঘ ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, খাদ্য, পুষ্টি, শ্রম-কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাহায্য অতুলনীয়। খাদ্য ঘাটতি লাঘব এবং জরুরি কার্যক্রমে সাহায্য প্রদানের জন্য ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) কার্যক্রম চালু হয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জরুরি ত্রাণ কাজে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি থেকে সহায়তা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা FAO-এর প্রকল্পের সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক। FAO ১৯৭৮ সাল থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে FAO-এর থানা ভিত্তিক উন্নত খাদ্য উৎপাদন, শস্যবীজ ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধি, বন ও পরিবেশ উন্নয়ন, পশু সম্পদ, প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রভৃতি ক্ষেত্রে ২৭টির বেশি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য বিষয়ক সহযোগী সংস্থা (WHO) বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্য ও অনুদান প্রদান করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরিবেশ রক্ষায় ইউনেস্কো নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পায়। এছাড়া বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারও ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পায়। ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো এর সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের ভাষা শহীদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ''আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'' ঘোষণা করে।

বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত থেকে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ ৫৪টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে এখন পর্যন্ত সে সম্পর্ক অটুট রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। একই অধিবেশনে ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতি নির্বাচিত হন। এ পর্যন্ত জাতিসংঘের ০৪ জন মহাসচিব বাংলাদেশ সফর করেছেন। তাঁরা হলেন কুর্ট ওয়াল্ড জেইম (১৯৭৩), পেরেজ দ্য কুয়েলার (১৯৮৯), কফি আনান (২০০১) এবং বান কি মুন (২০০৮ ও ২০১১)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয় কত সালে?

(ক) ১৯৭২ (খ) ১৯৭৪ (গ) ১৯৭৬ (ঘ) ১৯৭৮

২। বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?

(ক) ১৩০ (খ) ৩৬ (গ) ১৩৬ (ঘ) ১৪২

৩। জাতিসংঘে যোগদানের পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদের আলোকে ভূমিকা পালন করে আসছে-

i. বিশ্বশান্তিতে

ii. জলবায়ু সংরক্ষণে

iii. বিশ্ব নিরাপত্তায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কেমন রাষ্ট্র?

(ক) শান্তিকামী (খ) সাম্রাজ্যবাদী
(গ) আগ্রাসী (ঘ) সম্প্রসারণবাদী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

তন্বী তার দাদুর কাছে শুনেছে যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বেশ কিছু রাষ্ট্র সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর অনেক দেশই আমাদের রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনে সাহায্য করেছে।

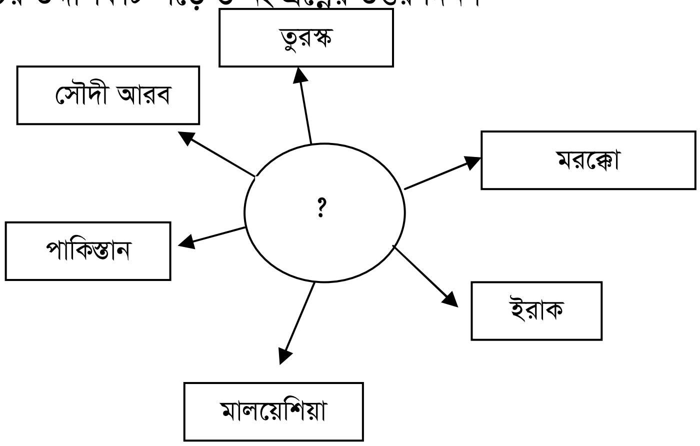
২। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছিল-

i. ভারত
ii. সোভিয়েত ইউনিয়ন
iii. যুক্তরাষ্ট্র

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) iii (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।



৩। প্রশ্নবোধক (?) চিহ্ন স্থানে কোন সংস্থার নাম বসবে?
i. কমনওয়েলথ
ii. ন্যাটো
iii. ওআইসি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪নং ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
মুনীরা ইতালি ভ্রমণে গিয়ে জানতে পারে দেশটি একটি আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। বর্তমান সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ২৮।

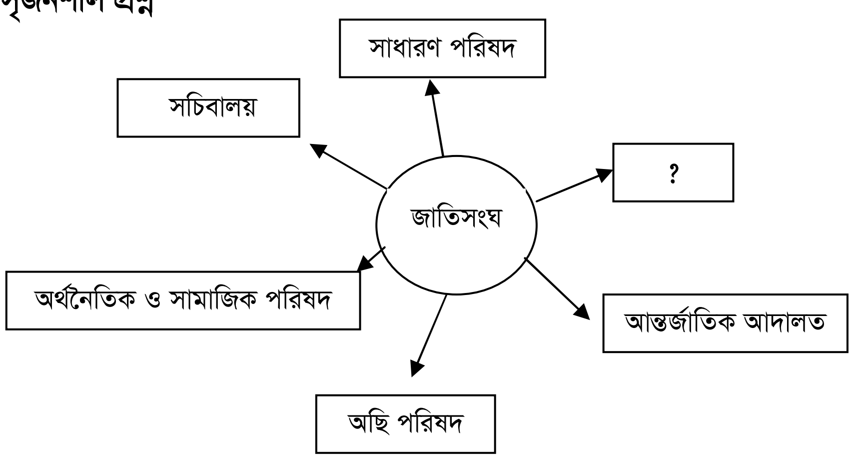
৪। উদ্দীপকে কোন সংস্থার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?
(ক) আফ্রিকান ইউনিয়ন (খ) আসিয়ান (গ) সার্ক (ঘ) ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

৫। উক্ত সংস্থার উদ্দেশ্য হল সদস্য রাষ্ট্রগুলোর-
i. আর্থিক উন্নয়ন
ii. শিক্ষা উন্নয়ন
iii. ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। সাধারণ পরিষদের বিশেষ দিক হল-
i. জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রই এর সদস্য
ii. প্রতিটি সদস্যের একটি করে ভোটাধিকার
iii. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই এর দায়িত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



(ক) কমনওয়েলথ এর প্রধান কে?

(খ) আন্তর্জাতিক আদালত বলতে কী বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে যে অঙ্গ সংগঠনটির নাম বসবে, সেই সংগঠনের গঠন প্রণালি ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) বিশ্ব শান্তি রক্ষায় উক্ত সংগঠনের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

২। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে। উক্ত সংগঠন বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত সর্ববৃহৎ সংগঠন। সংগঠনটি বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে উক্ত সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উক্ত সংগঠনের কাজে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছে।

(ক) বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূল কথা কী?

(খ) কমনওয়েলথ কী?

(গ) উদ্দীপকে যে সংগঠনটির কথা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উক্ত সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

৩। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াচ্ছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের অনেক পরাধীন রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ রাষ্ট্রগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে। এ সংস্থার প্রধান সেই সাবেক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের রাজা বা রাণী। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশও এ সংস্থার সদস্য হয়। বাংলাদেশসহ প্রতিবেশি অনেক রাষ্ট্রের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছর উক্ত সংস্থার বৃত্তি নিয়ে সে দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গমণ করে।

(ক) OIC এর পূর্ণরূপ কী।

(খ) কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান পদাধিকার বলে কমনওয়েলথ এর প্রধান?

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার উদ্দেশ্য তুলে ধরুন।

(ঘ) উদ্দীপকের সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। খ ৫। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ ৬। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ ৫। খ ৬। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। খ ৭। ঘ ৮। ক ৯। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৮ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯ ঃ ১। খ ২। খ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১০ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। গ

বাংলাদেশে সুশাসনের ইস্যুসমূহ

ইউনিট ১০

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মূল লক্ষ্য মানব উন্নয়ন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও জাতিসংঘ প্রত্যেক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি জোর দিচ্ছে। একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন। সুশাসন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনী কাঠামো ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে, যা দারিদ্র বিমোচন,পরিবেশ সুরক্ষা, লিঙ্গগত বৈষম্য রোধ করে। আলোচ্য ইউনিটে বাংলাদেশ ও সুশাসন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন ও রাজনীতি, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয়, খাদ্যে ভেজাল ও আমাদের করনীয়, পরিবেশ দূষণ ও সুশাসন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১: বাংলাদেশ ও সুশাসন
পাঠ-২: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)
পাঠ-৩: সুশাসনে নারীর ক্ষমতায়নের ভূমিকা
পাঠ-৪: দুর্নীতি: কারণ ও প্রতিকার
পাঠ-৫: জলবায়ু পরিবর্তন ও রাজনীতি
পাঠ-৬: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয়
পাঠ-৭: খাদ্যে ভেজাল ও আমাদের করণীয়
পাঠ-৮: পরিবেশ দূষণ ও সুশাসন

পাঠ-১০.১ বাংলাদেশ ও সুশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুশাসন কাকে বলে জানতে পারবেন।
- সুশাসনের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সুশাসনের ইস্যুসমূহ সম্পর্কে জানতে করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অংশগ্রহণ, বিকেন্দ্রীকরণ, তথ্য অধিকার, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা।

সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ (Good Governance)। শাসন শব্দের সাথে সুপ্রত্যয়টি যুক্ত করা হয়েছে। সুশাসনকে একক কোনো ধারণা দিয়ে সংজ্ঞায়িত বা ব্যাখ্যা করা যায় না। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। সুশাসনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে একটি কল্যাণকর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। সুশাসনের মাধ্যমে নাগরিক সমাজের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

সুশাসন হল সরকারের এমন এক ব্যবস্থা যার লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক ও উন্মুক্ত যোগাযোগ নিশ্চিত করা। সেই সাথে কার্যকরি ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি, নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং প্রতিনিধিত্বকারী দায়িত্বশীল সরকারি কাঠামোকে ক্রিয়াশীল করা।

অর্থাৎ, যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুরক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত, বাক স্বাধীনতা থাকে, সেই শাসনকে সুশাসন বলা যায়।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন। যে কোন রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সুশাসন। সুশাসিত রাষ্ট্রই কেবলমাত্র কল্যাণ রাষ্ট্র হতে পারে।

সুশাসন কথাটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত ধারণা। একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক সর্বপ্রথম উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সুশাসন ধারণাটিকে গুরুত্ব দিয়েছে। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় চারটি শর্ত ঘোষণা করে। সেগুলো হলো : ১. দায়িত্বশীলতা ২. স্বচ্ছতা ৩. আইনী কাঠামো ৪. অংশগ্রহণ

১। **দায়িত্বশীলতা :** প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সঠিক সময়ে পালনই দায়িত্বশীলতা। বাংলাদেশে সরকারি কার্যালয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে দায়িত্বশীলতার চরম ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।

২। **স্বচ্ছতা :** সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা অপরিহার্য। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সেবা বন্টনের ক্ষেত্রে কখন কোথায় কিভাবে কতটুকু সম্পদ বা সেবা প্রদান করা হল তার তথ্য জানা প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে সরকার ও জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

৩। **আইনী কাঠমো :** দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা আইনের শাসন এগুলো নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ও দক্ষ আইনী কাঠামো প্রয়োজন। যেমন, কর্মস্থলে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে পূর্বের চেয়ে অধিক স্বচ্ছতা এসেছে। এভাবে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও পুরনো আইন হালনাগাদ করে সুশাসন উপযোগী একটি আইনী কাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য।

৪। **অংশগ্রহণ :** অংশগ্রহণ বলতে মূলত সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের ভূমিকাকেই বোঝায়। এ জন্য অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রয়োজন। নির্বাচন, সভা-সমিতি, ইশতেহার, শোভাযাত্রা, সেমিনার এর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা যায়।

বাংলাদেশ ও সুশাসন :

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসনামলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে সুশাসনের কোন চিহ্ন ছিল না, ছিল না মানবাধিকার, ছিল না সম্পদ বন্টনে সমতা আর আইনের শাসন। স্বাধীনতার পর শুরু হল দেশ গড়ার সংগ্রাম। দেশ গড়ার সংগ্রামে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুশাসনের অনুপস্থিতি। দেশি-বিদেশী চক্রান্ত আর অবৈধ ক্ষমতা দখলের পরিণতিতে সুশাসন ক্রমাগত বিলম্বিত হয়েছে।

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অত্যন্ত জরুরি। শাসনকার্যে জনসম্পৃক্ততা যত বৃদ্ধি পাবে, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও একইভাবে বৃদ্ধি পাবে। কারণ জনগনের মতামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়ন হলে তা সুশাসনেরই নামান্তর। বাংলাদেশে সুশাসনের জন্য দরকার লিঙ্গভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ সরকার লিঙ্গ ভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুশাসনের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে তৃনমূল পর্যায়ে যতটা সম্প্রসারিত করা যাবে সুশাসন ততটাই জোরদার হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে এক্ষেত্রে নানা ধরণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে সুশাসনের ইস্যুসমূহ :

বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থা ও বিশেষজ্ঞগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনেকগুলো পূর্বশর্ত বা উপাদানের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। বাংলাদেশ বর্তমানে সেগুলো পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। সুশাসনের ইস্যু রাষ্ট্র ও সমাজভেদে আলাদা হতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ ধরণের বিশেষ কয়েকটি ইস্যু রয়েছে। যেমন দুর্নীতি, পরিবেশ দূষণ, অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া খাদ্যে ভেজাল, নারী নির্যাতন, জলবায়ু পরিবর্তনের আঘাতে উপকূলীয় অঞ্চলসহ বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ এবং কৃষি জমির ক্ষতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার অভিযানে এ ইস্যুগুলো ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এসব ইস্যুগুলো অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সুশাসনের ইস্যুসমূহ সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সুশাসন প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ `Good Governance'। সুশাসনের কতকগুলি উপাদান রয়েছে। সেই উপাদানগুলির উপস্থিতি নিশ্চিত হলে একটি রাষ্ট্র সুশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। একটি সুশাসিত রাষ্ট্রই পারে নাগরিকদের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সুশাসন প্রত্যয়টি প্রথম প্রচলন করে-

(ক) জাতিসংঘ (খ) ইইউ

(গ) ইউএসএ (ঘ) বিশ্বব্যাংক

২। সুশাসনের ইস্যু বলতে বুঝায়-

(ক) সুবিধা (খ) প্রতিকূলতা

(গ) অপ্রযোজ্যতা (ঘ) অপরিহার্যতা

৩। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন

i. জবাবদিহিতা

ii. দায়িত্বহীনতা

iii. স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

পাঠ-১০.২ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা কি তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সমস্যা উত্তরণে বাংলাদেশের সক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- টেকসই উন্নয়ন প্রস্তাবনা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	টেকসই উন্নয়ন, লক্ষ্যমাত্রা, সহসশ্রাব্দ উন্নয়ন, প্রস্তাবনা, খাদ্য নিরাপত্তা।

যে উন্নয়ন ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নয়ন চাহিদার কোন ধরণের ক্ষতি না করে বর্তমান উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করতে পারে, সে ধরণের উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন বলে। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮৭ সনে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষযে প্রকাশিত প্রতিবেদনে টেকসই উন্নয়নে দুটি মূল ধারণার কথা বলা হয়েছে।

১. দরিদ্র শ্রেণির অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানো।
২. পরিবেশ সুরক্ষায় যৌক্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার।

বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন বলতে এক কথায় সামাজিক সম্পৃক্তকরণ এবং পরিবেশ সম্মত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝায়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা :

টেকসই উন্নয়ন হল ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ক্ষমতা এবং বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে 'রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী: ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' শিরোনামে প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২০১৬ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তিনদিন ব্যাপী বিশ্ব সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সব লক্ষ্যমাত্রা অনুমোদিত হয়েছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) কে প্রতিস্থাপন করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। নিম্নে টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা আলোচনা করা হল।

১। দারিদ্র বিমোচন : সর্বত্র এবং সবধরণের দারিদ্র দূরীকরণ।
২। ক্ষুধামুক্তি : ক্ষুধা দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু করণ।
৩। সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ : স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিতকরণ জাতি, ধর্ম ও বয়স নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণ বৃদ্ধি।
৪। মানসম্মত শিক্ষা : মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ আইন।
৫। লিঙ্গ সমতা : লিঙ্গ সমতা অর্জন ও সকল নারী ও কন্যা শিশুর মর্যাদা নিশ্চিতকরণ।
৬। বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন : সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুযোগ সৃষ্টি ও এর টেকসই ব্যবস্থাপনা।
৭। টেকসই জ্বালানি : সবার জন্য ব্যয় সাধ্য, নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সৃষ্টি ও এর টেকসই ব্যবস্থাপনা।
৮। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং ভালো কাজের নিশ্চয়তা বিধান।
৯। শিল্প উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো : দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং টেকসই শিল্পায়ন ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।
১০। বৈষম্য হ্রাসকরণ : দেশের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বৈষম্য দূর করা।
১১। টেকসই শহর : শহরে নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই বাসস্থান নির্মাণ করা।
১২। সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার : টেকসই ভোগ ও উৎপাদন নিশ্চিত করা।
১৩। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ : জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রভাব মোকাবেলায় জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ।
১৪। সমুদ্রের সুরক্ষা : টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর এবং সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।

১৫। ভূমির সুরক্ষা : টেকসই বন ব্যবস্থাপনা,মরুকরণ রোধ করা, ভূমিক্ষয় রোধ এবং জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন বন্ধ করা।

১৬। শান্তি ও ন্যায়বিচার : টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সকলের জন্য ন্যায় বিচারের সুযোগ সৃজন।

১৭। লক্ষ্য অর্জনের জন্য অংশিদারিত্ব : টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক উন্নতি করা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সক্ষমতা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করেছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। বাংলাদেশসহ ১৯৩টি দেশ পনেরো বছর মেয়াদি ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । ২০৩০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র টেকসই বিশ্ব নয় বরং সমৃদ্ধি, সমতা ও সুবিচারের দিক থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বৈশ্বিক উন্নয়নের একটি নতুন এজেন্ডা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পূর্বে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ হতে ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) হাতে নেয়া হয়। ২০১৫ সালে শেষ হওয়া এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সফলতা বেশ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ এমডিজি'র যেসব খাতে সফল হয়েছে সেগুলো হল দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং লিঙ্গভিত্তিক সমতা। এই সফলতাকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন এসডিজির সফল বাস্তবায়ন। কেননা ২০১৬ থেকে ২০৩০ মেয়াদে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের উদ্দেশ্য হলো : দারিদ্র দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিমান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যমান অর্জন, মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, নারীর সর্বজনীন ক্ষমতায়ন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলাসহ সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। এসডিজির লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন যেমন আছে, তেমনি বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের স্থিতিশীলতা আনার কর্মসূচিও আছে। জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি কমানো থেকে শুরু করে শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ বিনির্মাণ করা কিংবা সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রভৃতি বিষয়সমুহ এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিবে। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের সহযোগিতা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রনীতব্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় সাধন করে এসডিজি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশ অবশ্যই সফল হবে।

প্রস্তাবনা :

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কিছু প্রস্তাবনা রয়েছে। নিম্নে আলোচনা করা হল:

১। সরকারি কর্মকর্তাদের পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান ।
২। আধুনিক সতর্ককারী ব্যবস্থা চালু করে আবহাওয়াজণিত বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় মানুষকে নিরাপত্তা দান।
৩। গণসচেতনতা তৈরি করতে সুশীল সমাজের উদ্যোগী ভূমিকা নিশ্চিত করা।
৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে কোর্স চালু করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫। জলবায়ু সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
৬। বিকল্প জ্বালানি ও প্রযুক্তি উৎপাদন এবং ব্যবহার করতে হবে।
৭। টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।
৮। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
৯। গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন করে এরূপ যানবাহন বন্ধ করার জন্য কর আরোপ করতে হবে।
১০। সৌরশক্তি, বায়ুকল এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	এসডিজি এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সারা বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৭টি লক্ষ্য (এসডিজি) নির্ধারিত হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রার মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে এসডিজি গৃহীত হয়েছে। এর লক্ষ্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন চাহিদার কোনরূপ ক্ষতি না করে বর্তমান উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করা। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-কে প্রতিস্থাপিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এসডিজি কাদের প্রয়োজন মেটাবে?

(ক) উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠী (খ) বর্তমান ও ভবিষৎ জনগোষ্ঠী

(গ) বর্তমান জনগোষ্ঠী (ঘ) মধ্যবিত্ত

২। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হল এমন একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা, যার লক্ষ্য-

(ক) বৈশ্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত

(খ) বর্তমান উন্নয়ন সংক্রান্ত

(গ) মধ্য আয়ের দেশগুলির উন্নয়ন সংক্রান্ত

(ঘ) অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন সংক্রান্ত

৩। এসডিজির ১৫ বছর মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা শেষ হবে-

(ক) ২০২৫ সালে (খ) ২০৩০ সালে

(গ) ২০৩২ সালে (ঘ) ২০৩১ সালে

পাঠ-১০.৩ সুশাসনে নারীর ক্ষমতায়নের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুশাসনে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দুর্নীতি, জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা, ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার

যে কোন রাষ্ট্রের উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রার মূল চাবিকাঠি সুশাসন। সুশাসন নিশ্চিত না হলে কোন রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হতে পারে না। সুশাসন বলতে সাধারণত কিছু নিয়মনীতিকে বুঝায় যেগুলো সরকারি সংগঠনসমূহের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, সুশাসন দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করে। সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যত চাহিদা পূরণের দায়বদ্ধতা শাসন ব্যবস্থার উপরই বর্তায়।

একটি রাষ্ট্রে সুশাসন তখনই নিশ্চিত হয় যখন সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত হয়। সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশসহ ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। উভয়ের সহযোগিতায়ই অর্জিত হয় সুশাসন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী তাই নারীদেরকে ব্যতিরেকে কোন শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব নয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের মূল কথা হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্যহীন এক পৃথিবী গড়ে তোলা। যেখানে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তাঁর নিজের জীবনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। নারী ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারী বিদ্বেষী ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন, নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ।

অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন তাঁর গবেষণায় তুলে ধরেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই হবে যখন কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ থাকবে। সেটা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পর্যায়ে হতে পারে। একজন কর্মক্ষম নারী শ্রমের বিনিময়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলে পরিবার, সমাজ তাঁর সিদ্ধান্তের গুরুত্ব দেবে। তিনি সামাজিক কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। এভাবেই নারীর উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মানব উন্নয়ন সাধিত হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাতে (এসডিজি) নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে যেকোনো নীতি নির্ধারণে এখন নারীরা গুরুত্ব পাচ্ছে। স্থানীয় সরকার, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নারীর উপস্থিতি ক্রমাগত বাড়ছে। তৈরি পোষাক শিল্পে কর্মরত সিংহভাগ শ্রমিক নারী। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশে মোট কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লাখ নারী।

নানা ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হলেও, নারীর প্রতি সামাজিক ও কাঠামোগত বৈষম্য ও বৈরিতার অবসান হয় নি। নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে বটে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এখনও সক্ষমতা অর্জন হয় নি। এখনো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর মতামত খুব বেশি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় না। পরিস্থিতির উন্নয়নে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামোতে আরো পরিবর্তন আনতে হবে। বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা

প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক আইন সংযোজন করতে হবে। শুধু তাই নয়, বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগও ঘটাতে হবে। মোট কথা, নারীর ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রকে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বুঝায়?

সারসংক্ষেপ

সুশাসনের সাথে নারীর ক্ষমতায়ন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সুশাসনের একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী ও পুরুষের সম অংশগ্রহণ। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা সক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে চলেছে অবিরাম। কিন্তু নারী বিদ্বেষী শক্তিগুলোর কারণে এখনো বাংলাদেশের নারীদেরকে নানা রকমের বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের জন্য রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কত?

(ক) দেড় কোটির বেশি　　(খ) দুই কোটির বেশি

(গ) এক কোটির কম　　(ঘ) কোনটিই নয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন

পপী বেগম একজন গৃহিণী। সংসারে কোন মতামত দেবার অধিকার তাঁর নেই। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে। অন্যদিকে সালমা বেগম গার্মেন্টসে কাজ করে। প্রতি মাসে সংসারের খরচ বাবদ তিনি স্বামীর হাতে টাকা তুলে দেন। স্বামী তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। কারণ তার স্ত্রী সংসারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। অর্থনৈতিক অবদান রাখতে না পারায় সংসারে পপি বেগমের কোন মতামতই থাকছে না।

২। এর মূল কারণ হচ্ছে :

i. অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার অভাব

ii. রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতার অভাব

iii. সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii　　(খ) ii ও iii　　(গ) i ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৪ দুর্নীতি: কারণ ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দুর্নীতি কি জানতে পারবেন।
- দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দুর্নীতি, মূল্যবোধ, কৌশল, আইন, প্রশাসন, সচেতনতা।

দুর্নীতি এক ধরনের সামাজিক ব্যাধি। যেসব সমস্যা আমাদের সমাজের সর্বত্র মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে চলেছে তার মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম। গোটা সমাজই আজ দুর্নীতি নামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত। গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজের একজন সাধারণ নাগরিকের সম্পর্কেও দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়। দুর্নীতি অতীতেও ছিল। প্রাচীন ভারতের পন্ডিত কোটিল্য প্রায় দু'হাজার বছর আগে তাঁর অর্থশাস্ত্রে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

দুর্নীতির ধারণা

দুর্নীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা বেশ জটিল। কারণ সমাজভেদে এবং একই সমাজে যুগভেদে নীতি, আদেশ ও মূল্যবোধের পার্থক্য দেখা দেয়। দুর্নীতি যেহেতু নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থীমূলক কাজ, সেহেতু দুর্নীতিমূলক কাজের উদাহরণ দিতে গেলে স্থান-কাল-পাত্র-আদর্শ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হয়। সাধারণভাবে দুর্নীতি বলতে আইন ও নীতির বিরুদ্ধ কাজকে বুঝায়। দুর্নীতির সাথে পেশা, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, পদবি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে জড়িত।

দুর্নীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল "Corruption" এই শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Corruptus" থেকে। এর অর্থ ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন। দুর্নীতি সব সময়ই নেতিবাচক শব্দ। আভিধানিক অর্থে দুর্নীতি হল নীতির বিরুদ্ধে আচরণ।

'ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' মনে করে ''সমকালীন বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দুর্নীতি। জাতিসংঘ প্রণীত ম্যানুয়াল অপ অ্যান্টি-করাপশন পলিসিতে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই হল দুর্নীতি।

বাংলাদেশের 'দুর্নীতি দমন কমিশন' এর একটি প্রকাশনাতে দুর্নীতি বলতে বোঝান হয়েছে, ''ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি।'' যেমন- রাষ্ট্রীয় সম্পদের অব্যবহার, সরকারি সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে অস্বচ্ছতা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অসৎ উদ্দেশ্যে প্রভাব বিস্তার, ঘুষ গ্রহণ, অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার সবই দুর্নীতি।

এক কথায় স্ব-স্ব অবস্থান ও পেশার মাধ্যমে অবৈধ স্বার্থ উদ্বারের লক্ষ্যে পরিচালিত আচরণই দুর্নীতি।

দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব

দুর্নীতি সমাজকে কলুষিত করে। দুর্নীতি জাতীয় সম্পদের বেআইনী বন্টন ও অপচয় ঘটায়। ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআইবি) ২০১৬ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক, বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে ত্রয়োদশতম দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ। দুর্নীতির ফলে এক শ্রেণির মানুষ রাতারাতি সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে। ফলে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত ২০১৫ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সমগ্র দেশে ৮৮২৮ কোটি টাকা ঘুষ দেনদেন হয়েছে, যা জিডিপির ০.৬%। দুর্নীতি সরকারি আইন-কানুনের ব্যতয় ঘটায়। নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে। রাষ্ট্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধা গ্রস্থ হয় এবং ভবিষৎ প্রজন্ম বিভ্রান্ত ও বঞ্চিত হয়।

দুর্নীতির কারণ

নিম্নে দুর্নীতির কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল :- (১) বেকারত্ব, (২) রাজনৈতিক প্রভাব (৩) পারিবারিক সংস্কৃতি (৪) আইনের দুর্বলতা (৫) দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের অভাব (৬) অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা (৭) আমলাদের প্রভুসুলভ মানসিকতা (৮) নৈতিক শিক্ষার অভাব (৯) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি। উল্লেখিত কারণগুলো থেকে সৃষ্ট দুর্নীতির দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়

দুর্নীতি সুশাসনের অন্যতম অন্তরায়। দুর্নীতি সরকারি নীতিসমূহকে কলুষিত করে ও সম্পদের বে-আইনী বন্টন ঘটায়। দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের সংশোধন ও যথাযথ বাস্তবায়ন, মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করা জরুরি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ জরুরি। দুর্নীতিকে বর্জন করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সৎ ও নির্দেশনামূলক পরামর্শ, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সমাজ থেকে ‘দুর্নীতি’ নামক বিষয়টি দূরীভূত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দুর্নীতি কী? দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিরোধের তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। দুর্নীতি হল, ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার। দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা, সামাজিক সচেতনতা, দক্ষ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাহলেই সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ‘ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি’- এই সংজ্ঞা কোন সংস্থার?

(ক) মানবাধিকার কমিশন (খ) জাতিসংঘ

(গ) আন্তর্জাতিক আদালত (ঘ) দুদক

২। দুর্নীতি একটি সর্বগ্রাসী-

(ক) শারীরিক ব্যাধি (খ) মানসিক ব্যাধি

(গ) সামাজিক ব্যাধি (ঘ) চিন্তামূলক ব্যাধি

৩। দুর্নীতি শব্দটি এসেছে ?

(ক) ল্যাটিন শব্দ Corruptus থেকে

(খ) গ্রীক শব্দ Corruption থেকে

(গ) ইংরেজি শব্দ Damage অর্থ ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন থেকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বড় ভাইয়ের বিপুল প্রতিপত্তি দেখে ছোট ভাই মনোয়ার সব সময় হীনমন্যতায় ভোগে। মনোয়ারের স্ত্রী ও তার স্বামীর টাকা পয়সা না থাকার কারণে বড় ভাইয়ের সাথে তুলনা করে। বিপুল ধনসম্পদ থাকায় বড় ভাই সমাজে সকলের কাছে শ্রদ্ধাভাজন। মনোয়ার এসব দেখে মনে মনে ইর্ষান্বিত হয়। এক পর্যায়ে সে দুর্নীতির পথে পা বাড়ায়।

৪। উদ্দীপকে মনোয়ার কোন বিষয়টির দ্বারা দুর্নীতিতে প্রভাবিত হয়?

(ক) মানসিক হীনমন্যতা (খ) উচ্চভিলাষী জীবনের মোহ

(গ) সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি (ঘ) সব কয়টি

৫। উদ্দীপকের দুই ভাইয়ের ঘটনা দুর্নীতির বিস্তার ঘটায়

i) অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করায়

ii) অর্থকে প্রধান মানদন্ড বিবেচনা করায়

iii) সামাজিক মর্যাদা লাভের আশায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৫ জলবায়ু পরিবর্তন ও রাজনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জলবায়ু পরিবর্তন কী বলতে পারবেন।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার রাজনীতি বুঝতে পারবেন।
- জলাবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করণীয় আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈশ্বিক উষ্ণতা, গ্রীণ হাউজ গ্যাস, বৃক্ষ নিধন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, নীতি ও কৌশল, ক্ষতিপূরণ, অভিযোজন, কনফারেন্স অব পার্টিস (কপ)

জলবায়ু একটি নির্দিষ্ট আয়তনের এলাকার দীর্ঘ দিনের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। এর পরিবর্তন অতি দীর্ঘ ব্যবধানে হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু জলবায়ু অস্বাভাবিক ও দ্রুত পরিবর্তন আজ সমগ্র বিশ্বের চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশেও জলবায়ুর পরিবর্তন খুব স্পষ্ট লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে অতি দীর্ঘতর এবং উষ্ণতর গ্রীষ্মকাল, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তৃত এলাকায় সমুদ্রের লোনা পানির প্রবেশ খুব সহজেই দৃশ্যমান। এ পরিবর্তনের সাথে রাজনীতি অনাকাঙ্খিতভাবে জড়িত। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থার গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত উষ্ণায়নই দায়ী। আর এই উষ্ণায়ন তেরি হয় উন্নত দেশগুলোর অতি শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং ভোগবাদী ব্যবস্থাপনার কারণে। অর্থাৎ উন্নত দেশের ভোগ-বিলাসের বিপরীতে জান-মাল ও প্রাকৃতিক ঝুঁকিতে পড়ছে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো। জলবায়ু পরিবর্তনের এই বৈপরীত্য মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন পড়ে রাজনৈতিক উদ্যোগ। তাই এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে জলাবায়ু পরিবর্তন ও রাজনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো আলোচনা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। নিচে জলবায়ু পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হল -

গ্রীণ হাউজ গ্যাসঃ

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হল কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরিনেটেড গ্যাস। শিল্পায়ন, নগরায়ন এর ফলে অধিক পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন ইত্যাদি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। কিছু উপজাত হিসেবে নির্গত হচ্ছে অধিক তাপ ও গ্রীণ হাউস গ্যাস। এক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর, যা একাই ৬৪% উষ্ণতা তৈরি করে। তাছাড়া মিথেন ১৭% এবং নাইট্রাস অক্সাইড ৬% উষ্ণায়ন করে থাকে। বৈষয়িক উষ্ণায়নে দায়ী কয়েকটি উন্নত দেশের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল-

আমেরিকার পরিবেশ নিরাপত্তা সংস্থার হিসাব মতে ২০১১ সালে চীন ২৮%, আমেরিকা ১৬%, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ১০%, ভারত ৬%, রাশিয়া ৬% এবং জাপান ৪% গ্রীণ হাউজ গ্যাস নির্গমণ করেছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিশ্বের প্রায় ১০টি দেশ প্রায় ৭০ ভাগ গ্যাস নির্গমণ করে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের নির্গমণ মাত্র ০.৩%, অথচ ক্ষতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম একেবারে উপরের দিকে।

নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন :

শিল্পায়ন, নগরায়ন সর্বোপরি জীবিকার তাগিদে বিশ্বের বনভূমি দিন-দিন হ্রাস পাচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বে বছরে ১৩.৭ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি উজার হচ্ছে, যা প্রায় গ্রীস রাষ্ট্রের সমান। কিন্তু নতুন সৃষ্টি হচ্ছে মাত্র তার অর্ধেক। এ বিষয়েও চিত্র প্রায় উল্টো। যেসব দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে তাদের বনভূমি কম এবং তা দ্রুত কমছে। বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ১০ ভাগেরও কম। বনভূমি হ্রাস পাওয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা শোষিত না হয়ে বায়ুমন্ডলকে উষ্ণ করছে। তাছাড়া কৃষি আবাদ বৃদ্ধিতে বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার কীটনাশক ব্যবহার ও অতিরিক্ত গবাদি-পশু পালন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার রাজনীতি :

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সকল গবেষণাই এর জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে। অনুন্নত দেশগুলো যখন বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে তখন উন্নত দেশগুলো উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও ভোগ বিলাসে মত্ত। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দুই ধরনের রাজনীতি দেখা যায়-

আন্তরাষ্ট্রীয় :

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, রাষ্ট্র ও স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো সংগঠনগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা নিয়মিত সম্মেলনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অংশীদারিত্ব তৈরি করছে। তথাপি অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো ন্যায্য ক্ষতিপূরুণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই রাজনৈতিক প্রচেষ্টা আরো জোরদারে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন ফোরাম এ জোরালো অবস্থান তৈরি করছে। কিন্তু বিভিন্ন সম্মেলনে এ পর্যন্ত প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণের অর্থ দেশগুলো এখনও তেমনভাবে পায় নি। তাই বিশ্লেষকগণ মনে করেন প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐক্যের মাধ্যমে আরো চাপ সৃষ্টি করা উচিত।

অভ্যন্তরীণ :

জলবায়ু পরিবর্তনে উন্নত দেশগুলো দায়ী কিন্তু তাদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ ও শর্ত পূরণের বিষয়। তাই বাংলাদেশ সরকার স্ব-উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার পথ ধরে ইতোমধ্যে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এজন্য দেশীয় সম্পদ ও প্রযুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা জন্য অধিকতর রাজনৈতিক ঐক্য ও উদ্যোগ জরুরি। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি থাকার পরও, রাজনৈতিক দলগুলো জলবায়ু পরিবর্তনকে এখনো তাঁদের রাজনৈতিক ইস্যু করছে না বা পরিবেশাবাদী কোন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠছে না। কানাডা, জার্মানির মতো দেশগুলোতে পরিবেশবাদী রাজনৈতিক দল রয়েছে। এই দলগুলো এখন সরকারের উপর নানাবিধ চাপ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) এর গবেষণায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তন এই তহবিলেও দুর্নীতি হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দুর্নীতি ও অবহেলা মোকাবেলা করার জন্যও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ জরুরি। সময়োপযোগী নীতি ও কৌশল প্রয়োগে রাজনৈতিক সদিচ্ছা অপরিহার্য।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করণীয়

রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন যুক্ত করার কোন বিকল্প নেই। নিচে সরকার এবং রাজনৈতিক সংগঠনের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

১. সরকারি নীতিমালায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা
২. সরকারি-বেসরকারি গবেষণা বৃদ্ধি করা
৩. পরিবেশবাদী রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি
৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ে অভিজ্ঞ টিম গঠন। এ টিমের কার্যক্রম হবে ক্ষতিপূরণের যৌক্তিকতা নিরুপণে প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা এবং প্রয়োজনে লবিং/যোগাযোগ করা।

পরিশেষে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী নয়। দায়ী রাষ্ট্রগুলো চেষ্টা করলেই পৃথিবীর তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে (২$^{\circ}$c এর কম বৃদ্ধি) রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবগুলো আলোচনা কর।

সারসংক্ষেপ

দ্রুত ও অস্বাভাবিক জলবায়ু পরিবর্তন সমগ্র পৃথিবীর জন্য হুমকিস্বরূপ। জীবাশ্ম জ্বালানির অধিকতর ব্যবহার, বনাঞ্চল ধ্বংস করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে মানবসৃষ্ট কারণই দায়ী এবং তা করছে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলো। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং অভ্যন্তরীণ উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য দায়ী

i. বৃক্ষরোপণ

ii. গ্রীণ হাউজ গ্যাস

iii. অতিরিক্ত গবাদিপশু পালন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটিই নয়

২। শিল্পোন্নত চীন বিশ্বের কতভাগ গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন করে?

(ক) ২০% (খ) ২২%

(গ) ২৫% (ঘ) ২৮%

৩। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?

(ক) নীতি ও কৌশল প্রণয়ন

(খ) আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজ দেশের অবস্থান তুলে ধরা

(গ) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা

(ঘ) সব কয়টি

পাঠ-১০.৬ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হবেন।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জলবায়ু, গ্রীণ হাউজ, সমুদ্রের পানির উচ্চতা, সিডর, আইলা, বৈশ্বিক, চরম আবহাওয়া

কোন স্থানের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের (অন্তত ১ সপ্তাহ) বায়ুর তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ, বায়চাপের মিলিত অবস্থাকে সে সময়ের আবহাওয়া বলে। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে কোনো স্থানের তাপ, চাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি ২৫ থেকে ৩০ বছরের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়। অর্থাৎ আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাই জলবায়ু।

জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, উষ্ণতা বাড়ছে পৃথিবীর। মানুষের নানা কর্মকান্ডে বায়ুমন্ডলে কার্বন অক্সাইড, মিথেন ক্লোরোফ্লোরো কার্বনসহ বিষাক্ত গ্যাসের নিঃসরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ুমন্ডলের ক্রমবর্ধমান উত্তাপই বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনে বার বার বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছাস হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে বাড়ছে ভূমিহ্রাস, ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ। এসব কিছু মানবগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উপর দারুন প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনে পৃথিবীর যে দেশগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তার মূল কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশেষজ্ঞদের মতে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যে নানা রকম প্রভাব দেখা দিচ্ছে সেগুলি হল :-

১. অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০১০ খ্রিস্টাব্দে গড়ে বিগত পনের বছরের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। কিন্তু সিলেট ও রাজশাহীতে বিগত দুই বছরের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে।
২. ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি: ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ঝুকিপূর্ণ ১২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয়।
৩. মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি: মাটিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০ সালে লবণাক্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ হেক্টর , ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ লক্ষ হেক্টরে ।
৪. গাছপালা ও প্রাণী ধ্বংস: বাংলাদেশের বনাঞ্চল ক্রম হ্রাসমান। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বনভূমির পরিমাণ ১১%, যেখানে একটি দেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ ন্যূনতম ২৫% হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৫. সুপেয় পানির সংকট: দেশের অধিকাংশ নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার কারণে অনেক সাধারণ নলকূপ অকেজো হয়ে পড়েছে।
৬. জীব বৈচিত্র ধ্বংস: বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে জীব বৈচিত্র হারিয়ে যাচ্ছে। গত একশ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩১ প্রজাতির বন্য প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
৭. মরুকরণ: গড় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার ফলে খরার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং যে কোন দেশের অভ্যন্তরে করণীয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. শিল্প উন্নত দেশগুলোতে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ আরো কমিয়ে আনতে হবে।
২. পরিবেশ দুষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
৩. জলবায়ুর প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করে, যথোপযুক্ত সচেতনতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
৫. প্রাকৃতিক শক্তি (যেমনঃ প্রবাহবান বায়ু, পানি শক্তি এবং সৌর শক্তি)-এর ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের করণীয়ঃ

১. সরকারি নীতিমালায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিভিন্ন নীতি সংযোজন করতে হবে ।
২. সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আলোচনা করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করণীয় স্থির করতে হবে।
৩. পরিবেশ বিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিপূরণ আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

এছাড়া, নদী ড্রেসিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি, নদী ভাঙ্গন রোধ, কীটনাশক ব্যবহার নিষিদ্ধ, গ্রীণ হাউজ গ্যাস উৎসারণ কমানোসহ আনুষঙ্গিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে জলবায়ুর প্রভাব থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত হওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ চিহ্নিত করে প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করুন।

সারসংক্ষেপ

সমগ্র পৃথিবীর মত বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী না হয়েও সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে লবণাক্ত পানি কৃষি জমিতে প্রবেশ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি এখন বাস্তবতা। তাই এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কত সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে?
(ক) ২০৫০ (খ) ২০৬০
(গ) ২০৭০ (ঘ) ২০৮০

২। কোনটি ঠিক?
(ক) জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক বাস্তবতা (খ) জলবায়ু পরিবর্তনের দেশিয় বাস্তবতা
(গ) জলবায়ু পরিবর্তনের আঞ্চলিক বাস্তবতা (ঘ) কোনটি নয়

৩। বাংলাদেশ থেকে ইতোমধ্যে কত প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে?
(ক) ৩০ (খ) ৩১
(গ) ৩২ (ঘ) ৩৩

পাঠ-১০.৭ খাদ্যে ভেজাল ও আমাদের করণীয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- খাদ্যে ভেজাল কী বলতে পারবেন।
- খাদ্যে ভেজালের কারণ আলোচনা করতে পারবেন।
- খাদ্যে ভেজাল রোধে আমাদের করণীয় কী তা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ফরমালিন, ইউরিয়া, কীটনাশক, কার্বাইড, আইনী কাঠামো, মান নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ

প্রতিটি মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। আবার ভেজাল খাদ্য গ্রহণ জীবন নাশ করে। বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও আমলাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও উদাসীনতার সুযোগে তারা এই ঘৃণিত কাজ করে যাচ্ছে। যখন কোন সঠিক খাবার বা উৎকৃষ্ট খাবারের সঙ্গে খারাপ খাবার বা নিকৃষ্ট খাবার মেশানো হয় তাকে খাদ্যে ভেজাল বলে। যে খাবার মানসম্মত নয়, স্বাস্থ্যকর নয়, বরং স্বাস্থ্যের জন্য অধিক ক্ষতিকর সেটাই 'ভেজাল খাদ্য'। সুস্থ জীবন আর রোগমুক্ত জীবনের নিশ্চয়তার জন্য ভেজাল প্রতিরোধে সকল মানুষেরই সোচ্চার হতে হবে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

"ভেজাল" একটি আইনি শব্দ, যার অর্থ মিশ্রিত, মেকী বা খাঁটি নয় এমন। উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সাথে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণকে ভেজাল বলে। অন্য কথায় খাদ্যের পরিমাণ, স্থায়ীত্ব অথবা স্বাদ বৃদ্ধির জন্য কাঁচা বা প্রস্তুতকৃত খাদ্য সামগ্রীতে এক বা একাধিক ভিন্ন পদার্থ সংযোজন। নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ আলোকে " বিভিন্ন উপায়ে খাদ্যে পরিবর্তন সাধন করে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, আইনের অধীন নিষিদ্ধ, খাদ্য দ্রব্যের ক্ষতি হয়েছে, গুণাগুন বা পুষ্টিমান হ্রাস পেয়েছে, খাদ্য ক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়েছে" এমন খাদ্যই ভেজাল খাদ্য। খাদ্যে ভেজাল দেয়ার জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদন্ড ও ২০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

খাদ্যে ভেজালের সাম্প্রতিক চাল চিত্র ও ধরণ

বাংলাদেশ চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, তেল-মসলা, মাছ-মাংস সব কিছুতে ভেজাল দেয়া হচ্ছে। মাছে ও খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন, চালে পাথর কুচি, বালি, চালের রং উজ্জ্বল করার জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক ইউরিয়া মেশানো হচ্ছে। ফলে মানুষের কিডনি, লিভার, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে, ক্যান্সারসহ ভয়াবহ রোগের প্রবণতা বাড়ছে।

খাদ্যে ভেজালের কারণ

খাদ্যে ভেজাল এখন মানব জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। ভেজালের প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল মহামারি আকার ধারণ করেছে। খাদ্যে ভেজাল এর জন্য নিম্নরূপ কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে-

১. অধিক মুনাফা লাভের আশা
২. তদারকির অভাব
৩. আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া
৪. নৈতিকতার অভাব
৫. খাদ্য পরিবহণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থার অভাব
৬. ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ

খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ

খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। কাজেই যেকোনো মূল্যে ভেজালের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হবে। খাদ্যে ভেজালের প্রতিকার ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল:-

১. **আইনী কাঠামো ও প্রয়োগ:** খাদ্য ভেজাল রোধের জন্য যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন অথবা প্রচলিত আইনের সংশোধন করতে হবে। বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯. (সংশোধিত ২০১৫), নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও মিডিয়ায় প্রচারণা চালাতে হবে।

২. **পণ্যের আন্তর্জাতিক মান নির্ণয়:** প্রচলিত মানদন্ড ও নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়া সংশোধন করতে হবে। মানব স্বাস্থ্যের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত পণ্য আইএসও (ISO) কর্তৃক যাচাই করতে হবে।

৩. **খাদ্য নিরাপত্তা বলয় গঠন :** প্রতিবেশী বা আঞ্চলিক দেশ সমূহের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত, সরবরাহ, বিনিময় ও মান নির্ণয়ে নিরাপত্তা বলয় গঠন করতে হবে। প্রয়োজনে WFO, ISO, WHO এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

৪. **সুশীল সমাজের দায়বদ্ধতা:** খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভোক্তা সমিতি, বিভিন্ন বণিক সমিতি ও পরিবেশবাদী সংগঠনকে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫. **কারিগারি দক্ষতা ও অবকাঠামো বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইন্সটিটিউট (BSTI), ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (TCB), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে আরও শক্তিশালী করে সম্প্রসারিত করা উচিত।

খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে একটি যুগোপযোগী নিয়ন্ত্রক সংস্থা একান্ত জরুরি। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মুক্ত হতে হবে। সর্বোপরি দেশের জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। আইনের প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের করণীয়গুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

খাদ্যে ভেজাল বাংলাদেশে সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয়। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। যারা খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত করে তারা সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের শত্রু। যারা এই অপরাধের সাথে জড়িত থাকে বা জড়িত হয় তারা জঘন্য অপরাধী। খাদ্যে ভেজাল রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ, অপরাধের শাস্তি নিশ্চিতকরণ ও নিয়মিত বাজার পরিদর্শন প্রয়োজন। এছাড়াও খাদ্যে ভেজাল রোধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অসাধু ব্যবসায়ী কেন খাদ্যে ভেজাল দিয়ে থাকে?

(ক) মানসিক রোগের জন্য (খ) অধিক মুনাফা লাভের জন্য

(গ) আইন না থাকার কারণে (ঘ) সামাজিক সমর্থন থাকায়

২। 'নিরাপদ খাদ্য আইন', কত সালে প্রণীত হয়েছে?

(ক) ২০১১ (খ) ২০১২ (গ) ২০১৩ (ঘ) ২০১৪

পাঠ-১০.৮ পরিবেশ দূষণ ও সুশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবেশ দূষণ কি ও এর কারণ বলতে পারবেন।
- পরিবেশ দূষণ এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পরিবেশ দূষণের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হবেন।
- পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জৈবিক, অজৈবিক, পরিবেশ দুষণ, পানি দূষণ, ভূগর্ভস্থ আর্সেনিক।

বর্তমান বিশ্বে যে সমস্ত সমস্যাগুলি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তার মধ্যে পরিবেশ দুষণ অন্যতম। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন ক্ষতিকর পদার্থের আধিক্যের কারণে পরিবেশের মধ্যে যদি কোন ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয় তখন তাকে পরিবেশ দুষণ বলে। পরিবেশ দুষণ বলতে, পরিবেশের মধ্যে মানুষ বা অন্য প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনাচারণের জন্য ক্ষতিকর বস্তুর প্রবেশ ও বৃদ্ধি বোঝায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে, ''পরিবেশে স্বাভাবিক অবস্থায় যে উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে তাদের একটি, দুটি বা সবগুলোর পরিমাণ বা ঘনত্ব যখন বেড়ে যায় তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলে''।

ম্যাচাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে বিশদ সংজ্ঞা দিয়েছে। সংস্থাটির মতে ''দ্রব্য বা পরিসেবা উৎপাদন ও ভোগের যে কোনো পর্যায়ে যেসব বর্জ্য বা অবশিষ্ট পদার্থ সৃষ্টি হয় সেগুলি যখন বায়ুমন্ডলে, সমুদ্রে বা পার্থিব পরিবেশের কোথাও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে পরিবেশ দুষণ বলে"।

সাধারণভাবে পরিবেশ দুষিত হলে পানি, বায়ু, মাটি, শব্দ অর্থাৎ প্রাকৃতিক সকল উপাদানই দূষিত হয়।

পরিবেশ দূষণের কারণ

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট এই দুইভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটে থাকে। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যেৎপাত অন্যতম। তবে বর্তমানে মানবসৃষ্ট কারণই পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ।

অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ দূষণের উল্লেখযোগ্য কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ জল, মাটি, বায়ুর ওপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। শুরু হয় বন সম্পদ বিনষ্টের মহড়া। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ। বর্তমানে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য এক সংকটজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান হারে শক্তি উৎপাদনের চাহিদা। শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নির্গত হয় মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-দূষক নানা রাসায়নিক দ্রব্য। দূষিত রাসায়নিক দ্রব্যই নানা দুরারোগ্য ব্যাধির দ্রুত প্রসারণের কারণ। এতে বায়ু-জল-খাদ্য দ্রব্য মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার জীবন ও জীবিকার তাগিদে শিল্পায়ন দ্রুততর হচ্ছে,পরিকল্পিত উপায়ে না হওয়ার ফলে তা প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে, দূষিত পরিবেশ হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে সমগ্র পৃথিবীকে।

পরিবেশ দুষণ ও সুশাসন

পরিবেশ দূষণের ফলাফল সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পরিবেশ দূষণের ফলে কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরপাত্তা, স্বাস্থ্য, আবাসনসহ নানাবিধ বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। যেমন ২০১১ সালে জাপানে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিস্তৃত এলাকায় পরিবেশ দূষণ করে এবং নির্দিষ্ট এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। পরিবেশ দূষণে মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্য ঝুকি তৈরি হয়। বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চলের নদী-নালা, জলাশয়গুলো চরম মাত্রায় দূষিত। বিশেষ করে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরের পার্শ্ববর্তী নদীর পানি দূষিত হয়ে এলাকার জন-জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। প্রায়শই নানাবিধ

চর্মরোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছে মানুষ। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাষ্ট্র কর্তৃক মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার গতি ধীর করে দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবেশ বিপর্যয় বাংলাদেশের উপকূলীয় আঞ্চলের জনগণের জীবন-জীবিকা ও আবাসস্থল বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এ ধরণের প্রায় ২ কোটি জনগণের জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা, আবাসন সমস্যা সমাধান যেকোন শাসনের জন্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের উপায়

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা কমিয়ে আনা এবং পরিবেশ দূষণ রোধে পদক্ষেপ গৃহিত হচ্ছে। এটি আজ বিশ্ব আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়-

(১) আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা এবং এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
(২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পিত নগরায়ন।
(৩) জনসচেতনতা সৃষ্টি করা
(৪) বিকল্প জ্বালানি ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রয়োগ
(৫) ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপন ও বন সংরক্ষণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবেশ দূষণের প্রভাব আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বে যে কয়টি সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তার মধ্যে পরিবেশ দূষণ অন্যতম। স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, ক্ষতিকর পদার্থের আধিক্যের কারণে পরিবেশের মধ্যে যদি কোন ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়, তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলে। আর এর প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। সর্বোপরি এ সংক্রান্ত আইন মেনে চলা উচিত। পরিবেশের অতিদূষণ যেমন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে তেমনি সুশাসন নিশ্চিত করে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে প্রতিরোধ সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "পরিবেশে স্বাভাবিক অবস্থায় যে উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে, তাদের একটি, দুটি বা সবগুলোর পরিমাণ বা ঘনত্ব যখন বেড়ে যায় তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলে"- উক্তিটি কার?

(ক) EU (খ) WHO
(গ) UNESCO (ঘ) FAO

২। পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী-

i. অপরিকল্পিত শিল্পায়ন
ii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
iii. বনাঞ্চল ধ্বংস

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) সবকটি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।
নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান করিম সরকারের প্রশাসনিক বিভাগে চাকরি পেয়ে রাতারাতি বদলে যায়। বড়লোক বন্ধুদের সাথে পাল্লা দিয়ে অল্প সময়েই বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়ে যায়। তার এ অবস্থা দেখে সমাজের অনেকেই তাকে নিয়ে সমালোচনা করতে শুরু করে।

(ক) খাদ্যে ভেজাল কি ধরণের অপরাধ?
(খ) খাদ্যে ভেজালের ধারণা ব্যাখ্যা কর?
(গ) উদ্দীপকের করিমের কর্মকান্ডে দূর্নীতির কোন কারণটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উক্ত কারণই দূর্নীতির একমাত্র কারণ নয়-বিশ্লেষণ করুন।

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।
জনাব ফরহাদ ফলের ব্যবসায়ী। তিনি অধিক মুনাফার লোভে দোকানের বিভিন্ন প্রকার ফলে কার্বাইড ও ফরমালিন দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন, এ ধরনের কাজ খারাপ নয়। তিনি অবগত নন যে, কাজটি অনৈতিক ও প্রতিনিয়ত ভোক্তা অধিকার হরণ করছেন। যা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

(ক) জলবায়ু পরিবর্তন কি?
(খ) গ্রীন হাউজ গ্যাস বলতে কি বোঝায়?
(গ) উদ্দীপকে কোন নাগরিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা দিন।
(ঘ) উক্ত নাগরিক সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ উপস্থাপন করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬ ঃ ১। ক ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৭ ঃ ১। খ, ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৮ ঃ ১। খ ২। ঘ